
HIMU
মাসুদ রানা
চ্যালেঞ্জ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনা
ANIK
pathfinder

কাজী আনোয়ার হোসেনের

# মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

## বন্ধু

ব্যাঙ্ককে ডেকে পাঠানো হলো মাসুদ রানাকে। সোহেলের কাছে রিপোর্ট করল সে। সোহেল ওকে তৈরি করতে বলল ওরই এক অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা করার অব্যর্থ পরিকল্পনা। ব্যাপারটা কি!—ভাবছে রানা। সর্বক্ষণ ওকে অনুসরণ করছে কেন তিনজন বাঙালী? মেয়েটারই বা মতলব কি? কি চায়?

## চ্যালেঞ্জ

রিসিভার তুলল রানা, 'হ্যালো?' 'রানা?' সেই ভারী, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। চিনতে ভুল হলো না। ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'জ্বী!' 'আমি একটা ব্লান্ডার করে ফেলেছি, রানা। সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমিই দায়ী...' 'স্যার!' মুখ দিয়ে আর কোন কথা সরল না রানার। 'বি. সি. আই. থেকে রিজাইন করছি আমি। দুঃখ কি জানো, ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে...' 'আমি আসছি, স্যার।' আমেরিকা থেকে ছুটে চলে এলো রানা ঢাকায়।



সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

# বন্ধু

---

# চ্যালেঞ্জ

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সাতচল্লিশ টাকা


ISBN 984-16-7615-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০





প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০


Masud Rana
BONDHU
CHALLENGE
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

# সস্তায় মাসুদ রানার বই: ভলিউম

| | | |
|---|---|---|
| ১-২-৩ | ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ | ৪৫/- |
| ৪-৫-৬ | দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ | ৪১/- |
| ৮-৯ | সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে) | ২৮/- |
| ১০-১১ | রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ | ৪১/- |
| ১২-৫৫ | রত্নদ্বীপ+কুউউ | ৩৮/- |
| ১৩-১৪ | নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে) | ২৮/- |
| ১৫-১৬ | কায়রো+মৃত্যু প্রহর | ৩৭/- |
| ১৭-১৮ | গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র | ৩৪/- |
| ১৯-২০ | রাত্রি অন্ধকার+জাল | ৩১/- |
| ২১-২২ | অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা | ৩২/- |
| ২৩-২৪ | ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত | ৩২/- |
| ২৫-২৬ | এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই | ২৭/- |
| ২৭-২৮ | বিপদজনক-১,২ (একত্রে) | ২৯/- |
| ২৯-৩০ | রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে) | ২৮/- |
| ৩১-৩২ | অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে) | ৩৫/- |
| ৩৩-৩৪ | বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে) | ৩২/- |
| ৩৫-৩৬ | ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে) | ৩০/- |
| ৩৭-৩৮ | গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু | ৩৪/- |
| ৩৯-৪০ | অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে) | ৩২/- |
| ৪১-৪৬ | সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক | ৪০/- |
| ৪২-৪৩ | নীল ছবি-১,২ (একত্রে) | ৩৪/- |
| ৪৪-৪৫ | প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে) | ৩১/- |
| ৪৭-৪৮ | এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে) | ২৯/- |
| ৪৯-৫০ | লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন | ৩৫/- |
| ৫১-৫২ | প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে) | ৩৩/- |
| ৫৩-৫৪ | হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে) | ২৮/- |
| ৫৬-৫৭-৫৮ | বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে) | ৪৪/- |
| ৫৯-৬০ | প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে) | ২৯/- |
| ৬১-৬২ | আক্রমণ (একত্রে) | ৪১/- |
| ৬৩-৬৪ | গ্রাস-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ৬৫-৬৬ | স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে) | ৩৫/- |
| ৬৭-১৬১ | পপি+বুমেরাং | ৪৫/- |
| ৬৮-৬৯ | জিপসী-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ৭০-৭১ | আমিই রানা-১,২ (একত্রে) | ৪০/- |
| ৭২-৭৩ | সেই উ সেন-১,২ (একত্রে) | ৪০/- |
| ৭৪-৭৫ | হ্যালো, সোহানা (একত্রে) | ৪০/- |
| ৭৬-৭৭ | হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে) | ৩৮/- |
| ৭৮-৭৯-৮০ | আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে) | ৫৮/- |
| ৮১-৮২ | সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ৮৩-৮৪ | পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে) | ৪১/- |
| ৮৫-৮৬ | টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে) | ৩২/- |
| ৮৭-৮৮ | বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে) | ৩৮/- |
| ৮৯-৯০ | প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে) | ৩২/- |
| ৯১-৯২ | বন্দী গগল+জিম্মি | ৩৬/- |
| ৯৩-৯৪ | তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে) | ৩৮/- |
| ৯৫-৯৬ | স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে) | ৩২/- |
| ৯৭-৯৮ | সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা | ৪১/- |
| ৯৯-১০০ | নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে) | ৩২/- |
| ১০১-১০২ | স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে) | ৩৮/- |
| ১০৩-১০৪ | উদ্ধার-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ১০৫-১০৬ | হামলা-১,২ (একত্রে) | ৩১/- |
| ১০৭-১০৮ | প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে) | ৩৩/- |
| ১০৯-১১০ | মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে) | ৪০/- |

| | | |
|---|---|---|
| ১১১-১১২ | লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে) | ৩৫/- |
| ১১৩-১১৪ | অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে) | ৩২/- |
| ১১৫-১১৬ | আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে) | ৩৮/- |
| ১১৭-১১৮ | বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে) | ৪১/- |
| ১১৯-১২০ | নকল রানা-১,২ (একত্রে) | ৩৫/- |
| ১২১-১২২ | রিপোর্টার-১,২ (একত্রে) | ৪২/- |
| ১২৩-১২৪ | মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে) | ৩৮/- |
| ১২৫-১৩১ | বন্ধু+চ্যালেঞ্জ | ৪৪/- |
| ১২৬-১২৭-১২৮ | সংকেত-১,২,৩ (একত্রে) | ৫২/- |
| ১২৯-১৩০ | স্পর্ধা-১,২ (একত্রে) | ৩৫/- |
| ১৩২-১৫৩ | শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী | ৪৪/- |
| ১৩৩-১৩৪ | চারিদিকে শত্রু-১,২ | ৩৪/- |
| ১৩৫-১৩৬ | অগ্নিপুরুষ (একত্রে) | ৩৯/- |
| ১৩৭-১৩৮ | অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে) | ৪৫/- |
| ১৩৯-১৪০ | মরণকামড়-১,২ (একত্রে) | ৩৩/- |
| ১৪১-১৪২ | মরণখেলা-১,২ (একত্রে) | ৪০/- |
| ১৪৩-১৪৪ | অপহরণ-১,২ (একত্রে) | ৪১/- |
| ১৪৫-১৪৬ | আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে) | ৩১/- |
| ১৪৭-১৪৮ | বিপর্যয়-১,২ (একত্রে) | ৪১/- |
| ১৪৯-১৫০ | শান্তিদূত-১,২ (একত্রে) | ৪০/- |
| ১৫১-১৫২ | শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ | ৫০/- |
| ১৫৮-১৬২ | সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া | ৪৬/- |
| ১৫৯-১৬০ | আবার উ সেন-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ১৬২-১৬৫ | কে কেন কিভাবে+কুচক্র | ৪৭/- |
| ১৭২-১৭৩ | জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে) | ৩৪/- |
| ১৮০-১৮১ | সত্যবাবা-১,২ | ৩৮/- |
| ১৮২-১৮৩ | যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা | ৩৭/- |
| ১৯৫-১৯৬ | ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ (একত্রে) | ৩৬/- |
| ১৯৭-১৯৮ | তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ১৯৯-২০০ | ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ২০১-২০২ | আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) | ৩৯/- |
| ২০৩-২০৪ | অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে) | ৩৫/- |
| ২০৫-২০৬-২০৭ | জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) | ৫০/- |
| ২০৮-২০৯ | সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) | ৩৮/- |
| ২১০-২১১ | গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ২১৭-২১৮ | অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ২১৯-২২০ | দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) | ৩৬/- |
| ২২১-২২২ | কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) | ৩৭/- |
| ২২৩-২২৪ | কালোছায়া-১,২ (একত্রে) | ৩৯/- |
| ২২৫-২২৬ | নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) | ৩৪/- |
| ২৩৪-২৩৫ | অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) | ৩৬/- |
| ২৩৬-২৩৭ | ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) | ৩১/- |
| ২৩৮-২৩৯ | নীল দংশন-১,২ (একত্রে) | ৩২/- |
| ২৪০-২৪১ | সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে) | ৩৪/- |
| ২৫৮-২৬৫ | রক্তচোষা+সাত রাজার ধন | ৪৩/- |
| ২৭০-২৭১ | অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ | ৩৭/- |
| ২৭২-২৭৩ | মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ | ৩৬/- |
| ২৭৯-২৮২ | মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি | ৪৭/- |
| ২৮১-২৭৭ | আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি | ৪২/- |
| ২৮৩-২৮৮ | দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস | ৩৮/- |
| ২৮৪-৩১২ | মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট | ৪২/- |
| ২৯২-২৯৮ | রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ | ৩৭/- |
| ২৯৯-২৭৮ | কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা | ৪০/- |

# চ্যালেঞ্জ

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮৫

## এক

শুরু হলো আরও একটি কর্মব্যস্ত নতুন দিন।

সলীল সেন এল নীল ইয়ামাহা মোটর বাইকে চড়ে, ঠিক পৌনে ন'টায়। পরনে সাদা ট্রাউজার, কোমরে গোঁজা সাদা শার্ট, পায়ে সাদা জুতো, মাথায় কার্নিসওয়ালা সাদা সুতী ক্যাপ। তার পিছনে যেন আগুন লেগেছে। রুজ আর লিপস্টিকের উদার ব্যবহারে ফর্সা মুখ লাল হয়ে আছে পপির। তার শাড়ি লাল, ব্লাউজ লাল, স্যান্ডেল জোড়াও তাই। পিছনে বসে এক হাতে সলীলের কোমর জড়িয়ে ধরেছে, গালের একটা পাশ ঠেকিয়ে রেখেছে সলীলের চওড়া পিঠে। সাদা শার্টে লালচে একটা ছাপ ফুটছে—হৃৎপিণ্ড আকৃতির।

লুকিয়ে চুমো-টুমো খেতে গিয়ে যে-ক'বার ধরা পড়েছে ওরা, প্রতিবার মৌলভী ডেকে বিয়েটা পড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে রানা। বলাই বাহুল্য, এ ব্যাপারে রানার চেয়ে পপির উৎসাহই ছিল বেশি। কিন্তু হাতে পায়ে ধরে, কান ধরে ওঠ বস করে আরও কিছুদিন সময় চেয়ে নিয়েছে সলীল বন্ধুদের কাছ থেকে। অবশ্য পপির সাথে তাকে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে আসতে হয়েছে। শ্যামলীতে ছোট্ট একটা জায়গা কেনা হয়েছে, ওদের দু'জনের নামে, কিন্তু সলীলের টাকায়। হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের লোনও পাশ হয়ে গেছে, যে-কোনদিন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে। মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়ে গেলেই বিয়েটা করে ফেলবে ওরা। ইদানীং খুব হিসেব করে চলছে দু'জনেই, ফালতু একটা পয়সাও খরচ করে না। পপির রিকশা ভাড়া বাঁচাবার জন্যেই রোজ তাকে বাড়ি থেকে তুলে নেয় সলীল, অফিস ছুটির পর পৌঁছেও দেয়। আর প্রতি মাসে শাড়ি কেনার ঝোঁকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে পপি।

সাততলা বিল্ডিঙের সামনে থামল ইয়ামাহা। নামল ওরা। বাইক লক করে পপির হাত ধরে সিঁড়ির ধাপ তিনটে টপকাল সলীল, দারোয়ানের সসম্ভ্রম সালামের উত্তরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। বড় হলরুমের একধারে সিঁড়ি, আরেক ধারে এলিভেটর। দু'দিকেই ফার্স্ট আওয়ারের ব্যস্ততা। এরা সবাই একতলা থেকে পাঁচতলার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লোকজন। আন্ডারগ্রাউন্ড ও ছয় ও সাততলার দুটো ফ্লোর নিয়ে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। একটা কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিল ওরা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মাথায় প্রাইভেট লেখা নিয়ে একটা এলিভেটর এবং শুভ্রকেশ নিয়ে এক্স মিলিটারিম্যান হাসান। সসম্মানে

সালাম করল সে। হাসানের বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে কবেই, কিন্তু এই বয়সেও শরীরে শক্তি রয়েছে প্রচণ্ড। হাত খালি, কিন্তু পোশাকের ভেতর লুকানো আছে ফায়ার আর্মস। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। চকচকে পিতলের বোতাম লাগানো কড়া ভাঁজের খাকী ইউনিফর্ম।

এলিভেটরে করে ছয়তলায় এল ওরা। সামনের বড়সড় রিসেপশন হল। মস্ত একটা ডেস্ক নিয়ে চেয়ারের ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে ইলোরার ছোট বোন শ্রীমতী অজন্তা। তার লাল টিপ আঁকা কপাল থেকে আধ হাত উঁচু হয়ে আছে ফাঁপানো চুল। কানে ঝলমলে ঝুমকো। ওদেরকে দেখে তার মুক্তোঝরা হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। হাত ধরাধরি করে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। দু'পাশে সারি সারি অফিসরুম। পর্দার ফাঁক দিয়ে কর্মব্যস্ততার টুকরো ছবি চোখে পড়ল। কানে হেডফোন এঁটে বসে আছে দশ-বারোজন অপারেটর। সকাল ছ'টায়, পালাবদলের সময় অফিসে পৌঁচেছে টেকনিশিয়ানরা। টেবিলের ওপর টেলিপ্রিন্টার, ওয়্যারলেস সেট, টিভি স্ক্রীন, ইন্টারকম, টেলিফোন টাইপরাইটার, মিনি কমপিউটর ইত্যাদি। দেয়ালে নানা ধরনের চার্ট আর ম্যাপ। শেষের আটটা রুম আটজন এজেন্টের। এ-পাশে চারটে, ও-পাশে চারটে। ডান পাশের প্রথমটাই সলীলের। ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে আরও অনেক এজেন্ট রয়েছে, কিন্তু হেডকোয়ার্টারে বা অন্য কোন ব্রাঞ্চ অফিসে তাদের অনেকেরই বসার কোন ব্যবস্থা নেই। এদের কাউকে কাউকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা আছে, অফিসের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না। সাধারণত এদের দু'জনকে নিয়ে একটা টীম তৈরি করা থাকে, যে-কোন একজনের সাথে যোগাযোগ করে দু'জনকেই প্রয়োজনে নির্দেশ দিতে পারে হেডকোয়ার্টার।

এরপর গাড়ি হাঁকিয়ে এল জাহেদ। হাতে একটা ব্রীফকেস, ছয়তলায় উঠে সরাসরি সলীলের কামরায় ঢুকল সে। ব্রীফকেসে পাসপোর্ট, ভিসা, প্লেনের টিকেট সব নিয়ে এসেছে, আজই দুপুরের ফ্লাইটে নয়াদিল্লী চলে যাচ্ছে বিশেষ একটা জরুরী কাজে। ও ঢাকায় কয়েকদিন থাকবে না, কাজেই ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি রুমানা ছুটি নিয়েছে—চা খাবার উপায় নেই। একটা মতলব নিয়ে সলীলের কামরায় ঢুকল সে।

রুপা আসবে না, সে ছুটিতে আছে। আর দীনাকে পাঠানো হয়েছে লেবাননে।

ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে এল রাশেদ। চার দিন পর আজ এল সে। জটিল একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে খুব ব্যস্ত। কিন্তু সেটা শেষ করার আগেই সলীলকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে দেশের বাইরে চলে যেতে হতে পারে যে কোনদিন নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। হাতের কাজটা নিয়ে সলীল বা সোহেলের সাথে কথা বলা দরকার, তাই এসেছে সে।

মাসুদ রানা আসবে না। আসবে না সোহানাও। দিন তিনেক ভারত, দু'দিন শ্রীলংকা, একদিন মালয়েশিয়ায় কাটিয়ে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে ওরা। দেশের নতুন গড়ে ওঠা একটা ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস করার একটা বিদেশী

চক্রান্ত ধরা পড়েছে, সেটাকে বানচাল করার দায়িত্ব পড়েছে ওদের কাঁধে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় যেতে হতে পারে ওদেরকে।

সাধারণত সাড়ে আটটার মধ্যে অফিসে পৌছে যায় সোহেল। কিন্তু আজ সে ছ'ঘণ্টা আগে পৌচেছে, রাত আড়াইটায়।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান ঠিক কখন অফিসে আসেন বা বেরিয়ে যান, কেউ তা সঠিকভাবে জানে না, সম্ভবত ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে পৌছান তিনি। কিন্তু আজ তিনি সোহেলের চেয়ে দু'মিনিট আগেই পৌচেছেন।

জাহেদের মুখে চায়ের কথা শুনেই শর্ত দিয়ে বসল সলীল, 'আগে সিগারেট বের কর।'

'শালা হাড়কিপটে! ভেবেছিস সিগারেটের পয়সা বাঁচিয়ে বাড়ি তুলবি...'

ঘরে ঢুকল রাশেদ। মুখটা থমথমে। ওরা চেহারা দেখেই অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এল ঘরে। ক'দিন ধরেই একটা ব্যাপার নিয়ে সবাই খুব উদ্বেগের মধ্যে আছে ওরা।

তেল আবিবে বাংলাদেশের একটা স্পাই টীম কাজ করছে, যতটা না বাংলাদেশের স্বার্থে তারচেয়ে বেশি মুসলিম আরব দেশ আর ফিলিস্তিনীদের স্বার্থে। লেবানন, সিরিয়া আর সৌদী আরবের স্পাই নেটওয়ার্ক তেমন শক্তিশালী নয়, তেল আবিব থেকে তাই তথ্য সংগ্রহের কিছু কিছু বিপজ্জনক কাজ বাংলাদেশ করে দেয়। তেল আবিবে বি. সি. আই-এর যে টীমটা কাজ করছে তার সাথে সরাসরি রেডিও যোগাযোগ আছে হেডকোয়ার্টারের। কিন্তু আজ সাতদিন হলো সেই রেডিও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ। আট দশ জন এজেন্ট কাজ করছে ওখানে, তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে কিছুই জানা যাচ্ছে না। লেবাননী মেয়ে আয়েশা ওদের লিয়াজোঁ অফিসার, তার নিজের কাছেও একটা অতিরিক্ত রেডিও থাকার কথা, কিন্তু সেটাও গত সাতদিন থেকে নিশ্চুপ। সবাই আশঙ্কা করছে নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে কিন্তু ভাল-মন্দ কোন খবর না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

'সোহেলের কামরা থেকে এলি বুঝি?' জানতে চাইল সলীল।

'হ্যাঁ,' ব্যস্ত হাতে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল রাশেদ। 'দীনা ফিরে আসছে।'

'খারাপ খবর?' চাপা গলায় জানতে চাইল জাহেদ।

'টেলিফোনে কিছুই জানায়নি,' বলল রাশেদ। সিগারেটের প্যাকেটটা সলীলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ডেস্কের এক কোণে উঠে বসল। 'চার্টার করা প্লেন নিয়ে আসছে, ঢাকায় ল্যান্ড করার কথা রাত আড়াইটায়, কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় লেট হচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে পৌছে যেতে পারে।'

এরপর আর আড্ডা জমার প্রশ্ন ওঠে না। চা আনল পপি, সিগারেট ধরাল সলীল আর জাহেদ। কারও মুখে কথা নেই। তেল আবিবে ঠিক কি ঘটেছে জানার জন্যেই লেবাননে পাঠানো হয়েছিল দীনাকে। কোন বার্তা না পাঠিয়ে

চার্টার করা প্লেনে ফিরে আসছে সে, তার মানে-খবর নিশ্চয়ই ভাল না।

ঠিক এই সময় করিডরে হাইহিলের খট খট আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।

একমুহূর্তে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা, তারপরই ভিড় করে এগোল দরজার দিকে। বাইরে বেরিয়ে এল চারজন। দেখল, ওদের দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে।

কখনোই মেকআপ ব্যবহার করে না দীনা, তার কোন দরকারও পড়ে না, কারণ অসাধারণ সুন্দরী সে, ডানাকাটা পরী বললেও চলে। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা, এত লম্বা মেয়ে বি.সি.আই.-এ আর দ্বিতীয়টি নেই। মুখটা লাল হয়ে আছে, চোখে ক্লান্তি, উষ্কখুষ্ক চুল। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে, চেহারায় দিশেহারা একটা ভাব।

ওদের কারও দিকে তাকাল না দীনা, পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

'দীনা?' জিজ্ঞেস করল সলীল, 'খবর কি?'

উত্তর দিল না দীনা, বোধহয় শুনতেই পায়নি, হাইহিলের খটাখট আওয়াজ তুলে সাততলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

ছোট্ট নিষ্পাপ একটি শিশু। হাস্যোজ্জ্বল, নির্মল, পবিত্র—ঠিক যেন একটি দেবশিশু, ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে এই বুঝি হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল। ওয়াশিংটন, হোটেল হিলটন, ছাব্বিশতলার একটা কামরা। খোলা একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, দেয়ালে লটকানো ক্যালেন্ডারে ছাপা ছবিটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। ক্লিক করে একটা অস্পষ্ট শব্দ হলো, চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল সোহানা। 'এর মানে?' ঘুরে দাঁড়াল সে।

মেঝেতে, কার্পেটের ওপর প্রায় শুয়ে পড়েছে মাসুদ রানা, চোখ থেকে ক্যামেরা সরিয়ে মুচকি হাসল ও। 'এই ছবিটা আমি এগজিবিশনে পাঠাব, নাম দেব, মাতৃত্বের প্রত্যাশায়।'

সাংঘাতিক লজ্জা পেল সোহানা, সেটা লুকাবার জন্যেই কিল তুলল সে। 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

'আহ্, নোড়ো না,' হুঁশিয়ার করে দিয়ে আবার চোখে ক্যামেরা তুলল রানা। 'তোমার এই রণরঙ্গিনী মূর্তিটাও ধরে রাখি। ছেলেমেয়েরা বুঝবে ওদের মা শুধু কারাতে-কুংফু নয়, দেশীয় কৌশলও কিছু কিছু জানত।' আবার ক্লিক করে শব্দ হলো।

'শুধু অসভ্যতা!' বলে ঘুরল সোহানা, একটু সরে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল। পিছন ফিরে দাঁড়ানো সোহানা, পরনে জিনসের ট্রাউজার আর শার্ট, তার সামনে খোলা জানালা। জানালার বাইরে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ আর নীল আকাশ। 'বন্দী বিহঙ্গী,' বলেই আবার শাটারে চাপ দিল রানা। ক্লিক।

সোহানা নড়ল না। দ্রুত তার একপাশে, হাতখানেকের মধ্যে চলে এল রানা। চোখে ক্যামেরা। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল সোহানা,

ব্যাপারটা উপভোগ করলেও চেহারায় তার কোন ভাব ফুটতে দিল না, ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে দ্রুত জায়গা বদল করছে রানা, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে একের পর এক ছবি তুলে চলেছে। 'ম্যাডাম, একবার লেন্সের দিকে তাকাবেন, প্লীজ?'

এই সময় বাধা। ক্রিং ক্রিং। পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোহানা। 'কে হতে পারে?'

'কেউ জানে না এখানে আমরা আছি,' ফিসফিস করে বলল রানা। ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে দুই ঘরের মাঝখানের দরজার দিকে এগোল ও।

তিন বার রিঙ হয়ে গেছে। রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো?'

'রানা?' সেই ভারী, গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

এই গলার আওয়াজ চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়। তবু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে দু'সেকেন্ড সময় লাগল রানা। মেজর জেনারেল রাহাত খান। ভয়ঙ্কর জরুরী কোন ব্যাপার না হলে তিনি টেলিফোন করবেন না। নিজের অজান্তেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল রানার। 'জ্বী,' ছোট করে সাড়া দিল ও।

'আমি একটা ব্লান্ডার করে ফেলেছি, রানা। সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমিই দায়ী...'

এ-ঘরে ঢুকে ভূত দেখার মত চমকে উঠল সোহানা। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রানার চেহারা, চোখ দুটো অবিশ্বাসে বিস্ফারিত। রিসিভারটা এত জোরে চেপে ধরে আছে, মনে হলো ভেঙে যেতে পারে ওটা।

'স্যার।' মুখ দিয়ে আর কোন কথা সরল না রানার।

'বি.সি.আই. থেকে রিজাইন করছি আমি,' রাহাত খান ঢাকা থেকে বললেন, সাথে সাথে বন করে মাথাটা ঘুরে গেল রানার। 'ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি, ভাবলাম রিজাইন লেটার সই করার আগে তোমাকে ব্যাপারটা জানাই। বুড়ো হয়ে গেছি তো, কাজে ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে, এত বড় একটা দায়িত্ব কাঁধে রাখা আর সাজে না।'

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই নিজেকে সামলে নিল রানা। বিপদ আঁচ করতে পারলে কোত্থেকে যেন শক্তি পায় ও, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। এখন আর মাথা ঘুরছে না। এই একটু আগেও চোখে ঝাপসা দেখছিল, ঠিক হয়ে গেছে। শান্ত, অবিচলিত দেখাল ওকে। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাদা দেয়ালের দিকে। ওর কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, সেদিকে কোন খেয়াল নেই ওর।

শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা, 'কি হয়েছে, স্যার? সব খুলে বলুন আমাকে।'

'তেল আবিবে আমাদের সব লোক জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হাতে ধরা পড়ে গেছে,' রাহাত খান বললেন। 'ধরা পড়ার সময় বাধা দিতে গিয়ে মারা পড়েছে তিনজন— সাদেক, আহসান আর সাবের। এরপর আমি আর...'

কেউ যেন লোহার হাত দিয়ে রানার হৃৎপিণ্ডটা সজোরে চেপে ধরল।

এই তিনজনকে নিজের হাতে ট্রেনিং দিয়েছিল ও। আবার ঝাপসা হয়ে এল চোখ। সেই সাথে কঠোর হয়ে উঠল চেহারা। বসকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল, 'আর সবাই?'

'আয়েশাও মারা গেছে। বাকি পাঁচজনের বিচার হবে,' বললেন রাহাত খান। 'কি বিচার হবে, জানোই তো। ফায়ারিং স্কোয়াড...'

ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে রানা, তবু নিশ্চিত ভাবে জানার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের কাছে নিশ্চয়ই বাংলাদেশী পাসপোর্ট ছিল না? আমি জানতে চাইছি, ওরা বাংলাদেশী বা বাংলাদেশের হয়ে কাজ করছিল তা কি ইসরায়েল প্রমাণ করতে পারবে?'

'জানবে বা জেনেছে, কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারবে না,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু প্রমাণ করতে পারুক বা না পারুক, আমি শেষ, রানা। আমার সরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। দুঃখ কি জানো, ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে...'

'স্যার,' বাধা দিল রানা।

অপরপ্রান্তে থমকে গেলেন রাহাত খান। রানার গলায় একটু যেন কাঠিন্য।

কয়েক সেকেন্ডের ঠাণ্ডা নীরবতা। তারপর আবার বলল রানা, 'স্যার, আপনার কাছ থেকেই শিখেছি, বিপদে অস্থির হতে নেই। আমার অনুরোধ, আমি ঢাকায় না ফেরা পর্যন্ত আপনি কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।'

'ব্যাপারটা তুমি বুঝছ না, রানা। নিজের ব্যর্থতা আমি...'

'এই বিপর্যয় কেন ঘটেছে, আমি অনুমান করতে পারি, স্যার,' বলল রানা। বসের কথা যেন শুনতেই পায়নি ও। 'তিনদিনের মধ্যে আমি একটা ইমার্জেন্সী স্কীম পাঠাচ্ছি। ওটা হাতে পেলে আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন। তারপর এখানের কাজ সোহানাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি আসছি। তার আগে পর্যন্ত আপনি কিছুই করবেন না। যদি রিজাইন করতে চান, আগে আমি ঢাকায় ফিরি, তারপর দেখা যাবে।'

'এ-কথা তো ঠিক যে আমি বুড়ো হয়েছি...' রানাকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করলেন রাহাত খান।

'এ-কথাও তো ঠিক যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার অভিজ্ঞতা জ্ঞান এইসবও বেড়েছে। সে-সব থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চাই না স্যার।' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা—রাহাত খানের আগে, জীবনে এই প্রথম। এতক্ষণ সামলে রেখেছিল নিজেকে, আর পারল না, ভিজে উঠল চোখের কোণ। রাহাত খান বি.সি.আই-এ নেই, এ-কথা কল্পনা করতেই বুকটা খালি হয়ে যায়, অসহায় মনে হয় নিজেকে—আজকের মত এমন ভাবে ব্যাপারটা আর কখনও অনুভব করেনি ও।

# দুই

রাত আটটা।

অফিস একরকম খালিই বলা চলে। এজেন্টদের মধ্যে একমাত্র সোহেলের কামরাতেই আলো জ্বলছে। সামনের ঘরটা থেকে মাঝেমধ্যে খসখস আওয়াজ ভেসে আসছে, একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে পারভিন, সোহেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি। নিজের ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে সোহেল। বস্ ডাকবেন, তারই অপেক্ষায় রয়েছে ও। পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে ইন্টারকমে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, 'বেরিয়ে যেয়ো না,' তারপর তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, এখনও ডাক আসেনি।

সোহেল জানলে আকাশ থেকে পড়বে, ওকে নির্দেশ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন রাহাত খান।

দীনা লেবানন থেকে ফিরে এসেছে আজ তিন দিন। দুঃসংবাদটা যাদের জানার তারা জেনেছে, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে কারও সাথে আলাপ করেননি বা কাউকে কোন নির্দেশ এখনও দেননি রাহাত খান। গত তিন দিন নিজের চেম্বারে কাউকে তিনি ডাকেননি, সবগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্টও বাতিল করে দিয়েছেন। গোটা অফিসেই একটা বিষণ্ন, থমথমে ভাব। তেল আবিবে নয়জন এজেন্টকে হারিয়েছে বি.সি.আই.। এদের তিনজন ট্রেনিং পেয়েছে হেডকোয়ার্টার থেকে। বাকি ছয়জন বাংলাদেশীও নয়, বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টারের সাথে তাদের পাঁচজনেরই কোন যোগাযোগও ছিল না। বাকি একজন, লিয়াজোঁ অফিসার আয়েশা জামালেক বাংলাদেশী না হলেও হেডকোয়ার্টারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল তার, বিশেষ একটা কাজে একবার হেডকোয়ার্টার ঢাকায়ও এসেছিল সে। তেল আবিবে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হাতে ধরা পড়ে সে-ই প্রথম। ইন্টারোগেশনের সময় তার ওপর টরচার করা হয়, তাতেই মারা যায় সে, মারা যাবার আগে এজেন্টদের নাম ঠিকানা সব সে বলে যায়। ওদের পাঁচজনকে ধরতে মাত্র আধ ঘন্টা সময় লাগে ইসরায়েলিদের। বাকি তিনজন ধরা দেয়নি, বাধা দিয়ে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছে।

এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়।

নিয়মটা জানা আছে সোহেলের। পাল্টা আঘাত অবশ্যই হানা হবে। এবং আবার একটা টীম পাঠানো হবে তেল আবিবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে কেন, সেটা ওর বোধগম্য হচ্ছে না। আজ হয়তো ব্যাপারটা ফয়সালা হবে, সেজন্যেই তাকে থাকতে বলেছেন বস্। প্রশ্ন হলো, কোন্ কাজটা আগে? প্রতিশোধ, নাকি আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা?

ন'টার সময় পারভিনকে ডেকে চা দিতে বলল সোহেল। কিন্তু চা এসে

পৌঁছুবার আগেই জ্যান্ত হয়ে উঠল ইন্টারকম। ভারী গলায় রাহাত খান বললেন, 'চেম্বারে এসো, সোহেল।'

'ইয়েস, স্যার।' হেদায়েত খানের ফাইলটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সোহেল।

চেম্বারে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল ও, দেখল, রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন বস্। 'এসো, বসো,' বলে তিনি নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরালেন। কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে রয়েছে। ছয় পা এগিয়ে নিঃশব্দে একটা হাতলহীন চেয়ারে বসে পড়ল সোহেল। 'তোমার কি ধারণা, ভুলটা কোথায় হয়েছে?'

বেমক্কা এই রকম একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না সোহেল, কিন্তু প্রসঙ্গটা ধরতে পারল সে। 'আয়েশাকে ঢাকায় ডেকে পাঠানোটাই ভুল হয়েছিল আমাদের, স্যার। তার কথা, সে যে আমাদের হয়ে কাজ করছে তা, শুধু একজনের কাছ থেকেই জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স জানতে পারে।' হেদায়েত খানের ফাইলটা সিধে করে বসের সামনে রাখল সে।

ফাইলের কাভারে একবার চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'হ্যাঁ। হেদায়েত খানই দায়ী। রানারও তাই ধারণা, আয়েশা ঢাকায় এসে নিশ্চয়ই তার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল।'

তার মানে রানার সাথে যোগাযোগ করেছেন বস্। আগ্রহটা চেপে রাখতে পারল না ও, জানতে চাইল, 'ও আসছে, স্যার?'

'হ্যাঁ।' রিভলভিং চেয়ারটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল, রাহাত খান সিধে হয়ে বসলেন। হেদায়েত খানের ফাইলটা একপাশে সরিয়ে রেখে আরেকটা ফাইল টেনে নিলেন তিনি, কাভারে কিছুই লেখা নেই। খুলে সেটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। শেষ আরেকবার রানার পাঠানো ইমার্জেন্সী স্কীমের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন।

হেদায়েত খান। সে যে একজন বেঈমান, ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছে, তা শুধু বি.সি.আই-ই নয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ছাড়াও কয়েকটা বন্ধু দেশের দূতাবাসও জানে। বি.সি.আই-কে অনুরোধ করা হয়েছিল, লোকটাকে গ্রেফতার না করে চোখে চোখে রাখা হোক। লোকটা কিভাবে ইনফরমেশন সংগ্রহ ও পাচার করে একবার তা শুধু জানতে পারলেই হয়, তখন মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করা কোন সমস্যাই হবে না। ধারণাটা পছন্দ হয়েছিল বি.সি.আই. এর। হেদায়েত খান কিভাবে তথ্য সংগ্রহ ও পাচার করে তা জেনে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সেই থেকে সুযোগ ও ইচ্ছে মত কৌশলে মিথ্যে তথ্য যোগান দেয়া হচ্ছিল তাকে। সেগুলো ইসরায়েলে পাচারও করছিল সে। কাজেই তাকে নিয়ে গুরুতর কোন দুশ্চিন্তায় ভুগছিল না কেউই।

কিন্তু একটা কথা ভুলে বসেছিল সবাই। তথ্য সংগ্রহ ও পাচারের একাধিক মাধ্যম থাকতে পারে তার, এ-কথা কারও মনে একবারও উঁকি দেয়নি। আয়েশার পরিচয় ফাঁস করে দেয়ার ব্যাপারে হেদায়েত খানই যদি

দায়ী হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে খবর পাচার করার একাধিক চ্যানেল রয়েছে তার। সংগ্রহেরও। বি.সি.আই. একটা মাত্র চ্যানেলের কথা জানে, আয়েশা সংক্রান্ত কোন খবর সেটার মাধ্যমে পাচার করা হয়নি।

সোহেলের চিন্তায় বাধা পড়ল। খোলা ফাইল থেকে মুখ তুলে রাহাত খান বললেন, 'ঠিক হয়েছে, প্রথম কাজ, আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা। তারপর প্রতিশোধ।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর আবার মুখ খুললেন, 'সাঈদ এখন কোথায় জানো?'

'সেতু ইঞ্জিনিয়ারকে টেলিফোন করলেই জানা যাবে, স্যার,' বলল সোহেল। সাঈদ ও সেতু একটা টীম হিসেবে কাজ করে, কিন্তু এদের মধ্যে শুধু সেতুরই বি.সি.আই-এর সাথে যোগাযোগ আছে। হেডকোয়ার্টার বা কোন শাখা অফিসের ত্রিসীমানায় ঘেঁষা এদের জন্যে সম্পূর্ণ নিষেধ।

ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে মুখের সামনে ধোঁয়ার একটা দেয়াল তুললেন রাহাত খান, বললেন, 'প্ল্যানটা হলো, সাতজনের একটা টীম তৈরি করা হবে তেল আবিবে...'

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে সোহেল। আনুষ্ঠানিক ভাবে বলা হয়নি বটে, কিন্তু বুঝতে পারছে, এই অ্যাসাইনমেন্টের কাজ বিলিবন্টন করার দায়িত্বটা তার ঘাড়েই চেপেছে।

গ্র্যান্ড পিয়ানোর ওপর কনুই রেখে চেরির দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল সাঈদ। কীগুলোর ওপর চাঁপা কলা রঙের লম্বা লম্বা আঙুল প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে। মৃদু, কোমল সুরে বাজায় চেরি, ওর মত আর কেউ এভাবে বিষণ্ণ সুর ফুটিয়ে তুলতে পারে কিনা জানা নেই সাঈদের। একটা প্রতিভা, সন্দেহ নেই। বেহালাও খুব ভাল বাজায় চেরি। তাতেও শুধু ওই করুণ সুরই ফোটে। অথচ, ভাবতে আশ্চর্য লাগে সাঈদের, চেরিকে দেখে মনেই হয় না যে তার জীবনে দুঃখ বা ট্র্যাজেডি আছে। হেসে আর হাসিয়ে, আনন্দ পেয়ে আর দিয়ে, জীবনটা উপভোগ করার জন্যেই যেন জন্মেছে মেয়েটা। চোখে একটু বিষাদের ছায়া লেগে থাকে বটে, কিন্তু মধুর মৃদু হাসিটুকু ঠোঁটে অম্লান, সেটা কখনও নেভে না।

বেশ লম্বা চেরি, একহারা গড়ন। শরীরের কোথাও এক ছটাক মেদ না থাকা সত্ত্বেও এই মেয়ে কি করে যে গুরু নিতম্বের অধিকারিণী হয় সেটা একটা বিশ্বের-বিস্ময়। বুক, প্রায় সমতলই বলা যায়। দু'ঠোঁটের মাঝখানের ফাঁকটা একটু বেশি লম্বা হওয়ায় মৃদু হাসির মধ্যে একটা দুষ্টামির ভাব আর যৌনাবেদনের প্রলেপ লেগে থাকে। চোখ দুটো ভারি সুন্দর, মায়া ভরা আর বিষাদ মাখা। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায় কোমরের নিচটা। যে-কোন মেয়ে, তা সে যত সুন্দরীই হোক, চেরির নিচের অর্ধেক দেখে তার মনে ঈর্ষা না জেগে পারে না।

পিয়ানো-কেসের ওপর নিজের প্রতিবিম্ব পড়েছে, সেদিকে চোখ রেখে সাঈদ ভাবল, আমায় কি নেশায় পেয়েছে, নাকি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি?

নেশা হলে সেটা ধরতে পারা বরং একটু কঠিনই। অন্তত অনেক দিন ধরে রোজ যারা মদ খায় তাদের জন্যে। মনে মনে একটু গর্ব অনুভব করল সে। এতদিন ধরে মদ খাচ্ছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না তাকে মাতাল হতে দেখা গেছে। তবে, নিজেকে সাবধান করে দিল সাঈদ, লাগাম একটু টেনে ধরার সময় এসেছে। অভ্যেসটা নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, বিপদের পড়তে হবে। নাকি এরই মধ্যে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, এখন আর সাবধান হয়ে লাভ নেই?

গান-বাজনার চর্চা আর সেই সাথে গলা ভেজাবার ঠাঁই এই কামরা। ইংরেজী এল অক্ষরের মত আকৃতি। দেয়াল আর সিলিং চকচকে সাদা রঙে রঙ করা। সিলিঙের ভাঁজে লুকানো আছে ঠাণ্ডা আলোর উৎসগুলো। সাদা, কালো আর লাল রঙের মোজাইক করা মেঝে, তার ওপর সাদা-কালো কার্পেট। কামরার প্রতি বাহুতে একটা করে প্রায় সিলিং ছোঁয়া জানালা, ব্রোকেডের পর্দা ঝুলছে, কিনারাগুলো সোনালি জরি দিয়ে মোড়া। ক্লাবের হলঘর এটার চেয়ে প্রশস্ত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়, তাই এই মিউজিক হলেই ভিড় করে সবাই। কোন অনুষ্ঠান না থাকলে হলঘরে কেউ উঁকিও মারে না।

কি নেই এই ক্লাবে?—ভাবল সাঈদ। মদ আর মেয়েমানুষ, যে-দুটোর ওপর তার ভয়ানক দুর্বলতা, চাইলেই এখানে পাওয়া যায়। আর কী সব মেয়ে! কেউ কোটিপতি বাবার বখে যাওয়া একমাত্র দুলালী, কেউ প্রভাবশালী আমলার সম্ভোগ-বিলাসিনী দ্বিতীয় পক্ষ। বিগত-যৌবন অথচ কামনা-পীড়িতা, এরাও আছে, কিন্তু সংখ্যায় কম। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা অবশ্য তাদেরই, কিন্তু পরিবেশটা জমজমাট করে তুলেছে অল্প বয়েসী চঞ্চল প্রজাপতিরা। সাঈদের চোখে, কেউ এখানে অসুন্দরী নয়। দেখতে খারাপ মেয়েও আছে, কিন্তু বয়সের দোষ খোলামেলা পোশাক, নিঃসংকোচ সংলাপ আর অঢেল বৈভব তাদেরকেও আকর্ষণীয় করে তোলে। এখানে যারা আসে তারা সবাই ভাগ্যবান, প্রাচুর্য তাদের হাতের মুঠোয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রাচুর্যের সাথে লেজুড় হিসেবে জুটেছে রুচি-বিকৃতি। রূপের ছটা আর বৈভবের জৌলুস দেখতে হলে এখানে আসতে হবে।

গুলশানের এই ক্লাবে কিছু বিদেশী নাগরিকেরও পৃষ্ঠপোষকতা আছে। তারা বেশিরভাগই বিদেশী দূতাবাসগুলোয় বড় পদে চাকরি করে। সবাইকে সদস্য করা হয় না, সদস্য হতে হলে প্রতিষ্ঠাতাদের কারও জোর সুপারিশ লাগে। নাফিজা সেই রকম একজন প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্যা, শায়লার ছোটবেলার বান্ধবী। রঁদেভো সম্পর্কে শোনার পর থেকেই স্ত্রী শায়লার পিছনে লেগেছিল সাঈদ, শেষ পর্যন্ত নাফিজাকে ধরার জন্যে স্ত্রীকে রাজি করিয়ে তবে ছাড়ে সে। রঁদেভোতে ওদেরকে মেম্বার করাটা নাফিজার জন্যে খুব সহজ হয়নি। শায়লা বড়লোকের মেয়ে বটে, কিন্তু তার স্বামী সাধারণ একজন সরকারী অফিসার মাত্র, চাকরিটা কি ধরনের তাও তেমন স্পষ্ট নয়। সদস্য পদ পাবার আগেই রঁদেভোতে দু'একবার গেস্ট হিসেবে আসা-যাওয়া করল সাঈদ, আর তাতেই সমস্ত অসুবিধে দূর হয়ে গেল। শুধু সুদর্শন বললে সাঈদের ওপর মস্ত

অবিচার করা হবে। পৌরুষ বলতে যা বোঝায়, চেহারায় তার ষোলো আনাই রয়েছে। তার হাঁটার ধরন, ভরাট গলার হাসি মেয়েদের মনে ভাল লাগার আলোড়ন তোলে। শরীরে মেদ নেই, চওড়া হাড়, প্রায় ছয় ফিট লম্বা। হাত দুটো শক্তিশালী। ঘন কালো চুল, একটু কোঁকড়ানো। এসবের সাথে যোগ হয়েছে তার ফিটফাট থাকার অভ্যেসটা। সাঈদের পরিচ্ছদে কেউ কখনও খুঁত খুঁজে পায় না। সব মিলিয়ে সাঈদ লেডিকিলার। মেয়েদের তপস্যা। তাদের আগ্রহেই সদস্য হওয়ার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেল।

পিয়ানো থেকে মুখ তুলল সাঈদ। এদিক ওদিক তাকাল। তার ঠিক উল্টো দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শায়লা। অপরূপ সুন্দরী, কিন্তু যাকে বলে আগুনের মত রূপ, সেরকম নয়। শায়লার সৌন্দর্যের মধ্যে ফুলের কোমল স্নিগ্ধতা, সুরের মিষ্টি ঝংকার আর সাগরের অতল গভীরতা আছে—মন ভোলায়, সৌরভ ছড়ায়, কাছে টানে, কিন্তু পোড়ায় না।

সাধারণ একটা সাদা জর্জেটের শাড়ি পরেছে শায়লা, ব্লাউজটাও সাদা। কানে আর গলায় নকল মুক্তো বসানো ইমিটেশনের হালকা গহনা। একহাতে দু'গাছা সোনার চুরি, আরেক হাতে রিস্টওয়াচ। মুখে হালকা মেকআপ ব্যবহার করেছে সে, ধরা যায় না। তার চোখের সাদা অংশটুকু আশ্চর্য সাদা, কালো অংশটুকু আশ্চর্য কালো, বোধহয় সেজন্যেই কোমল দু'টুকরো আলোর মত লাগে দেখতে। তাকে বেঁটে বলা যাবে না, কোমরটা চিকন, শরীরের কোন অংশ বেঢপ নয়, অথচ বুকের মাপ চৌত্রিশ ইঞ্চি।

স্ত্রীর সাথে চোখাচোখি হতে হাসল সাঈদ, নিজেকে শোনাল, শায়লার মত বউ পেয়েছ তুমি শালা সত্যি ভাগ্যবান।

নড়াচড়া না করে সাঈদের উদ্দেশে শায়লাও হাসল। স্থির দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন পটে আঁকা ছবি, মনোলোভা। রূপ যে কি আশ্চর্য প্রশান্ত হতে পারে, এই মুহূর্তে শায়লাকে দেখলে সেটা বোঝা যাবে।

সাঈদ ভাবল, শায়লা কখনও কোন কিছুতেই অস্থির হতে জানে না। যাই ঘটুক, বিচলিত হবার পাত্রী সে নয়।

কাছের টেবিলটা থেকে একটা গ্লাস তুলে নিল সাঈদ। বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দু'চুমুকে নির্জলাই খেয়ে ফেলল, তারপর আবার ঝুঁকে পড়ল পিয়ানোর ওপর। শায়লার কথাই ভাবছে এখনও। শায়লার মত মেয়ে হয় না। প্রকৃতির মত সর্বংসহা বোধহয় এদেরকেই বলা হয়। আবার যখন মুখ তুলল সে, দেখল, এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে শায়লা, মিটিমিটি হাসছে।

খিল খিল হাসির আওয়াজে ঘাড় ফেরাল সাঈদ। এক কোণে কয়েকজন বিদেশী যুবকের সাথে গল্প করছে জ্যোতি ভাবী, তাদেরই কারও রসিকতায় বিস্ফোরিত হয়েছে সে। মিসেস জ্যোতি রঁদেভোয় যারা আসে তাদের সবার কমন ভাবী। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের ওপর, কিন্তু চালচলন আর হাবভাব দেখে মনে হয় এখনও বুঝি তিনি নিজেকে ষোড়শী বলে মনে করেন। চঞ্চল প্রজাপতির মত আঁচল উড়িয়ে বেড়ান সারাক্ষণ, এর মাথায় হাত বুলান, তার কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করেন আর খিলখিল করে হাসেন। ছোকরা

বয়সীদের সাথেই তার যত আড্ডা, তারাও জ্যোতি ভাবী বলতে অজ্ঞান। শোনা যায়, কারও ওপর যদি জ্যোতি ভাবীর বিশেষ নজর পড়ে, স্বর্গ ও নরকের স্বাদ দুটোই নাকি তাকে পেতে হবে। সাগরের ঢেউয়ের মত একের পর এক অনবরত প্রেজেন্টেশন পাবে সেই ছোকরা, কিন্তু তার প্রায় সবটুকু সময় দখল করে নেবে জ্যোতি ভাবী। কোন দৃষ্টান্ত এখনও চাক্ষুষ করেনি সাঈদ, জানে, এসব ব্যাপারে মানুষ বাড়িয়েই বলে, তবে গুজব রয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে সেই ছোকরাকে নাকি ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দেয় প্রিয় ভাবী। তাগড়া জোয়ান পরিণত হয় হাড্ডিসার কংকালে।

একজন জার্মান যুবক রয়েছে জ্যোতি ভাবীর সাথে, সাঈদ তার নাম জানে না। একজন কানাডিয়ান, একজন অস্ট্রেলিয়ান আর একজন স্পেনিয়ার্ড ও রয়েছে। স্পেনিয়ার্ড লোকটাকে চেনে সাঈদ, নাম দ্য সিলভা। ত্রিশ কি বত্রিশ বছর বয়স, সুদর্শনই বলা যায়। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে কি একটা সরকারী কাজে ঢাকায় এসেছে মাসখানেক হলো। পেশায় কূটনীতিক, এ দেশ থেকে সে দেশ ঘুরে বেড়ানোর চাকরি। কাজ শেষ হলে যে-কোন দিন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে। দ্য সিলভা রঁদেভো ক্লাবের সদস্য নয়, একজন বিদেশী সদস্যের গেস্ট হিসেবে আসা-যাওয়া করছে। সাংঘাতিক মিশুক লোক, এই অল্পদিনেই সবার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেছে।

ওদের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সাঈদ। তার কারণ জ্যোতি ভাবীর হাসিটা তার কাছে কেমন যেন বেসুরো ঠেকছে। ড্রিঙ্ক করে সে, কিন্তু শেরি ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে না। আজ কি ভাবী অন্য কিছু খেয়েছে?

ঠিক তাই। সাঈদ লক্ষ করল, জ্যোতি ভাবী একটু একটু টলছেন। তির্যক একটু হাসি ফুটল সাঈদের ঠোঁটে। খুবই প্রতাপশালী এক সরকারী আমলার স্ত্রী জ্যোতি ভাবী, ভদ্রলোক জানেন তাঁর স্ত্রী সমাজসেবা করেন, তাই বাড়িতে তাকে প্রায় কখনোই পাওয়া যায় না। বিবাহযোগ্য দুই মেয়ের মা জ্যোতি ভাবী, ছেলেটা এ-বছর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে তাদের কোন খবরই বলতে পারবে না। খোঁজ রাখার সময় কোথায়, সারাক্ষণ নিজেকে নিয়েই মত্ত।

জ্যোতি ভাবীকে এড়িয়ে চলে সাঈদ। কেন জানি, জ্যোতি ভাবীও ওকে একটু এড়িয়ে চলে। হতে পারে, সাঈদের চারপাশে সুন্দরী যুবতীদের ভিড় লেগে থাকে দেখেই জ্যোতি ভাবীর এই সাবধানতা। আর সাঈদের এড়িয়ে চলার কারণ, তার অল্প বয়েসী বান্ধবীরা অনেকেই জ্যোতি ভাবীকে বিশেষ পছন্দ করে না। তাছাড়া, মহিলার প্রতি তার কোন আকর্ষণও নেই।

এবার এক এক করে বাকি সবার দিকে তাকাল সাঈদ। নেশা ধরেছে কিনা চিন্তা করে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল ও, সেটা দূর হয়ে গেল। কে টলছে না? কার নেশা হয়নি! নাফিজা স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, তার হাত নাড়ার ধরন দেখেই বোঝা যায়, শ্যাম্পেন আজ একটু বেশিই পড়েছে। তার স্বামী, রায়হান, ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টর, বাহরাইনে দু'হাজার শ্রমিক খাটাচ্ছে। স্ত্রীর কথায় যেভাবে অনবরত মাথা দোলাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হয়

না তাকেও নেশা ভালই ধরেছে। পাশ দিয়ে হেঁটে গেল নাসরিন, টলছে না, কিন্তু হাসিটা আড়ষ্ট। কারণ ওই একই—নেশা।

তার মানে, ভাবল সাঈদ, ক্লাবে আজ যারা উপস্থিত তারা সবাই মাতাল হবার পথে। সবাই, শুধু একজন বাদে। শায়লা ওসব স্পর্শ করে না, অনেক চেষ্টা করেও স্পর্শ করাতে পারেনি সাঈদ। রঁদেভোয় বড় একটা আসেও না শায়লা, বলে পরিবেশটা আমার ভাল লাগে না। আজকের ব্যাপারটা অবশ্য একটু অন্য রকম। আজ নিয়ে গত ছ'মাসে মাত্র ছয় কি সাত দিন এল শায়লা। ওকে নিয়ে কেউ রঙিন স্বপ্ন দেখবে তা সম্ভব নয়, কারণ হাসিখুশি হলেও কোন অবস্থাতেই তরল হতে জানে না শায়লা, তার চারদিকে ব্যক্তিত্বের দুর্ভেদ্য একটা প্রাচীর তোলা আছে, সেটা বুঝতে পেরে কেউ ওকে বিরক্ত করে না। শান্ত, চুপচাপ, নিরীহ ভালমানুষ বলতে যা বোঝায় শায়লা তাই। কোন বদখেয়াল ওর মনে যেন আসতেই পারে না।

আবার চেরির আঙুলে চোখ রাখল সাঈদ। নতুন কি যেন একটা বাজাচ্ছে চেরি। সুরটা ঠিক ধরতে পারছে না সাঈদ, কিন্তু বিষণ্ণতাটুকু ঠিকই স্পর্শ করল ওকে।

জ্যোতি ভাবীর দলটা ভেঙে গেছে, লক্ষ করল সাঈদ। দ্য সিলভার সাথে একা কথা বলছে জ্যোতি ভাবী। ঘন ঘন হাত নাড়ছে, তুবড়ি ছুটছে মুখে—সকৌতুক হাসি নিয়ে শুনছে দ্য  সিলভা। জ্যোতি ভাবী ভালই ইংরেজী বলে, কিন্তু দ্য সিলভা ভাঙা ভাঙা বলে, আর তোতলায়। নাফিজা স্বামীর সঙ্গ ছেড়ে কানাডিয়ান যুবকের সাথে কথা বলছে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল সাঈদ। নাফিজার গলার স্বর মিষ্টি, শুনতে ভাল লাগে। শব্দগুলো ক্ষীণ, একটু সুরেলা ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে সে। বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে ওরা, একটা শব্দও পরিষ্কার ধরতে পারল না সাঈদ।

সেই রাত আটটা থেকেই কেন জানি মনটা খুঁত খুঁত করছে সাঈদের। ঠিক করল, আজ আর মদ খাবে না সে। ভাবল, অভ্যেসটা যদি একেবারে ছেড়ে দেয়া যেত! ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা অবশ্য করেনি কখনও। চেষ্টা করলেও ছাড়তে পারবে না, এই ভয়টাই কাটাতে পারল না সে।

শুধু মন খুঁত খুঁত করছে তাই নয়, আরও একটা কারণে আজ আর খাওয়া উচিত নয় তার। আরও দু'এক পেগ পেটে পড়লেই কোন্ মেয়েকে নিয়ে কি মতলব করা যায়, এই সব চিন্তা ঢুকবে মাথায়। সাথে শায়লা রয়েছে, তার সামনে যদি কোন মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে, শায়লার ওপর নেহাতই অন্যায় করা হবে সেটা। লুকিয়ে চুরিয়ে যা করে, সেটার কথা আলাদা।

পিয়ানোর সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল চেরি, সাঈদের চোখে চোখ রেখে মুচকি একটু হাসল, তারপর গুরুনিতম্ব দুলিয়ে হেঁটে গেল নাসরিনের দিকে। ওরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালে, চোখ ফেরানো দায়। টাইট ফিটিং ট্রাউজার পরে রয়েছে চেরি, সাদা রঙের, শার্টটা লাল। আর নাসরিনের পরনে নীল সালোয়ার কামিজ। দু'জনে প্রায় সমান লম্বা। দু'জনেরই একটা করে শারীরিক ত্রুটি রয়েছে। নাসরিনের কোমরে বেজায় চর্বি। আর মেয়েদের সবচেয়ে বড়

যে আকর্ষণ, সেই বুকই নেই চেরির। তবু, নাসরিনের নাক-চোখের তুলনা মেলা ভার, আর চেরির কোমরের নিচের অংশটা অপূর্ব।

নামজাদা এক শিল্পপতির দ্বিতীয় পক্ষ নাসরিন। কোমরে চর্বি থাক আর যাই থাক, তার নিখুঁত চেহারায় রাজনন্দিনীসুলভ একটা ভারিক্কি ভাব আছে। বেশি বয়স নয়, এই সাতাশ আটাশ হবে, কিন্তু জিন খেতে রোজই একবার রঁদেভোয় তার আসা চাই। নাসরিনের একটা খেয়াল, কোন মেয়েকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দিতে পারলে খুব মজা পায়। কিন্তু মুশকিল হলো, শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সে-ই মাতাল হয়ে পড়েছে। অনেক লম্বা সময় নিয়ে, একটু একটু করে খায় সে। খায়ও প্রচুর।

চেরির ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। সে-ও মদ খেতে অভ্যস্ত, কিন্তু রোজ বড়জোর দু'পেগ, তার বেশি এক ফোঁটাও নয়। মদ খেয়ে টলতে বা মাতাল হতে কেউ দেখেনি তাকে। যা করলে নিজের ওপর কর্তৃত্ব থাকে না, তেমন কাজ করার মেয়ে চেরি নয়।

চেরির বয়সও ওই রকম হবে, ছাব্বিশ কি সাতাশ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে সাঈদের, এই বয়সে দু'দু'বার ডিভোর্স নিয়েছে সে। প্রথম স্বামী ছিল একজন উঠতি রাজনীতিক। বছরের বেশিরভাগ সময় জেলে থাকতে হয়, স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে পারে না, এই অজুহাতে তাকে ত্যাগ করে চেরি। দ্বিতীয় স্বামী ছিল একজন ব্যবসায়ী। লোকটার আরেকটা বউ আছে জানার পর মামলা ঠুকে জিতে গেছে চেরি। তার পিতৃপরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না সাঈদ। তবে শুনেছে, চেরির আদমবেপারী বাবা অনেক দিন আগে বিদেশে কোথাও মারা গেছে। সম্ভবত আবুধাবী বা কুয়েতে, ঠিক মনে নেই সাঈদের। মা-বাবার সাথে চেরি নিজেও বিদেশে ছিল। বাবা মারা যাবার পর দেশে ফিরে আসে সে, তখন সে নাবালিকা। সাবালিকা হবার পর বাবার রেখে যাওয়া টাকা ব্যাংক থেকে তোলার জন্যে বিদেশে আবার যেতে হয় তাকে। বছরে দু'বছরে এক-আধবার এখনও বিদেশে যায় সে। গুলশানে ছোট্ট একটা বাড়ি আছে তার। রাজনীতিককে বিয়ে করার পরপরই তার মা মারা যায়। দ্বিতীয় স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বাড়িতেই উঠেছে। চাকর-চাকরানীদের বাদ দিলে, একাই বসবাস করে চেরি। তার আয়ের উৎস সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে কিছু জানা না গেলেও, খরচের লম্বা হাত দেখে বোঝা যায়, অভাবে পড়ার ভয় তার নেই। মামলায় জিতে দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর বাবদ মোটা টাকা পেয়েছে সে। বাবাও মেয়ের জন্যে বেশ ভাল একটা অংশ রেখে গেছে।

আবার শায়লার কথা ভাবতে শুরু করল সাঈদ। আচ্ছা, শায়লা যদি কোনদিন তার ব্যাপারটা জেনে ফেলে? মানে, মেয়েদের প্রতি তার এই দুর্বলতার ব্যাপারটা? আরও একটা ব্যাপার চেপে রেখেছে সে, সেটার কথা অবশ্য নিজে থেকে কোন কালেই জানতে পারবে না শায়লা। কিন্তু যদি জানে…ধরা যাক, সেই প্রকাশ করে দিল, কিভাবে নেবে শায়লা? আপনমনে হাসল সাঈদ। জানে, শায়লা তাকে ভালবাসে। শায়লার যদি মনে হয় দু'বছর

ধরে ব্যাপারটা গোপন করে রাখা তার অন্যায় হয়েছে, তবু ক্ষমা পাবে সে। বলা যায় না, শায়লা হয়তো সব জানার পর তাকে আরও বড় হিরো ভাবতে পারে।

শায়লা জানে, সরকারী একটা চাকরি করে সাঈদ। কিন্তু চাকরির ধরনটা এমনই যে রোজ রোজ অফিস করতে হয় না। তবে, যখন-তখন ডাক পড়তে পারে, তখন সব ফেলে ছুটতে হবে। এমনও দেখা যায়, তিন চার দিন বাড়ি ফিরতে পারল না সাঈদ। এরকম হতে পারে, আগে থেকে সাবধান করা আছে, তাই আশ্চর্য হয় না শায়লা। কাজটা যে বিপজ্জনক, যে-কোন মুহূর্তে প্রাণ হারাতে হতে পারে, শায়লাকে এটা বুঝতেই দেয় না সাঈদ। চাকরিটা যে সরকারী, কাগজ-পত্র দেখিয়ে সেটা অবশ্য সাঈদকে প্রমাণ করতে হয়েছে। সে-সব কাগজ থেকে জানা যায়, সাঈদ একটা মন্ত্রণালয়ে কাজ করে, বিশেষ একটা ডিপার্টমেন্টের টেকনিক্যাল উপদেষ্টা সে। ভাল বেতন পায় সাঈদ, সুখেই আছে তারা।

চাকরির গুমর ফাঁস হলে তেমন কিছু না, কিন্তু মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, শায়লা সেটা মেনে নেবে বলে মনে হয় না। এই একটি কারণে প্রায়ই দুশ্চিন্তায় ভোগে সাঈদ। শুধু দুশ্চিন্তাই নয়, সেই সাথে একটা অপরাধবোধও সুযোগ পেলেই তাকে কামড় দেয়। আচ্ছা, ইতোমধ্যেই শায়লা কিছু আঁচ করেনি তো?

রোজই একবার ক্লাবে চলো বলে সাধে সাঈদ, জানে শায়লা আসবে না। আসেও না। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা ঘটল। রাত আটটায় বাড়ি ফিরে ক্লাবে আসার জন্যে তৈরি হচ্ছে সাঈদ, শায়লা উপযাচক হয়ে প্রস্তাব দিল, আজ আমাকে নিয়ে যাবে? মনে মনে অবাক হলেও, কোন প্রশ্ন করেনি সাঈদ। নিয়ে এসেছে সাথে করে। কিন্তু সেই থেকে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে সে। হঠাৎ আজ কেন আসতে চাইল শায়লা? আটটায় বাড়ি ফিরে ড্রইংরুমে অদ্ভুত একটা গন্ধ পেয়েছিল সে। শায়লাকে জিজ্ঞেস করায় বলল, কই, আমি তো কিছু পাচ্ছি না। সাঈদ তারপরও বলেছিল, কেমন যেন একটা মিষ্টি চুরুট চুরুট গন্ধ। কিন্তু এরপর শায়লা কোন মন্তব্য করেনি। তার অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়িতে কেউ গিয়েছিল নাকি? ঈর্ষাকাতর লোকের তো আর অভাব নেই, তাদের কেউ যদি গোপনে শায়লার সাথে দেখা করে সব ফাঁস করে দিয়ে থাকে, আশ্চর্য হবার কি আছে!

দুশ্চিন্তা থেকে সাঈদকে আপাতত রেহাই দিল চেরি। পিয়ানোর সামনে ফিরে এল সে। জানতে চাইল, 'বলো, সাঈদ, কি শুনতে চাও তুমি?'

চেরির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল সাঈদ, বলল, 'শুধু আমার জন্যে বাজাবে?'

সাঈদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাকা আপেলের মত রাঙা হয়ে উঠল চেরি। 'তোমার জন্যে, শুধু তোমারই জন্যে, সুইটহার্ট।'

'তাহলে যা তোমার খুশি...'

'আই শ্যাল বি গ্ল্যাড হোয়েন ইউ আর ডেড, ইউ রাস্কেল ইউ—

বাজাই?'

'বাট ইউ ডোন্ট রিয়েলি মীন দ্যাট, ডু ইউ?'

পাকা অভিনেত্রীর মত ওর দিকে কটাক্ষ হানল চেরি। 'হোয়াই নট?' বলে বাজাতে শুরু করল সে। বিষাদ নয়, অভিমানের সুরে ভাল লাগল সাঈদের। ভাবল, আমার পছন্দটা জানে চেরি। জানার কথাও। নিরিবিলিতে প্রচুর সময় কাটিয়েছে ওরা দু'জন, পরস্পরকে জানার জন্যে যথেষ্ট।

বসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে ছয়তলায় নেমে এল সোহেল। আউটার রুমে ঢুকতেই পারভিন জানতে চাইল, 'চা দিই?'

'দাও,' বলে নিজের রুমে ঢুকল সোহেল। চেয়ারে বসে হাতের ফাইলটা খুলে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

হেদায়েত খানের ফাইল এটা। এতে যা আছে সবই সোহেলের মুখস্থ, তবু শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে।

নাম: হেদায়েত খান মোরশেদ।

জন্মস্থান: বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

জন্ম তারিখ: ১ মে, উনিশশো পঁচিশ।

পেশাগত যোগ্যতা: ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে তিন বছর চাকরি করে, উনিশশো আটচল্লিশে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসার পর পাঞ্জাব রেজিমেন্টে নিয়মিত সৈনিক হিসেবে যোগ দেয়। উনিশশো আটান্ন সালে ক্যাপ্টেন হয়, সে-বছরই শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে একদল সৈনিক পাঠানো হয় মিশরে, সেই দলে সে-ও ছিল। সিনাইয়ের যুদ্ধে মিশর হেরে যায়, হেদায়েত বাদে পাকিস্তানী সৈনিকদের বাকি সবাই মারা পড়ে। হেদায়েত ইসরায়েলিদের হাতে বন্দী হয়। তিন বছর পর একটা বন্দী-বিনিময় সই হলে হেদায়েতকে মিশরের হাতে ফিরিয়ে দেয় ইসরায়েল। পাকিস্তানে ফিরে না এসে নাগরিকত্ব নিয়ে মিশরেই থেকে যায় হেদায়েত। ওখানে থাকতেই তিনটে বিয়ে করে—তার দুই বউ ইহুদী। মিশরে সে দামী পাথর কেনা বেচার ব্যবসা ফাঁদে। জানা যায়, মিশরীয় সামরিক অফিসাররাই তার প্রধান খদ্দের ছিল। তিন বছর পর, কি এক রহস্যময় কারণে গা ঢাকা দেয় হেদায়েত, রাতারাতি কায়রো ছেড়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু তার পরিবার ওখানেই থেকে যায়। এরপর বেশ কিছুদিন তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। মাস কয়েক পর জানা যায়, লেবাননে নতুন আস্তানা গেড়েছে সে। কিন্তু লেবাননে মাত্র এক বছর থাকতে পারে, সন্দেহজনক আচরণের অভিযোগ তুলে লেবানন সরকার দেশ থেকে বহিষ্কার করে তাকে। লেবানন থেকে গোপনে আবার মিশরে প্রবেশ করে সে। তিন বউকে পাঠিয়ে দিয়ে সুইডেনে। এরপর তাকে জর্দানে দেখা যায়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেখান থেকেও

পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় সে। উনিশশো সত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল সে, তারপর হঠাৎ তাকে পাকিস্তানে দেখা যায়। ওখানে সাত বছর ছিল, চোরাই পাথরের ব্যবসা করে ভালই রোজগার হত। এখানেও তার প্রধান খদ্দের ছিল পাকিস্তানের সামরিক অফিসাররা। উনিশশো তিরাশি সালে বাংলাদেশে ফিরে আসে সে। বছরে এক থেকে দু'বার সুইডেনে বেড়াতে যায় সে।

বর্তমান অবস্থা: বিদেশ থেকে যথেষ্ট টাকা নিয়ে ফিরেছে হেদায়েত। খায়দায়, ঘুরে বেড়ায়, বিশেষ করে সামরিক অফিসার-দের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার তালে থাকে। সাভারে একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করেছে সে, সেখানেই বসবাস করে। চাকর-বাকররা রাতে কেউ ওখানে থাকে না। কলেজ পড়ুয়া এক যুবক তার কাছে থেকে লেখাপড়া করছে, তার সেক্রেটারির দায়িত্ব সে-ই পালন করে। ইসরায়েলের সাথে সরাসরি রেডিও যোগাযোগ রয়েছে তার। রেডিওটা তার বাড়িতেই। ঘুরে ফিরে নিজেই তথ্য সংগ্রহ করে, তবে কয়েকজন লোকের সাহায্যও নেয়—যারা তাকে সহায়তা করে তারা জানেও না হেদায়েতকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগান দিচ্ছে তারা, কিংবা এতে করে দেশের কত বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সে-সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা নেই…

চা নিয়ে ঢুকল পারভিন। কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না, চা রেখে বেরিয়ে গেল। পনেরো মিনিট পর ফাইল থেকে মুখ তুলল সোহেল। বন্ধ করল সেটা। তারপর ডাকল পারভিনকে, 'শুনে যাও।'

ভেতরে ঢুকে পারভিন দেখল, সিগারেট ধরাচ্ছে সোহেল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ইঙ্গিত করল, ডেস্ক থেকে হেদায়েত খানের ফাইলটা তুলে নিল পারভিন। 'ফাইলটা ক্লোজ করতে পারো তুমি, পারভিন,' বলল সে। 'কনক্লুডেড লিখে আমাদের মহফেজখানার এন.এফ.এ. বক্সে পাঠিয়ে দাও।'

'তারমানে, নো ফারদার অ্যাকশন?' জানতে চাইল পারভিন।

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল সোহেলের। 'হ্যাঁ, তারমানে নো ফারদার অ্যাকশন।' চেয়ারে হেলান দিল সে, তারপর জানতে চাইল, 'সেতু ইঞ্জিনিয়ার এখন কোথায়, বলতে পারো?'

'বাড়িতে,' জবাব দিল পারভিন। 'তিন হপ্তা হলো কোন কাজ নেই তার হাতে। আজ সন্ধের সময় ফোন করেছিল। দরকার, সোহেল ভাই?'

'হ্যাঁ। ওর সাথে যোগাযোগ করো। বলো, যেন তৈরি হয়ে থাকে। আমি এক সময় টেলিফোন করব—আজ রাতেই। আরও বলবে, সাঈদ কোথায় আছে তা যেন জেনে রাখে সে।'

'ঠিক আছে।'

'আমি যাচ্ছি,' চেয়ার ছাড়ল সোহেল। 'সেতুর সাথে কথা বলার পর তোমার ছুটি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সোহেল।

ছোটবেলা থেকেই কলকব্জা আর মেশিনপত্রের দিকে ঝোঁক সেতুর। হাতের

কাছে একটা কিছু পেলে হয়, সেটার নাড়ি নক্ষত্র না বোঝা পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি নেই। পড়াশোনায় ভাল, মফস্বল থেকে ঢাকায় এসে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষার ঠিক আগে দেশের বাড়িতে মারা গেলেন বাবা। পরীক্ষা দিল বটে, কিন্তু রেজাল্ট ভাল হলো না। এরপর শুরু হলো চাকরি পাবার সাধনা। দেশে মা, ছোট দুই ভাই, বিবাহযোগ্য এক বোন, বাবা মারা যাওয়ায় এদের সবার দায়িত্ব এখন তার কাঁধে। কিন্তু মাসের পর মাস কাটল, একটা চাকরি আর জোটাতে পারল না সেতু। তারপর খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে তার মাথায় নতুন এক বুদ্ধি গজাল। বিক্রয় কলামে ছাপা হয়েছে বিজ্ঞাপনটি, লেখা হয়েছে, 'একটি চালু রেডিও মেরামতের দোকান, যন্ত্রপাতিসহ বিক্রয় করা হইবে। মালিক বিদেশগামী।' রেডিও মেরামত করা সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট ছিল না সেতুর, এ-বিষয়ে তার পড়াশোনাও নামমাত্র, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এমন কোন রেডিও নেই যেটা সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আবার জোড়া লাগাতে না পারবে।

দোকানটা মগবাজার এলাকায়, দেখে এল সেতু। মালিকের সাথে আলাপও হলো। লোকটার টাকার খুবই দরকার, কম দামে ছেড়ে দেবে দোকান। তিন দিনের সময় নিয়ে লঞ্চে চেপে দেশে ফিরল সেতু। মাকে বোঝাল, চাকরির চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা অনেক ভাল, শেষ সম্বল তোমার হাতের বালা দু'গাছা দাও, দোকানটা কিনে ফেলি। ছেলেকে চেনেন মা, নিঃসংকোচে খুলে দিলেন হাতের বালা।

শুরু হলো সেতুর রেডিও মেরামতের ব্যবসা। প্রথম এক বছর কিছুই ঘটল না। হপ্তায় দু'একটা রেডিও মেরামতের জন্যে আসে, তাতে যা ক'টাকা পাওয়া যায়, সেতুর প্রয়োজন মেটে না। পরিবর্তন দেখা দিল দ্বিতীয় বছরের শুরুতে। ইতোমধ্যে কয়েকশো রেডিও মেরামত করেছে সেতু, খদ্দেররা তার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে ধীরে ধীরে। তারই ফল আসা শুরু হলো। এরমধ্যে খদ্দেররা জেনে ফেলেছে, একটা রেডিও মেরামতের জন্যে অন্য দোকান যদি দুশো টাকা চায়, সেতু চায় মাত্র একশো পঁচিশ টাকা। তাছাড়া অন্য দোকানে মেরামত করালে দু'দিন পরই সেটা আবার নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেতুর দোকানে মেরামত করালে এক কি দু'বছরের জন্যে গ্যারান্টি দেয়া হয়। এপ্রিল মাসে একজন সহকারী রাখতে হলো সেতুকে। জুন মাসে আরও দু'জন লোক রাখতে হলো। সেপ্টেম্বর মাসে ধানমণ্ডি এলাকায় বড়সড় আরেকটা দোকান ভাড়া নিল সেতু, সেই সাথে টেলিভিশন আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামতের আয়োজন রাখা হলো। বছরের শেষের দিকে ব্যবসা একেবারে ফেঁপে উঠল তার। ইতোমধ্যে লোকে তাকে সেতু ইঞ্জিনিয়ার বলে ডাকতে শুরু করেছে। দেশ থেকে মা ও ভাইবোনদের ঢাকায় নিয়ে এসেছে সে। বোনের বিয়ে দিয়েছে, ভাই দুটোকে ভর্তি করেছে স্কুলে, মায়ের চোখের ছানিও অপারেশন হয়েছে। বছরের শেষ দিকেই মাসুদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয় সেতুর। তারিখটা আজও তার মনে

আছে, তেরোই নভেম্বর, উনিশশো বিরাশি সাল। সেতুর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা।

সেতুর দোকানে খুব দামী একটা রেডিও মেরামত করতে নিয়ে এসেছিল রানা। এসব মেরামতি কাজের দিকে ওরও প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল এক সময়। সময়ের অভাবে এসব চর্চা এখন বাদ। সেতুর ভদ্র, শান্ত ব্যবহারটি ওর খুব ভাল লেগে যায়। ভাল লাগাটা আরও গভীরতা লাভ করে ছোট্ট একটা ঘটনায়। রেডিওটা মেরামত করতে হলে কয়েকটা নতুন স্পেয়ার পার্টস লাগাতে হবে, কিন্তু ঢাকার বাজারে সেগুলো কিনতে পাওয়া যায় না। কোথাও থেকে যদি পুরানো পার্টস জোগাড় করা সম্ভব হয় তবেই সেটটা মেরামত করা যাবে। সেট খুলে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল সেতু। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হবে। রানা জানতে চাইল, কত লাগবে? সেতু বলল, একশো পঁচিশ টাকা। আকাশ থেকে পড়ল রানা। পার্টস যদি কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলোরই দাম পড়বে তিনশো টাকার মত। তারপর মজুরি আছে। জানতে চাইল এত কমে পারবেন? পার্টস কিনতে হবে না আপনাকে? সেতু সহাস্যে বলল, পার্টস আমার কাছে আছে, অনেক দিন থেকেই পড়ে আছে, কোন কাজে লাগছে না—এই সুযোগে ওগুলোকে বিদায় করা যেতে পারে। রানা জানতে চাইল, ওগুলোর দাম…? সেতু বলল, হ্যাঁ কোথাও যদি পানও, কম করেও সাড়ে তিনশো টাকা পড়বে। কিন্তু সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আমি ওগুলো পঁচিশ টাকায় কিনেছিলাম, বিক্রি করছি একশো টাকায়, পঁচাত্তর টাকা লাভ করছি। যথেষ্ট। বাকি পঁচিশ টাকা আমার খাটনির দাম।

এরপর শুধু রানা একা নয়, ওর বন্ধু বান্ধবরাও কিছু মেরামত করার দরকার হলে সেতুর দোকানে এসে হাজির হতে শুরু করল। লেখাপড়া জানা চরিত্রবান যুবক, মার্জিত স্বভাব, দুনিয়াদারির খবর রাখতে চেষ্টা করে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন, দিনে দিনে রানার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। তারপর একদিন একটা প্রস্তাব পেল সেতু। সে কি দেশের জন্য কিছু কাজ করতে চায়? তার কি প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়ার সাহস আছে?

রানা প্রস্তাবটা আভাসে-ইঙ্গিতে দিলেও, বুদ্ধিমান সেতু আসল ব্যাপারটা ঠিকই আঁচ করে নেয়। ভাবনা-চিন্তার জন্যে কয়েকটা দিন সময় নেয় সে। মায়ের সাথে পরামর্শ করার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু মাসুদ ভাই নিষেধ করে দিয়েছেন, সে-ও কথা দিয়েছে এ-বিষয়ে কারও সাথে কোন আলাপ করবে না। কথা রাখল সেতু, কারও সাথেই আলাপ করল না। সাতদিন পর মাসুদ ভাইয়ের সাথে আবার কথা হলো। দেশের জন্যে কাজ করতে চায় সেতু। এ-কাজে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতেও তার কোন আপত্তি নেই।

প্রথম প্রথম হালকা, ছোটখাট কাজ পেল সে, যে-সব কাজে বিপদের তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। তারপর ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেতে শুরু করল।

লোক চিনতে ভুল করেনি রানা। সেতুর দ্বারা যে সম্ভব, ওর এই ধারণাটা সত্য প্রমাণিত হলো। আজ পর্যন্ত কোন কাজেই ব্যর্থ হয়নি সেতু, ছোটখাট ভুল-ত্রুটি অবশ্য এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। সময়ের সাথে সাথে

এসবও কাটিয়ে উঠবে।

ইতোমধ্যে তিনমাস মেয়াদের তিনটে ট্রেনিং কোর্স শেষ করেছে সেতু। আর ছ'মাসের একটা ট্রেনিং শেষ করতে পারলেই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বিদেশে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবে সে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কয়েকটা বিদেশী ভাষা শিখছে সে। অবশ্য আরও কিছুদিন চর্চা চালিয়ে গেলে তবেই ভাষাগুলোর ওপর ভাল দখল আসবে তার।

রোজকার মত দোকান বন্ধ করে আজও সরাসরি বাড়ি ফিরেছে সেতু। রাত এগারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়েও পড়েছে। মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বিদেশী ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বুলাচ্ছে।

প্রথম টেলিফোন এল এগারোটা পনেরোয়। সাথে সাথে কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে নিল সেতু। বাড়ির সবাই জানে, একটা মন্ত্রণালয়ের ওয়্যারলেস মেরামতের কন্ট্রাক্ট পেয়েছে সে, দরকার পড়লেই ডাক আসতে পারে। সেই মন্ত্রণালয় থেকে একটা নিযুক্তি-পত্রও দেয়া হয়েছে সেতুকে। মা ঘুমিয়েছেন, মেজো ভাইটিকে ডেকে আগেভাগেই জানিয়ে রাখল, মন্ত্রণালয় থেকে ডাক আসতে পারে, এলেই চলে যেতে হবে তাকে।

দ্বিতীয় ফোনটা এল আরও আধ ঘণ্টা পর। রিসিভার তুলল সেতু। 'সেতু ইঞ্জিনিয়ার।'

'সোহেল। সাঈদ কোথায়, সেতু?'

'রঁদেভোয়। সন্ধের খানিক পর ওর সাথে আজ আমার দেখা হয়েছিল, তখনই বলল, রাত একটা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে সে। ওখানের নাম্বার জানা আছে আমার।'

'ঠিক আছে,' বলল সোহেল। 'ওকে ফোন করো। বলো সেই জায়গায় আমার সাথে দেখা করতে হবে। সাড়ে বারোটায় পৌঁছুতে হবে ওকে। আজ রাতে তোমাদের দু'জনের ওপরই কাজ পড়েছে। কাজটা সাঈদের, কিন্তু তোমার সাহায্য লাগবে ওর।'

কাজের কথা শুনে হার্টবিট বেড়ে গেল সেতুর, অদ্ভুত একটা পুলক অনুভব করল। 'ঠিক আছে।'

'ওকে ফোন করার পর বাড়িতেই অপেক্ষা করো তুমি,' বলল সোহেল। 'সাঈদ তোমার সাথে পরে যোগাযোগ করবে, আমার সাথে কথা বলার পর। রাখলাম।'

রঁদেভো ক্লাবের নাম্বারে ডায়াল করতে শুরু করল সেতু।

টুং-টাং-টুং-টাং···। দেয়াল ঘড়িতে বারোটা বাজল। দরজার কাছাকাছি একটা সোফায় একা বসে আছে সাঈদ, চোরা চোখে লক্ষ করছে নাফিজাকে। রায়হানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবত কামরার আরেক দিকে, সোফায় তাকে শুইয়ে রেখে এসেছে নাফিজা। প্রায় রোজই মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে লোকটা।

কানাডিয়ান যুবক বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর থেকেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে নাফিজা। সবাই নিজেকে বা আর কাউকে নিয়ে ব্যস্ত, কোথাও ভিড়তে পারছে না সে। তার যারা ভক্ত, আজ তারা এখনও এসে পৌঁছায়নি, আজ বোধহয় আসবেও না। স্বামী মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পরই কারও সাথে একটু স্বাধীন ভাবে মেলামেশার সুযোগ পায় সে, কিন্তু আজকের সুযোগটা বোধহয় মাঠেই মারা গেল। ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ি রেডি করতে বলবে কিনা ভাবছে, এই সময় তার নজরে পড়ল, তারই মত একা হয়ে গেছে সাঈদও।

নাফিজা আর সাঈদ, দু'জনের কেউই পরস্পরের খুব একটা কাছাকাছি আসে না। নাফিজা শায়লার ছোটবেলার বন্ধু, সংকোচের কারণ বোধহয় সেটাই। কিন্তু সাঈদ এর আগেও লক্ষ করেছে, তার দিকে চোরা চোখে লোভাতুর দৃষ্টি হানতে কসুর করে না নাফিজা। আর নাফিজারও জানা হয়ে গেছে, সুযোগ দিলে মাথায় চড়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে সাঈদ।

সংকোচের বেড়াটা আজ বোধহয় ভেঙে ফেলা যায়।

ধীরে পায়ে এগিয়ে এল নাফিজা, চোখ মটকে সহাস্যে জিজ্ঞেস করল, 'কি দুলাভাই, আজ বোধহয় একটু বেশি হয়ে গেছে?' শায়লার চেয়ে বোধহয় দু'এক বছরের ছোটই হবে নাফিজা, সেই সূত্রে এই সম্বোধন। 'বেশি খেতে পারে, অথচ আউট হয়ে যায় না, এদেরকে আমার দারুণ ভাল লাগে।'

'কি সর্বনাশ!' সোফার ওপর সিধে হয়ে বসল সাঈদ। 'উৎসাহ দিয়ো না, প্লীজ! মারা পড়ব। জিনিসটা আমি ছাড়তে চাই...'

অন্য সময় হলে খিলখিল করে হেসে উঠত নাফিজা, কিন্তু এই মুহূর্তে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না বলে যতটা না হাসল তারচেয়ে বেশি শরীর দোলাল। তারপর বলল, 'আপনি ছাড়বেন মদ! তবেই হয়েছে! এ আমি বিশ্বাস করি না! মদ আর ওই জিনিসটা—এ-দুটো একবার অভ্যেস হয়ে গেলে আর ছাড়া সম্ভব নয়।'

'কোন জিনিসটা?' সাথে সাথে জানতে চাইল সাঈদ।

'মশাই, ন্যাকামি রাখুন!' সকৌতুকে ব্যঙ্গ ঝরল নাফিজার গলায়। 'আপনি মনে করেন কেউ কিছু জানে না, না?'

মুচকি হাসল সাঈদ। 'তুমি যে অনেক কিছু জানো, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। তা, ব্ল্যাকমেইল করার ইচ্ছে নেই তো?'

'সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে?' নাফিজার মিষ্টি কণ্ঠস্বর সাঈদের কানে যেন মধুবর্ষণ করল।

'তা ঠিক,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে মাথা ঝাঁকাল সাঈদ। 'কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলেই বিপদ, তাই না?'

'অত ভয় করলে কি চলে,' বলল নাফিজা। শাড়ির আঁচল বুক থেকে খসে পড়তে দিল সে। 'বিপদের ঝুঁকি না থাকলে মজাটাই তো মাটি। কি, ঠিক বলিনি?'

চোখের কোণে শায়লাকে দেখতে পেল সাঈদ। এক ধারে দাঁড়িয়ে

রয়েছে শায়লা। দ্য সিলভার সাথে কথা বলছে সে। আবার কি যেন বলল নাফিজা। কিন্তু শুনতে পেল না সাঈদ। চোখ আর মন, দুটোই তার দ্য সিলভার দিকে।

সন্দেহ নেই, সিলভার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা মেয়েদেরকে টানে। হঠাৎ করেই ব্যাপারটা উপলব্ধি করল সাঈদ—মেয়েদের গুণকীর্তনে ওস্তাদ লোক সিলভা, আর তার স্মার্টনেসের কোন তুলনা হয় না। এই দুটো কারণেই মেয়েরা তার এত ভক্ত। এসবের সাথে যোগ হয়েছে তার সুপুরুষ চেহারা। যেমন লম্বা সে, তেমনি স্বাস্থ্যবান। রোদে পোড়া ফর্সা রঙটাও অতিরিক্ত একটা আকর্ষণ। সব সময় হাসিখুশি, মিশুক, সহজেই আপন হয়ে উঠতেও জানে। সাঈদের মনে হলো, এসবই সিলভার বাইরের চেহারা। তার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রয়োজনে এই লোক হিংস্র হয়ে উঠতেও জানে। এই বিশ্বাসের পেছনে কোন কারণ বা যুক্তি খুঁজে পেল না সে, কিন্তু বিশ্বাসটাকে অহেতুক বলে মন থেকে মুছেও ফেলতে পারল না। ভাবল, আচ্ছা সিলভা সম্পর্কে শায়লার কি ধারণা?

আজকে নিয়ে চারবার দেখা হলো ওদের। গত হপ্তায় পার্টি দিয়েছিল সাঈদ, রঁদেভোর প্রায় সবাই সেদিন জড়ো হয়েছিল ওদের বাড়িতে। সাঈদের চোখ এড়ায়নি, সিলভার দৃষ্টি সারাক্ষণ শায়লাকে অনুসরণ করছিল। এর আগে নাফিজা বেগমের বাড়িতেও সিলভার সাথে দেখা হয় শায়লার। সেবারও, লক্ষ করেছে সাঈদ, আর সবাইকে বাদ দিয়ে শায়লার দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল সিলভা। তারও আগে, এই রঁদেভোয় শায়লাকে প্রথম দেখে সিলভা। পরিচয়ের প্রথম দিন, শায়লাকে নিয়ে হাস্য-কৌতুকের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল সিলভা।

'থামলে কেন, কথা বলো,' নাফিজাকে বলল সাঈদ। 'তোমার গলা খুব মিষ্টি, শুনতে ভাল লাগে।'

প্রশ্ন হলো, ভাবল সাঈদ, শায়লা কখনও কারও দিকে ঝুঁকবে কিনা। কথাটা মনে হতেই হাসি পেল ওর। এসব কি আবোল-তাবোল ভাবছে সে। শায়লা তেমন মেয়েই নয়। তারপর নিজের সাথে রসিকতা করল—তুমি যদি ডজন ডজন মেয়ের সাথে শুতে পারো, শায়লা এক-আধজন পুরুষের সাথে শুলে ক্ষতি কি? তারপর ভাবল, সিলভার ব্যাপারটাকে কি সিরিয়াসলি নেয়া উচিত হবে? দু'দিনের চিড়িয়া, যে-কোন দিন উড়ে যাবে, দরকার কি ঘাঁটাঘাঁটি করে। শায়লার পিছনে ঘুরে যদি মজা যায়, পাক গে। শায়লা তো আর ব্যাটাকে প্রশ্রয় দিতে যাচ্ছে না।

প্রশ্রয় হয়তো দেবে না, আবার ভাবল সাঈদ, কিন্তু শায়লার একটা ব্যাপার হলো, সবার সাথেই অস্বাভাবিক ভাল ব্যবহার করে ও। এমনই ভালমানুষ, কারও মনে আঘাত দিতে জানে না। এই ভালমানুষিটুকুই বিপদ ডেকে আনতে পারে, ভুলে কেউ ভাবতে পারে, তাকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই প্রচার হয়ে গেছে, সিলভা সুখী নয়, প্রেমিকা প্রতারণা করার পর থেকে জীবনের ওপর তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে, তার মত নিঃসঙ্গ লোক নাকি

দুনিয়ায় আর দুটো নেই। এই সব প্রচার শায়লার মত একটা মেয়ের কাছ থেকে সহানুভূতি আর কোমল হৃদয়ের একটা অংশ পাবার জন্যে যথেষ্ট। ভয়টা সাঈদের সেখানেই।

মনে মনে ঠিক করল সাঈদ, চোর চুরি করার আগেই সাবধান হওয়া দরকার। মন-মেজাজ ভাল থাকলে দু'একদিনের মধ্যেই শায়লার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে হালকা সুরে আলাপ করবে সে। তাতে অন্তত ওর মনোভাবটা বোঝা যাবে।

কিন্তু সাঈদের জানা নেই, ব্যাপারটা নিয়ে শায়লার সাথে আলাপ করার সুযোগ আর হবে না তার।

সবার দিকে পিছন ফিরে, সাঈদের সামনের একটা সোফায় বসে পড়েছে নাফিজা। নিচু গলায়, শুধু যাতে সাঈদ শুনতে পায়, বলছে সে, 'অনেকদিন আপনি আমাকে ফোন করেন না, কারণ কি?'

কোথায় যেন কি বাজছে, সম্ভবত টেলিফোন। হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠল সাঈদ। তার মনে হলো, তাকেই কেউ ফোন করেছে। নিজেকে তিরস্কার করল সে, এতটা হুইস্কি খাওয়া আজ তোমার উচিত হয়নি। এবার এসব ছাড়ার চেষ্টা করো, তা না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

'কেউ জানবে না তো?' জিজ্ঞেস করল সাঈদ। হাসল ও। হাসলে তার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'দুলাভাই, আপনি কি বোকা!' অসহায় একটা ভঙ্গি করল নাফিজা। 'আপনি কি মনে করেন, রায়হান সব সময় আমাকে পাহারা দিয়ে রাখে?'

'সাঈদ, তোমার টেলিফোন,' হলঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল জ্যোতি ভাবী।

'ধন্যবাদ, ভাবী,' বলে সোফা ছাড়ল সাঈদ। একটুও অবাক হয়নি ও। তিন হপ্তা ধরে হাতে কোন কাজ নেই, ফোন আসবে বলে। যদি কোন অ্যাসাইনমেন্ট হয়, কি ধরনের হতে পারে? কঠিন? আচ্ছা, সত্যিই কি আজ হুইস্কি একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে? কই, টলছি তো না! চোখেও তো ঝাপসা দেখছি না। নাহ্, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

ফোনের সামনে পৌঁছে থামল সাঈদ। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল কাছে পিঠে কেউ আছে কিনা। তারপর রিসিভার তুলল, 'হ্যালো! আমি সাঈদ।'

'সেতু। সোহেল ভাই তোর সাথে কথা বলতে চান।'

'ঠিকই আছে। কখন?'

'এখনই। মনে হলো জরুরী একটা কাজ দেবেন। এখুনি দেখা করতে বললেন তোকে। আমাকেও তৈরি হয়ে থাকতে বলেছেন।'

তলপেটের কাছে একটা মোচড় অনুভব করল সাঈদ। খারাপ, নার্ভাস বোধ করার লক্ষণ। আবার তিরস্কার করল নিজেকে, আরও দু'পেগ কম খেলে হত না! বলল, 'ঠিক আছে। সেই জায়গায়, তাই না? এক নম্বর সেফ হাউসে?'

'হ্যাঁ। আমি তাহলে বাড়িতে অপেক্ষা করি, যোগাযোগ করিস।'

'ঠিক আছে। ব্যাপারটা কি আগে জানি, তারপর।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সাঈদ।

হলঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখা হয়ে গেল শায়লার সাথে। বোধহয় ওর খোঁজেই এদিকে আসা তার। স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শায়লা। বলল, 'খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা হলো, না?'

হেসে ফেলল সাঈদ। 'মানে···তোমার বুঝি ধারণা, এত রাতে কোন মেয়ে আমাকে ফোন করেছিল?'

হাসিটা শায়লার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। হাসলে আরও সুন্দর দেখায় তাকে। মুগ্ধ চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সাঈদ। শায়লার ঠোঁটের বিস্তৃতি লক্ষ করে ইচ্ছে হলো একটা চুমো খায়। মনে মনে আদর করল নিজেকে, তুমি শালা ভাগ্যবান।

'মেয়ে তো বটেই। এত রাতে আর কে তাহলে ফোন করবে।' মনের ভেতর যাই ঘটে যাক, প্রকাশ্যে হাসছে শায়লা।

সাঈদ বলল, 'আরে না! কি যে ভাব তুমি। বিশ্বাস করো, মিনিস্ট্রি থেকে ডাকল। জরুরী কাজ পড়েছে, এখুনি যেতে হবে।'

'বললে আর বিশ্বাস করলাম!' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল শায়লা। 'তা, মেয়েটা নিশ্চয়ই অসাধারণ সুন্দরী—তা নাহলে এই রকম জমজমাট আড্ডা থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে পারে।'

'সুন্দরী মাত্র একটা মেয়েকেই চিনি আমি,' বলল সাঈদ। 'এই মুহূর্তে আমার নাগালের মধ্যেই রয়েছে সে।'

এবার শব্দ করে হেসে উঠল শায়লা। 'আপনি কি, স্যার, আমার কথা বলছেন?'

'অফকোর্স, ম্যাডাম।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকল ওরা। তারপর জানতে চাইল শায়লা, 'আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে?'

'যদি বেঁচে থাকি, আর যদি তুমি কারও সাথে পালিয়ে না যাও!' তারপরই সিরিয়াস হবার চেষ্টা করল সাঈদ। 'এই, গাড়িটা যে আমাকে নিয়ে যেতে হচ্ছে! হাতে সময়ও নেই যে তোমাকে বাড়িতে পৌছে দেব। তুমি ফিরবে কিভাবে?'

আবার মিটি মিটি হাসল শায়লা। 'তোমার বন্ধু-বান্ধব এখানে কম নাকি? মুখ ফুটে একবার বললেই পৌছে দেবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। পরিবেশটা মন্দ লাগছে না, আরও খানিকক্ষণ থেকে যাই, কি বলো?'

'তা থাকো না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল সাঈদ। 'সম্ভবত কাল সকালে ফিরতে পারব আমি। কাজটা কি রকম, তার ওপর নির্ভর করে আর কি।'

'ঠিক আছে। সাবধানে গাড়ি চালিয়ো।' বলে বাথরুমের দিকে চলে গেল শায়লা।

প্যাসেজ ধরে খানিক এগোতেই জ্যোতি ভাবীর সামনে পড়ে গেল সাঈদ। ওর পথ আগলাবার ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে। 'মনে হচ্ছে শায়লাকে

রেখেই চলে যাচ্ছ, সাঈদ?'

'হ্যাঁ,' খানিক ইতস্তত করে বলল সাঈদ। 'টেলিফোনে একটা মেসেজ পেলাম...'

'এসব আমাকে শেখাতে হবে না,' সবজান্তার হাসি হাসল জ্যোতি ভাবী। 'পুরুষদের আমার চেনা আছে। কোথায় যাচ্ছ জানি না। জানতে চাইও না, কিন্তু আমার কথা হলো এমন কিছু যেন কোরো না, যা শুনে মনে ব্যথা পায় শায়লা।'

'ভাবী আপনি...'

সাঈদের মুখে হাতচাপা দিল জ্যোতি ভাবী। সাঈদ ভাবল, আশ্চর্য তো! এই মহিলা আজ আমার সাথে এমন ফ্রি আচরণ করছেন কিভাবে!

'থাক, ভাই, থাক,' চাপা গলায় হাসল জ্যোতি ভাবী। 'মিথ্যে কথা বোলো না। বান্ধবীটি যেই হোক, আমার কথা হলো, শায়লার ওপরে তাকে স্থান দিয়ো না।'

ঝাঁঝের সাথে কিছু বলবে কিনা ভাবছে সাঈদ, জ্যোতি ভাবী দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মাথা নিচু করে এগোল সাঈদ। মিউজিক হলে একবার ঢুকতে হলো ওকে। তারপর আবার বেরিয়ে এসে কি মনে করে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাল। শায়লাকে দেখতে পেল সে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আবার দ্য সিলভার কাছেই ফিরে গেছে শায়লা।

টয়োটার গ্লাভ কমপার্টমেন্টের ভেতর হাত গলিয়ে একটা বোতামে চাপ দিল সাঈদ। চোরা খোপ থেকে ল্যুগারটা বের করে চেক করল, তারপর চালান করে দিল ট্রাউজারের পকেটে। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

মাঝরাত। নির্জন রাস্তা। গুলশান থেকে রামপুরায় পৌঁছতে দশ মিনিট লাগল। একটা গলির ভেতর গাড়ি থামিয়ে পায়ে হেঁটে মেইন রোডে ফিরে এল সাঈদ, লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনশো গজ এগিয়ে ঢুকে পড়ল অপর একটা গলিতে। গলি হলেও, বেশ প্রশস্ত, দু'ধারে চার পাঁচতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি। ডান দিকের পাঁচটা বাড়ি ছাড়িয়ে এল সে, পরের বাড়িটার খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল, ভেতর থেকে আবার বন্ধ করল তালা। আলোকিত প্যাসেজ ধরে কয়েক পা এগিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়াল সে। পর্দা সরিয়ে টোকা দিল কবাটে।

'কাম ইন।'

কামরায় ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল সাঈদ। ভেতরটা অফিস রুমের মত করে সাজানো। ছোট একটা ডেস্ক, পিছনে একটা হাতলওয়ালা চেয়ার, সামনে হাতল-ছাড়া আরও দুটো। পেছনের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে সোহেল আহমেদ।

'ছুটি কেমন কাটালে, সাঈদ?' হাসিমুখে জানতে চাইল সোহেল।

'মন্দ নয়, সোহেল ভাই।' দাঁড়িয়ে থেকেই জবাব দিল সাঈদ।

'বসো,' সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল সোহেল। 'এক সময় পার্টি, ক্লাব এইসব নিয়ে আমিও খুব মেতে থাকতাম, বুঝলে। এখন একদম সময় পাই না।'

খানিক ইতস্তত করল সাঈদ, তারপর মৃদু হাসির সাথে জানতে চাইল, 'আপনারা যারা হেডকোয়ার্টারে রয়েছেন, তারা ঘুমান কখন, সোহেল ভাই?'

'সময় ঠিকই বের করে নিই,' বলল সোহেল। সাঈদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর শুরু করল, 'ব্যাপারটা এই রকম। তেল আবিবে আমাদের গোটা টীম ধরা পড়ে গেছে। প্রথমে ধরা পড়েছে লিয়াজোঁ অফিসার, আয়েশা জামালেক। তার মুখ খুলিয়ে ছাড়ে ওরা, তারপর মেরে ফেলে।'

'মাই গড!'

'ঠিক হয়েছে, ওদের নিয়মেই খেলব আমরা,' বলল সোহেল। 'প্রথমে আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা হবে, তারপর প্রতিশোধ। আমাদের হয়ে কাজ করতে পারবে এমন লোক তেল আবিবে অনেকই আছে, তাদেরকে দিয়েই কাজ করানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। কিন্তু নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্যতা ওদের কারও নেই। লেবাননে আমাদের একজন এজেন্ট আছে, ওদের লীডার করে তাকে পাঠানো হচ্ছে। তার সাথে মাত্র একবার যোগাযোগ করব আমরা, দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করার ঝুঁকি নেব না। তেল আবিবে তার আন্ডারে যারা কাজ করবে তাদের নামের একটা তালিকা ঢাকা থেকে পাঠানো হবে। তেল আবিবে পৌঁছে কার কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে তার, ওই তালিকা দেখেই জানতে পারবে সে।'

সাঈদ ভাবছে, এসবের সাথে আমার সম্পর্ক কি? কি কাজ দেয়া হবে আমাকে? তবে কি বিড়ালের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়ল, বিদেশে পাঠানো হচ্ছে তাকে?

'কিন্তু তালিকাটা পাঠাবার আগে এখানে একটা কাজ সারতে হবে,' বলল সোহেল। 'সাভারে একজন লোক আছে, তার নাম হেদায়েত খান মোরশেদ। তার বাড়িটার নাম পর্ণকুটির। বেশ কয়েক দিন ধরেই ওখানে আছে লোকটা। সে যে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একটা স্টার, প্রথম থেকেই আমরা তা জানি। ওর মাধ্যমে তেল আবিবে আমরা মিথ্যে তথ্য সাপ্লাই দিচ্ছি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানতাম, তেল আবিবে শুধু রেডিওর সাহায্যে মেসেজ পাঠায় সে। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, অন্য আরেকটা মাধ্যমও ব্যবহার করছে সে। কিংবা এমনও হতে পারে, তার দলে নতুন কেউ এসেছে।'

সাঈদ কিছু বলল না।

'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স থেকে সরাসরি ট্রেনিং পেয়েছে এই লোক।'

আঁতকে ওঠার কৃত্রিম ভঙ্গি করল সাঈদ। তারপর মৃদু একটু হাসল। বলল, 'তারমানে, লোকটা আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে?'

'হ্যাঁ। আসল কথা হলো, দুশ্চিন্তাটা থাকছে জানার পর নতুন

অপারেটরদের তালিকা আমি লেবাননে পাঠাতে পারি না। এদিকে, তালিকাটা যত্র তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেয়া দরকার। কাজেই···'

'কাজেই দুশ্চিন্তার জড় উপড়ে ফেলতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'আজ রাতেই,' বলল সোহেল। 'আমি অ্যাকশন চাই।'

'ও। আমি—আর কে?'

'তুমি আর সেতু ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু শোনো, ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে হবে। তাহলে সব দিক থেকেই সুবিধে।'

একটু হাসল সাঈদ। 'তারমানে সব প্ল্যান করা হয়ে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'হ্যাঁ।' পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করল সে। 'দেখো, এই হলো পর্ণকুটিরের নকশা। বাড়িটা আগেই বলেছি, সাভারে। হেদায়েতকে ওখানেই তুমি পাবে, অন্তত ঘণ্টা তিনেক আগে ওখানে তাকে দেখা গেছে। বাড়িটার ওপর আমাদের লোক প্রথমে থেকেই নজর রাখছে। আজও একজনকে ওখানে পাবে তুমি। কাজটা কিভাবে করবে, শোনো। আগের সেই ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানীর ড্রাইভার হিসেবে আসছে সেতু। আজ একটা খুব ভারী ট্রাক চালাবে সে।' দু'সেকেন্ড থেমে কি যেন ভাবল সোহেল, তারপর আবার শুরু করল, 'একটা কথা। আসল কাজটা সারার আগে তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট চালাবে। কে জানে, অবস্থা গুরুচরণ বুঝতে পারার পর হেদায়েত মুখ খুলতে রাজিও হতে পারে। ভাবতে পারে, কথা বলতে রাজি হলে আমরা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। প্রস্তাবটা তোমার তরফ থেকেই ওঠা ভাল।'

'বুঝেছি,' বলল সাঈদ। 'তারপর যদি কথা বলেও তার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না, তাই তো?'

'তাই।' একটা সিগারেট ধরাল সোহেল। 'লোকটা খুনী এবং স্যাডিস্ট।'

'বুঝেছি। প্রথমে বাড়িতে ঢুকে ওর দিকে পিস্তল ধরব। তারপর একটা চুক্তিতে আসতে বলব ওকে। ফাঁদে পা দিয়ে যদি কথা বলে—ভাল। তারপর কাজটা সারব আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সোহেল। 'কাজটা এভাবে সারবে তোমরা, সাঈদ। এদিকে এসো। প্ল্যানটা দেখো···'

# তিন

গভীর রাতের বাতাস ঠাণ্ডা লাগল। থালার মত মস্ত চাঁদ উঠেছে আকাশে। যত দূর দৃষ্টি যায়, উইন্ডস্ক্রীনের সামনে কালো ফিতের মত লম্বা হয়ে আছে রাস্তা। পকেটের ভেতর সিগারেট হাতড়াতে গিয়ে ল্যুগারের শীতল স্পর্শ পেল

সাঈদ।

লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল সে। লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ায় ভরে নিল ফুসফুস। খুসখুস করে উঠল গলাটা। বেশি মদ খাবার পর ধোঁয়া টানলে এ তো হবেই, ভাবল সে। নাহ্, একেবারে হঠাৎ করে ছেড়ে দিতে না পারলেও, মদ আর সিগারেট দুটোই তাকে কমাতে হবে। অ্যাকসিলারেটরের ওপর পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিল সে, লক্ষ করল স্পীড মিটারের কাঁটা পঁয়তাল্লিশের ঘর ছাড়িয়ে গেল।

রাস্তার দু'ধারে গভীর খাদ দেখে গাড়ির স্পীড কমাল সাঈদ। একদিকের কিনার ঘেঁষে গাড়ি চালাল সে। গত বছরও এতটা গভীর ছিল না এই খাদ। ঠিকাদাররা মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ায় রাস্তা থেকে খাদের নিচেটা এখন এক দেড়শো ফুট। মনে মনে সোহেলের প্রশংসা করল সে। সোহেল ভাই ভাল জায়গাই বেছে দিয়েছেন। তারপর ভাবল, কাজটা ঠিকভাবে সম্পন্ন হবে তো? আপনমনে দেঁতো হাসি হাসল সে। নিজেকে শুনিয়ে দিল, আবুসাঈদ নার্ভাস ফিল করছে এই চিন্তাটাই তো হাস্যকর।

দুশো গজ পর রাস্তার ডানদিকে শুরু হলো জঙ্গল। আরও দেড় দুশো গজ এগোবার পর সাইড রোডটা দেখতে পেল সে। গাড়ি থামিয়ে আলো নেভাল, তারপর নিচে নামল। তীব্র বাতাস, হি হি করে উঠল সাঈদ। মেঠো পথ, কিন্তু বেশ চওড়া। ভারী একটা ট্রাক অনায়াসে ঢুকে যাবে।

চাঁদের আলোয় মেঠো পথ ধরে পঞ্চাশ গজের মত হেঁটে এল সাঈদ। দৈত্যের মত পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাকটা। ওকে দেখে ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এল সেতু ইঞ্জিনিয়ার। তার ঠোঁটের কোণে আধ-খাওয়া একটা সিগারেট ঝুলছে। 'জায়গাটা দেখলি, সাঈদ?' জানতে চাইল সে।

'দেখলাম,' বলল সাঈদ। সেতুর সামনে দাঁড়াল সে। 'তোর অসুবিধে হবে বলে ভাবছিস?'

'ভাবছি না, জানি হবে,' বলল সেতু। 'মেইন রোডটা তত চওড়া নয়। এদিকে, ট্রাকটা দেখ, সাংঘাতিক হেভী। চাকাগুলোও অসম্ভব ভারী। টায়ার প্রেসার ঠিক না।'

চিন্তিত দেখাল সাঈদকে, 'হুঁ। হালকা একটা ট্রাক হলেই ভাল হত।' চোখের সামনে লিউমিনাস রিস্টওয়াচ তুলল সে। 'এখুনি রওনা না হলে দেরি হয়ে যাবে।'

নাক উঁচু করে বাতাস টানল সেতু। ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'কিরে, তুই ঠিক আছিস তো?'

প্রশ্নের তাৎপর্য ধরতে পেরে হেসে উঠল সাঈদ। সেতুর মনে হলো, জোর করা হাসি। 'ঘাবড়াও মাত, দোস্ত। আই অ্যাম ফাইন।' পকেট থেকে ছোট সাইজের একটা হুইস্কির বোতল বের করল সে। 'দু'ঢোক চালাবি নাকি?'

ট্রাউজারের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথাটা একদিকে একটু কাত করল সেতু, ভাল করে লক্ষ করল সাঈদকে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'না। তুই

তো জানিস, কাজের সময় ওসব আমি ছুঁই না।'

'বোধহয় সেটাই ভাল,' বলে বোতলের মুখটা দুই ঠোঁটের মাঝখানে কাত করে ঢকঢক করে খানিক নির্জলা হুইস্কি খেল সাঈদ। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, একদৃষ্টে তাকে লক্ষ করছে সেতু। পকেটে বোতলটা চালান করে দিয়ে সেতুর দিকে সরাসরি তাকাল সে।

'গুড লাক, সাঈদ,' বলল সেতু।

সাঈদ লক্ষ করল, দোস্ত না বলে তার নাম ধরল সেতু, হ্যান্ডশেকের জন্যে হাতটাও বাড়াল না। 'গুড লাক,' বলল সে। 'আবার তাহলে দেখা হচ্ছে।'

ঘুরে দাঁড়াতে যাবে সাঈদ, সেতু বলল, 'সাবধান, কেমন? মাথা ঠাণ্ডা রেখে।'

'মেনি মেনি মেনি থ্যাঙ্কস, দোস্ত।'

আরও মাইল তিনেক এগোল সাঈদ। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে এল। সামনে আরেকটা মেঠো পথ, গাড়ি না থামিয়ে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। দু'মাইল এগিয়ে একটা চারতলা বাড়ির পিছনে থামল সে, দু'চার মাইলের মধ্যে এই একটাই চারতলা। অনেকটা দূরে থাকতেই হেডলাইট অফ করে দিয়েছিল সে, এবার ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল, চাবি ঘুরিয়ে তালা দিল দরজায়।

বাড়িটার সামনের দিকে এল সাঈদ। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। চারতলায় উঠে বন্ধ দরজায় নক করার সাথে সাথে খুলে গেল সেটা। ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রৌঢ় লোকটা, গায়ের রঙ আলকাতরা। এর ফটো দেখেছে সাঈদ, চিনতে অসুবিধে হলো না। লোকটা জানতে চাইল, 'মি. সাঈদ?'

'চৌধুরী?' মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল সাঈদ।

'আসুন,' পকেট থেকে হাত বের করে পথ ছেড়ে দিল প্রৌঢ় চৌধুরী। ভেতরে ঢুকল সাঈদ। দরজা বন্ধ করল চৌধুরী। তার পিছু পিছু হলঘরে ঢুকল সাঈদ, এগিয়ে গিয়ে একটা খোলা জানালার সামনে থামল চৌধুরী। পাশের টেবিল থেকে নাইট গ্লাস তুলে নিয়ে বাইরে তাকাল সে। বলল, 'হেদায়েত খান বাড়িতেই আছে, মি. সাঈদ।'

'গুড।' পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল সাঈদ। 'বলুন।'

হাত ইশারায় সাঈদকে পাশে ডাকল চৌধুরী। তারপর সাঈদের হাতে নাইট গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'জোড়া আলো দেখতে পাচ্ছেন? ওদিকে তাকান।'

চোখে নাইট গ্লাস তুলে তাকাল সাঈদ। ছোট্ট একটা দেয়াল ঘেরা দোতলা বাড়ি সাঁৎ করে কাছে চলে এল। অন্ধকার বাড়ি, শুধু উঠানের দুই প্রান্তের দুটো বালব জ্বলছে। 'কুকুর আছে নাকি?' জানতে চাইল সাঈদ।

'না। গার্ডও নেই। নিশ্চিন্ত মনে বাস করে খান। কেউ সন্দেহ করতে

পারে এমন কিছু করে না সে।'

'ঢুকব কিভাবে?'

'পাচিল টপকে। পিছন দিকে গ্যারেজ আছে, মান্ধাতা আমলের একটা মরিস চালায় খান। বুড়ো খুব যত্ন করে গাড়ির।'

'কিন্তু ঘরে?'

'পিছন দিকে সাদা রঙ করা একটা দরজা আছে। পাশেই একটা জানালা। ছিটকিনি ভাঙা ওটার। মানে, ভেঙে রাখা হয়েছে। ঘরে ঢুকতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না। ওটা রান্নাঘর।'

'তারপর?'

'রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ। ডান দিকে এগোবেন। তিনটে দরজা পেরিয়ে চার নম্বর দরজার সামনে থামবেন। আপনার শিকার ওই দরজার ভেতরই ঘুমায়। এই নিন চাবি, এখানে দুটো আছে,—একটা গ্যারেজের।'

'আর কোন গাড়ি আছে গ্যারেজে?' সাঈদ ভাবল, সোহেল ভাই ওদের কাজ যথাসম্ভব সহজ করে রাখেন।

'একটা মোটরসাইকেল আছে, নষ্ট,' বলল চৌধুরী।

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'আজ রাতে আর কেউ নেই। রান্নাবান্না আর ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্যে একটা মেয়েলোক আসে, কাজ করে দিয়ে সন্ধের দিকে চলে যায়, রাতে থাকে না। খানের সেক্রেটারি ওখানে থাকে বটে, কিন্তু আজ সে রাত এগারোটার বাস ধরে আরিচা গেছে, কাল সকালের আগে ফেরার উপায় নেই তার।'

'আশপাশে আর কোন লোকের সাথে যোগাযোগ আছে খানের?' জানতে চাইল সাঈদ। 'আর কোন কন্ট্যাক্ট?'

মাথা ঝাঁকাল প্রৌঢ় চৌধুরী। 'নেই,' বলল সে। 'ভারি চালাক। এই বাড়িতে বসে কারও সাথে দেখা পর্যন্ত করে না লোকটা। লোকজন কেউ আসে না বললেই চলে। দিনের বেশির ভাগ সময় বাগান নিয়ে মেতে থাকে, কোন কোনদিন বিকেলের দিকে গাড়ি নিয়ে ঢাকায় চলে যায়। যেদিন যায় সেদিন অনেক রাত করে ফেরে। গভীর জলের মাছ, মি. সাঈদ।'

'তা আর বলতে।' কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর ঘনঘন টান দিয়ে ঠোঁট থেকে সিগারেট নামাল সাঈদ, আগুনটার দিকে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল, 'আর কিছু?'

'এই তো, আর কি।'

মাথা ঝাঁকাল সাঈদ। 'গাড়িটা পিছন দিকে থাকল। একসময় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।' দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

সিঁড়ির-দরজা পর্যন্ত সঙ্গে এল চৌধুরী। 'গুডলাক, মি. সাঈদ।'

জবাবে বিড় বিড় করে কি বলল সাঈদ, শুনতে পেল না চৌধুরী। দরজা বন্ধ করে দিল সে।

দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনে একটা ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল

সাঈদ, পকেট থেকে বোতলটা বের করে আরও এক ঢোক হুইস্কি খেল সে।

খুট করে শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেল হেদায়েত খানের। চোখ মেলে তাকানো আর বালিশের নিচে হাত দেয়া, দুটো কাজ একই সাথে করতে গেল সে। চোখ তার ধাঁধিয়ে গেল হঠাৎ আলোয়। আর হাতের ওপর পড়ল শক্ত কিছুর বাড়ি। সুইচ টিপেই দ্রুত এগিয়ে বিছানার পাশে চলে এসেছে সাঈদ, ল্যুগার দিয়ে বাড়ি মেরেছে সে।

চোখ পিটপিট করে তাকাল হেদায়েত খান। ষাট বছর বয়স, কিন্তু দাড়ি কামানো বড়সড় মুখে বয়সের ভাঁজ নেই বললেই চলে। চেহারায় বলে দেয়, ভোগী লোক। শালা এক নম্বর লম্পট, ভাবল সাঈদ। সোহেল ভাই তাকে বলেছে, ঢাকায় গেলেই নামী দামী একটা হোটেলে স্যুইট ভাড়া নেয়, সেখানে বারো তেরো বছরের কিশোরী নিয়ে আসে দালালরা। তাদের সাথে ঘণ্টাখানেক ফুর্তি করে শালা বুড়ো। দাঁড়া, বের করছি তোর ফুর্তি!

হাত বাড়িয়ে বালিশের তলা থেকে একটা অটোমেটিক বের করল সাঈদ। লক্ষ করল, হেদায়েতের কব্জি ফুলে উঠেছে। ইতোমধ্যে বুড়োর চোখে সয়ে এসেছে আলো। চেহারায় ব্যথা বেদনা বা বিস্ময়ের কোন চিহ্ন নেই। একদৃষ্টে সাঈদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কি ভাবছে আল্লা মালুম। ব্যাটা পাক্কা ঘুঘু। নিজেকে সাবধান করে দিল সাঈদ, সিকি সেকেন্ডের একটা সুযোগ পেলেও এই লোক সেটা হাতছাড়া করবে না। অটোমেটিকটা পকেটে ভরে আবার হাত বাড়াল সে। চাদরটা ধরে বুড়োর গা থেকে টেনে নিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেল হেদায়েত খান।

'হাত দুটো সামনে রেখে উঠে বসো,' বলল সাঈদ। 'আজ তোমার পালা।'

সাঈদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে উঠে বসল হেদায়েত খান। চাদরটা একটু টেনে নিয়ে কোলের ওপর ফেলল। আপন মনে একবার শ্রাগ করল সে। বলল, 'এইরকম কিছু যে একটা ঘটবে, আমিও ভাবছিলাম।'

ল্যুগারের মুখ এখন আর হেদায়েতের দিকে তাক করা নয়। পিস্তল ধরা হাতটা সাঈদের শরীরের পাশে ঝুলছে। 'সেজন্যেই অবাক হওনি। তারমানে, সব দিক গুছিয়ে রেখেছ তুমি, কোথাও কোন ফুটো-ফাটা রাখোনি। মরার জন্যেও তৈরি হয়ে আছ?' ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল হেদায়েতের ঠোঁটে, সাথে সাথে মিলিয়েও গেল সেটা। 'মরতে তো একদিন হবেই। মরা এমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপারও নয়।'

ভুরু জোড়া একটু কপালে তুলল সাঈদ। 'তোমার মুখে কথাটা কৌতুকের মত শোনাল, হেদায়েত। তোমার জন্যে কিছু লোক ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে মরেছে।'

চেহারায় হতাশ একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল হেদায়েত খান। 'আপনি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন। তাছাড়া, এ নিয়ে তর্ক করে কোথাও আমরা পৌঁছুতে

পারব বলে মনে হয় না।'

'ঠিক,' বলে পকেট হাতড়াতে শুরু করল সাঈদ। সিগারেট বের করে মুখে তুলল, লাইটার বের করে জ্বালল সেটা। তার চোখ স্থির হয়ে আছে হেদায়েতের ওপর। ভাবছে, শালার নার্ভ আছে বলতে হবে। দেখে মনে হচ্ছে একটুও ঘাবড়ায়নি। কিন্তু সন্দেহ নেই, ব্যাটা ব্লাফ দিচ্ছে। কথা বলে আসলে সময় পেতে চাইছে ও। সময় পেলে সুযোগও আসবে বলে ভাবছে। আবার একবার নিজেকে সাবধান করে দিল সাঈদ। 'হ্যাঁ, তর্ক করার মত সময় নেই,' বলল সে। 'কিন্তু তুমি তো জানোই, এই রকম পরিস্থিতিতে অনেক সময় চুক্তিতেও আসা যায়, ঠিক না?'

মুচকি একটু হাসল হেদায়েত খান। 'বটেই তো! আমাদের এই পেশায় যে ধরনের চুক্তি হয় আর কি!' আবার একবার হাসল সে। 'তা, ঠিক কি বলতে চাইছেন আপনি? আমি কথা বললে আপনারা আমাকে বাঁচতে দেবেন?'

'দুর্ভাগ্যই বলব—হ্যাঁ। জাতির কলঙ্ক হও আর যাই হও, বাঙালী হিসেবে তোমার জানা আছে, আমাদের মন খুব নরম। কর্তৃপক্ষ ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করার ঘোরতর বিরোধী, এমনকি তোমার মত কুকুরকেও।'

লোকটাকে উত্তেজিত করা যাচ্ছে না, সেজন্য নিজের ওপর একটু রাগ হলো সাঈদের। গালমন্দ সত্ত্বেও লোকটা চটল না, বরং আরও সম্মানের সাথে সম্বোধন করল সাঈদকে। 'আপনি বলতে চাইছেন, আপনাদের জেলখানায় আমাদের বেশ কয়েকজন লোক আছে, যাদের সাথে আপনারা চুক্তিতে এসেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল সাঈদ। 'হ্যাঁ। আমরা এতই বোকা যে জেল খাটার মেয়াদ শেষ হলে তাদেরকে ছেড়েও দেয়া হবে। কেউ কেউ অবশ্য বয়স হয়ে যাওয়ায় বেরুতে পারবে না, তার আগেই পটল তুলবে। তোমার বেলাও তাই হবে। কারণ বিশ বছরের কম তো আর পাচ্ছ না। ততদিনে...'

বাধা দিয়ে হেদায়েত বলল, 'আমার একঘেয়ে লাগছে। চুক্তির ব্যাপারে আমি আগ্রহী নই। তারচেয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলুন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সাঈদ, তারপর বলল, 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি, হেদায়েত। তোমার মত লোককে খুন করার মধ্যে আনন্দ এবং পুণ্য, দুই-ই আছে।' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। 'প্রশ্ন হলো, কিভাবে তুমি মরতে চাও?'

'মানেটা?'

'যদি কষ্ট পেয়ে মরতে চাও—আমার কোন আপত্তি নেই।'

'সময় ঘনিয়ে এলে মানুষ তাড়াতাড়ি মরতে চায়, সেটাই স্বাভাবিক।'

'বেশ,' বলল সাঈদ। 'তাহলে কাপড়চোপড় পরে নাও।' ম্লান একটু হাসল সে। 'আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে শর্ত আছে। তুমি একটা কিছু না করলে আমি তোমাকে খুন করতে পারি না। আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে এমন কেউ তোমার ব্যাপারটা সামলাবে। এখন আমরা তার

কাছে যাব।'

গম্ভীর হলো হেদায়েত। 'তারমানে আরেকজন আমাকে চুক্তিতে আসার প্রস্তাব দেবে, এই তো? কিন্তু আমার উত্তর সেই একই হবে।'

'কি জানি। যার কাছে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, আমার চেয়ে একটু কঠিন লোক সে। তোমার মত লোকের মুখ কিভাবে খোলাতে হয় তা হয়তো তার জানা আছে।'

'হুঁ। তা সম্ভব। সবারই সহ্য করার একটা সীমা আছে।'

'এবার আমার একঘেয়ে লাগছে,' বলল সাঈদ। চেয়ারের পিঠে ঝুলে থাকা ট্রাউজার, শার্ট এইসব ইঙ্গিতে দেখাল সে, 'তাড়াতাড়ি করো। তোমার গ্যারেজের চাবি আছে আমার কাছে। ইগনিশন কী গাড়িতেই। তোমাকে ডেলিভারি দিয়ে কাজটা শেষ করতে পারলে বাঁচি।'

আরেকবার শ্রাগ করল হেদায়েত খান। তলপেটের কাছে চাদরটা ধরে রেখে বিছানা ছাড়ল সে। তার কাপড় পরা শুরু হলো।

দু'মিনিট পর সামনে হেদায়েতকে নিয়ে নিচে নেমে এল সাঈদ। তার ডান হাতে ল্যুগার, হাতটা শরীরের পাশে ঝুলছে। এখন কাজের মধ্যে রয়েছে সে, কাজেই উদ্বেগ আর অস্বস্তি ধারে কাছে ঘেঁষতে পারছে না। সুখী ও প্রায় তৃপ্ত মনে হলো নিজেকে তার। ভাবল, খুব মজা হত এই মুহূর্তে যদি তাকে একবার দেখতে পেত শায়লা। কি বলত শায়লা? তার ধারণা আমি অন্য কোন মেয়ের সাথে আছি…।

পিছনের সীটে বাঁ দিক ঘেঁষে বসে আছে সাঈদ। তার ডান হাতে ল্যুগার, হাতটা শিথিল ভঙ্গিতে পড়ে আছে হাঁটুর ওপর। সামনে, ড্রাইভিং সীটে রয়েছে হেদায়েত খান, অভ্যস্ত হাতে হুইল ঘোরাচ্ছে সে। তার ঘাড় আর কাঁধ দুটোর দিকে তাকাল সাঈদ। ঢিল দিয়ে রেখেছে, পেশীতে কোন টান নেই। ব্যাপারটাকে আশ্চর্য ঠাণ্ডাভাবে নিচ্ছে বুড়ো।

এই টাইপের লোক সম্পর্কে জানে সাঈদ। যত যাই ঘটে যাক, এরা হাল ছাড়তে জানে না। পরিস্থিতি যত খারাপই হোক, মনে মনে এরা বুদ্ধি আঁটতে থাকে। সন্দেহ নেই, এই মুহূর্তে হেদায়েত ঠিক তাই করছে।

শেষ একটা চেষ্টা এ লোক করবেই। কি হবে সেটা? ঘুঘু লোক, এমন কোন ফাঁদের মধ্যে পড়তে চায় না যেখানে তার মুখ খোলাবার জন্যে টরচার করা হবে।

'আচ্ছা…'

'কোন কথা নয়,' বলল সাঈদ। 'রাস্তার দিকে চোখ রেখে চালিয়ে যাও। কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না, সীট ফুটো করে পাঁজরে গিয়ে ঢুকবে বুলেট।'

কাঁধ ঝাঁকাল হেদায়েত। ভিউ মিররে তাকিয়ে ছিল সাঈদ, দেখল, হেদায়েতের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

এরপর এঞ্জিন আর বাতাসের শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। পকেট থেকে

সিগারেট বের করে ধরাল সাঈদ। লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ায় ফুসফুস ভরে নিল। ভাবল, ধূমপানের স্বাদ বা মজা সব সময় এক রকম নয়। নির্ভর করে মেজাজের ওপর। কখনও বিষের মত, কখনও ভারি চমৎকার—এই যেমন এখন।

রাস্তার ডান দিকে জঙ্গল শুরু হলো, অপর দিকে শুরু হলো খাদ। এক মিনিট পরই বেচাল চলতে শুরু করল গাড়ি। মনে হলো, হেদায়েত ঠিক মত সামলাতে পারছে না। পুরানো মরিস একবার এদিক যায়, আরেকবার ওদিক।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সাঈদের। ভাবল সব ঠিকঠাক মতই ঘটছে তাহলে।

'ব্যাপার কি? কি হলো?'

'হুইল ঘোরাতে অসুবিধে হচ্ছে,' বলল হেদায়েত। 'ঠিক বুঝতে পারছি না কি হয়েছে।'

'বাঁ দিকে থামাও,' বলল সাঈদ। 'শালার···বোধহয় স্লো পাংচার। স্পেয়ার চাকা আছে?'

মাথা দোলাল হেদায়েত। 'পিছনে।' ব্রেক কষে রাস্তার বাঁ ধারে গাড়ি থামাল সে।

'কি হয়েছে দেখতে যাচ্ছি আমি,' বলল সাঈদ। 'হুইলের ওপর হাত রেখে বসে থাকবে তুমি, নড়বে না।'

'আচ্ছা,' নরম সুরে বলল হেদায়েত, যেন বুড়ো একটা লক্ষ্মী খোকা।

এবার আরও কঠোর সুরে বলল সাঈদ, 'কোন রকম চালাকি করলে তোমার কপালে খারাবি আছে।'

'না,' তাড়াতাড়ি বলল হেদায়েত। 'কিছু করব না। কি করব?'

দরজা খুলে নেমে পড়ল সাঈদ। সামনের দিকে, কাছের টায়ারটার পাশে থামল সে। ঝুঁকে পড়ে সেটা পরীক্ষা করল। যা আশা করছিল, তাই। স্লো পাংচার। ভালবে ক্রটি ছিল, একটু একটু বাতাস বেরিয়ে আসছে। কম স্পীডে গাড়ি চালালে কোন অসুবিধে হবে না, কিন্তু স্পীড বাড়ালেই বেচাল চলবে। এটাই আশা করেছিল সাঈদ। ভালবের ওপর নিজের হাতে কেরামতি ফলিয়েছে সে।

সিধে না হয়েই, মাথা ঘুরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকাল সাঈদ। চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মেঠো পথের মুখটা পঞ্চাশ গজের মত দূরে। গাড়ির পাশে ফিরে এল সে। 'স্পেয়ারটা বের করে হুইল চেঞ্জ করতে হবে।'

'আমার বয়স হয়েছে···'

'কাজটা আমিই করব,' বলল সাঈদ। 'টায়ার ঠিকই আছে, শুধু একটু একটু বাতাস বেরিয়ে আসছে। ঢাকা এখনও অনেকটা দূর, কাজেই আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। চুপচাপ বসে থাক, হেদায়েত। তোমার ওপর একটা চোখ থাকবে আমার, মনে রেখ।'

'রাখব,' কোমল সুরে বলল হেদায়েত।

গাড়ির পিছন দিকে চলে এল সাঈদ। গাড়ির কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে এসে স্পেয়ার হুইল কমপার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো, ল্যুগার আর অটোমেটিক দুটোকে হালকা ভাবে ছুঁয়ে আছে। নড়ল না সে, দাঁড়িয়েই থাকল, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। ভাবছে, এখানেই সুযোগটা নেবে তুমি। নিতেই হবে তোমাকে। নাও, পালাও। দেখ, পারো কিনা…

আচমকা একটা ঝাঁকি দিয়ে স্টার্ট নিল মরিস। তারপর লাফ দিয়ে ছুটল। প্রতি মুহূর্তে দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে গতি। রিয়্যার লাইটের দিকে তাকিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল সাঈদ, নিঃশব্দে হাসছে। জানতো, সুযোগটা না নিয়ে পারবে না হেদায়েত। এই পরিস্থিতিতে এটাই একমাত্র করণীয় ছিল তার। সাঈদ কল্পনার চোখে দেখতে পেল, হেদায়েতের পা অ্যাকসিলারেটরের ওপর চেপে বসেছে, ভাবছে পালিয়ে বাঁচার শেষ সুযোগটা এখনও হারায়নি সে, একটু বাঁকা হয়ে আছে ঠোঁটের কোণ—হাসছে।

মরিসের গতি এখন ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল, আন্দাজ করা যায়। রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে ছুটছে, খাদটা সেদিকেই। ট্রাউজারের পকেটে সাঈদের হাত একটু একটু ঘামছে। বিড়বিড় করে বলল সে, 'গুড লাক, সেতু। গুড লাক…।'

মেঠো পথ থেকে হঠাৎ মেইন রোডে বেরিয়ে এল দৈত্যটা। বেরিয়ে এল আড়াআড়ি ভাবে, ত্রিশ মাইল স্পীডে। দূর থেকে সাঈদের মনে হলো, মরিসের নাকের ওপর চড়াও হবে। কিন্তু না, ওটার গায়ের ওপর পড়ল ট্রাক। ট্রাক নিয়ে সামনে বাড়ল সেতু, তারপর হুইল ঘোরাল। প্রথমে এগোল খাদের দিকে, তারপর খাদ এড়াবার জন্যে ডান দিকে। কংক্রিটের রাস্তায় ঘষা খেয়ে দুটো গাড়ির চাকাই কর্কশ প্রতিবাদ করে উঠল।

দেখা গেল, হেদায়েতের গাড়িটাকে খাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ট্রাক। খাদের কিনারা থেকে আর বেশি দূরে নয় সেটা। শেষ মুহূর্তে সাঈদ দেখল, মরিসের দরজা খুলে ফেলেছে হেদায়েত, পরমুহূর্তে খাদের কিনারা থেকে নিচের দিকে কাত হয়ে পড়ল গাড়িটা।

কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকল সাঈদ। পতনের শব্দটা অনেক দেরি করে এল। রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল সে।

ওখানে পৌঁছে সাঈদ দেখল, ট্রাকের সামনের দিকে বনেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেতু, ন্যাকড়া দিয়ে হাত মুছছে। আধ-খাওয়া সিগারেটটা এখনও ঝুলছে তার ঠোঁটে।

'গিয়েছিলাম উল্টে, বুঝলি,' বলল সেতু। নার্ভাস ভঙ্গিতে একটু হাসল সে। 'একটা সময় মনে হলো, লাফ দিয়ে রাস্তায় নামি। খুব বাঁচা বেঁচে গেছি, বুঝলি। বলেছিলাম না, আরও হালকা হওয়া উচিত ছিল ট্রাক।'

একবার শুধু একটু হাসল সাঈদ, কিছু বলল না। ট্রাকের গায়ে হেলান দিল সে। ওখান থেকে সরে গেল সেতু। ধোঁয়ায় ফুসফুস ভরে নিতে নিতে চারদিকে তাকাল সাঈদ। চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। রাস্তার এক পাশে জঙ্গল, আরেক পাশে খাদ। খাদের ওপারে খেত, বহুদূরে

আবছা গ্রাম। কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই, নড়াচড়া নেই। খুক খুক করে কাশল সাঈদ। একটু একটু ঘামছে সে। অথচ গাছপালা নাচিয়ে টানা বাতাস আসছে।

ফিরে এল সেতু। 'সাঈদ—একবার গিয়ে দেখে আয়,' চাপা সুরে বলল সে। 'কেটে পড়ব তার উপায় নেই। শালা নিজে ঝুলে আমাদেরকেও ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে।'

দ্রুত সিধে হলো সাঈদ। 'কি যা তা বকছিস!' বলে হন হন করে খাদের দিকে এগোল সে। তার পিছু নিল সেতু।

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে উঁকি দিল সাঈদ। প্রায় খাড়া ভাবে নেমে গেছে ঢাল। পঞ্চাশ ফিট নিচে ছোট একটা ঝোপ, ওই একটাই। হেদায়েত খান দিব্যি শুয়ে আছে ঝোপের ভেতর, তার হাত দুটো ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে।

'শেষ মুহূর্তে দরজা খুলে ফেলেছিল···তাই আগে সে পড়েছে, তারপর গাড়িটা। ওটা যদি শালার গায়ের ওপর পড়ত, তাও হত।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেতু। 'এখন এর একটা বিহিত করতে হয়।'

'অসুবিধেটা কি?' জানতে চাইল সাঈদ।

'শালা যদি মরে না থাকে?' সেতুর গলায় সন্দেহ। 'তুই রাস্তার ওপরে চোখ রাখ। রশি আছে, আমি নিচে নামব।'

মাথা ঝাঁকাল সাঈদ। তেমন কিছু না, একটু যেন অসুস্থ বোধ করছে সে। খাদের দিকে পিছন ফিরে কয়েক পা হেঁটে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল। নজর রাখল দু'দিকে।

ট্রাকের হেডলাইট অফ করে দিল সেতু। পার্কিং লাইট জ্বলছে। ট্রাকের পিছনে এসে ওপরে উঠল সে, কুণ্ডলী পাকানো এক প্রস্থ রশি নিয়ে নেমে এল তক্ষুণি। রশির একটা প্রান্ত ট্রাকের সাথে বাঁধা হলো, আরেক প্রান্তসহ বাকি রশি ফেলে দেয়া হলো খাদের নিচে। কিনারায় দাঁড়াল সেতু, ঠোঁটে এখনও ঝুলছে আধ-খাওয়া সিগারেট। ঝুঁকে পড়ে ঘাসের ওপর থেকে রশিটা তুলে নিল সে, তারপর কিনারা থেকে নামতে শুরু করল খাদে।

এই-ই হয়, ভাবছে সাঈদ, এ ধরনের কাজে একটা ঝামেলা বাধবেই। ঝামেলায় পড়তে হয়নি এমন কোন কাজ করেছে বলে মনে পড়ল না তার। মনে মনে আগেই একটা কাহিনী ফেঁদে রেখেছে সে, হঠাৎ কেউ উদয় হলে কাজে লাগবে। তবে এত রাতে কেউ আসবে বলে মনে হয় না। না এলেই ভাল।

ভারী কিছু পতনের একটা শব্দ এল কানে। নরম, কিন্তু ভোঁতা। দু'মিনিট পর কিনারায় সেতুর মাথা দেখা গেল। ঘাসের ওপর উঠে এল সে, রশিটা টেনে তুলল, আগের মত কুণ্ডলী পাকাল সেটাকে, তারপর প্রান্তটা খুলে নিল ট্রাক থেকে। ট্রাকের পিছনে রশি রেখে সাঈদের কাছে ফিরে এল সে, ট্রাউজারের ওপর হাত দুটো ঘষতে ঘষতে।

'ঝোপ থেকে ঠেলে বের করে দিতেই নিচের দিকে পড়ে গেল,' বলল

সে। 'আর কোন সমস্যা নেই।'

'বেঁচে ছিল?' জানতে চাইল সাঈদ। চাঁদের আলোয় দেখল সেতুর কপালে ঘাম চিকচিক করছে।

'বুঝতে পারিনি,' ক্ষীণ একটু হাসল সেতু। 'তখন যদি মরে না-ও থাকে এখন বেঁচে নেই—হলপ করে বলতে পারি।'

'গুড,' বলল সাঈদ। পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করল সে। 'এখানে থাকছিস তুই—প্ল্যানটা জানিসই তো। চৌধুরীর ওখান থেকে ফোন করব পুলিসকে। তোর অভিনয়ের ওপর আমার আস্থা আছে, হতভম্ব ভাবটা দারুণ ফুটিয়ে তুলতে পারিস। যদি দু'ফোটা চোখের পানি ফেলতে পারিস, তাহলে তো কথাই নেই।'

নিঃশব্দে হাসছে সেতু। 'যখন মনে হলো, আমিও খাদে পড়ে যাচ্ছি, মাইরি বলছি, একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। পুলিসকে গল্পটা বলার সময় ওই ঘটনা স্মরণ করলেই হবে, অভিনয় করার দরকার হবে না। মনে পড়লে এখনও আমার বুক কাঁপছে।'

'স্বাভাবিক,' বলল সাঈদ। কোন কারণ ছাড়াই তারও যে বুক বার কয়েক কেঁপেছে, সেটা আর বলল না।

'ভাগ্যিস সাথে রশি ছিল…'

'হ্যাঁ।' পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা আরেকবার বের করল সাঈদ। দু'ঢোক খেল। তারপর তাকাল সেতুর দিকে।

নিঃশব্দে শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সেতু। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে।

ঘুরে দাঁড়াল সাঈদ। হাঁটতে হাঁটতে আরেকবার বোতলটা মুখে তুলল। চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল সেতুর, সাঈদের দিকে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর যেন দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলার জন্যেই কাঁধ ঝাঁকাল।

# চার

চৌধুরীর ফ্ল্যাট থেকে সাভার থানায় ফোন করল সাঈদ। জায়গার বর্ণনা দিয়ে বলল, 'দোষটা ট্রাক ড্রাইভারের নয়। হেডলাইট জ্বালা অবস্থায় সাইড রোড থেকে বেরিয়ে আসছিল সে, ট্রাকের নাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে প্রথমে কাত হয়ে পড়ে যায় মরিস, তারপর কিনারা থেকে খাদের নিচে।'

'আপনার পরিচয়?' ডিউটি ক্লার্কের গলা থেকে ঘুম ঘুম ভাব উবে গেল।

'আমি সাঈদ মাহমুদ, মিনিস্ট্রি অভ ওয়ার্কস-এ আছি। খুব জরুরী একটা কাজে বেরিয়েছি, তাই থানায় যেতে পারছি না। আমার জবানবন্দি দরকার হলে মিনিস্ট্রিতে খোঁজ করলেই আমাকে পাবেন। ট্রাক আর ড্রাইভার ওখানেই আছে…লোকটার নাম বোধহয়, দাঁড়ান মনে করি…হ্যাঁ, সেতু। মিতালী

ট্রান্সপোর্টে চাকরি করে সে। সম্ভবত লোহা লক্কর নিয়ে আরিচার দিকে যাচ্ছিল।'

'ঠিক আছে। এক্ষুণি লোক পাঠাচ্ছি আমরা।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সাঈদ, তাকাল প্রৌঢ় চৌধুরীর দিকে। 'এখানে কাজ তো শেষ, এরপর?'

'কি জানি!' মৃদু হাসল চৌধুরী। 'তবে নজর রাখতে হয়, এমন লোকের তো আর অভাব নেই—'

'সাংঘাতিক ধৈর্য লাগে, তাই না?'

প্রৌঢ় স্বীকার গেল না। 'অভ্যেস হয়ে গেছে। এই বয়সে ছুটোছুটি করার চেয়ে এটাই বরং ভাল—দূর থেকে চুপচাপ লক্ষ্য রাখা।'

'তা বটে,' বলে চৌধুরীর দিকে আবার পিছন ফিরল সাঈদ। ডায়াল করল একটা নাম্বার।

খুব তাড়াহুড়োর সাথে জানতে চাইল সোহেল, 'কি খবর?'

'আমি সাঈদ, সোহেল ভাই। মিনিস্ট্রির কাজটা নিয়ে সাভারে এসেছি ঘণ্টা কয়েক আগে, কিন্তু এখানে একটা ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে, সেজন্যেই ফোন করছি আপনাকে।'

'তাই?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল সোহেল। 'কি ঘটেছে?'

প্রথমে জায়গাটার বর্ণনা দিল সাঈদ। 'ওখান দিয়ে যাচ্ছি, দেখলাম উল্টো দিক থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ি আসছে। হঠাৎ সাইড রোড থেকে বেরিয়ে এল একটা ট্রাক—বোধহয় সাত টনী। গাড়িটা ছিল মরিস। ধাক্কা খেয়ে পড়বি তো পড় একেবারে খাদের তলায়। চাঁদের আলোয় খুব ভাল ভাবে কিছু দেখা যায়নি, তবে গাড়িটা একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বলে মনে হলো।'

'আহা,' দুঃখে কাতর হলো সোহেল। 'ভদ্রলোক? মরিসের ড্রাইভার?'

'কিনারা থেকে খাদের তলা দেড়শো ফিট নিচে,' বলল সাঈদ। 'ওখানে পড়লে কেউ বাঁচে?'

'স্যাড, ভেরি স্যাড। তা এখন তুমি কি করতে চাও, সাঈদ?'

'কেন কি জানি, এতটুকু ক্লান্ত হইনি,' বলল সাঈদ। 'তাই বাড়ি ফিরতে মন চাইছে না। ভাবছি আমার দু'নম্বর ঠিকানায় চলে যাব কি না।'

'যাও। খানিক ঘুমাও। তারপর, এই সন্ধের দিকে, ছ'টায় দেখা করবে আমার সাথে। কথা আছে। কোথায় আছি তা তো জানোই।'

'ঠিক আছে,' বলল সাঈদ। 'দেখা করব।'

গাড়ি নিয়ে ঢাকায় ফিরতে পৌনে এক ঘণ্টা লাগল সাঈদের। হোটেল যমুনায় উঠল। ম্যানেজার লোকটা পরিচিত, গুড মর্নিং বলে একগাল হাসল সে। সাঈদ বলল, 'ভীষণ ক্লান্ত, বুঝলেন। সারাটা দিন পড়ে পড়ে ঘুমাব। লাঞ্চের সময় একবার যেন ডাকে, খেয়ে নিয়ে আবার চোখ বুজব।' একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করে হাসল সে, তারপর গলা নামিয়ে জানতে চাইল, 'আজকাল হুইস্কি রাখেন হোটেলে, নাকি ওসব বাদ দিয়েছেন?'

মুচকি হাসল ম্যানেজার। 'আপনাদের মত পুরানো বোর্ডারদের জন্যে

রাখতেই হয়। আধ বোতল?'

'এক বোতল হলেও ক্ষতি নেই,' চোখ মটকে বলল সাঈদ।

দ্বিতীয় বার ঘুমাবার পর ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে, এখন ভাঙছে সেটা। ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে রয়েছে সে, হঠাৎ সোহেলের সাথে দেখা করবার কথা মনে পড়তেই চমকে উঠে চোখ মেলল। প্রায় আতঙ্ক বোধ করল সে। তারপর হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পাঁচটা বাজে। মাথাটা আবার বালিশের ওপর ছেড়ে দিল সাঈদ।

শায়লার কথা মনে পড়ল। সোহেল ভাই জরুরী আর কোন কাজ দেবেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত কোন বিষয়ে খানিক আলাপ করে ছেড়ে দেবেন ওকে। ছাড়া পেয়ে সোজা বাড়ি ফিরবে সে। গিয়ে হয়তো দেখবে শায়লা গান শুনছে, কিংবা নিজেই গুণ গুণ করছে আর তুলি বুলাচ্ছে ক্যানভাসে। ছবি বেশ ভালই আঁকে শায়লা, ওর ছবির একটা প্রদর্শনী হওয়া দরকার। দরজা খুলে ওকে ঢুকতে দেখে হাতের কাজ বন্ধ করে মিটিমিটি হাসবে শায়লা। জিজ্ঞেস করবে, 'কিছু খাবে?' তারপর ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইবে, 'মিনিস্ট্রিতে খুব বুঝি কাজ পড়েছে?'

সরাসরি কোন অভিযোগ করবে না শায়লা। তার চোখেও কোন অভিমান বা রাগ থাকবে না। কিন্তু মুখে হাসি থাকলেও একটু বাঁকা চোখে তাকাবে মাঝে মধ্যে। এবং ওর চোখের আড়ালে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক, একটু বিষণ্ন আর কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

বিছানার ওপর উঠে বসল সাঈদ। শায়লার কথা মনে পড়লেই উপলব্ধি করে সে, মেয়েটার ওপর অন্যায় করছে সে। ঘরে স্ত্রী থাকতে, শায়লার মত সর্বংসহা ও পরমাসুন্দরী স্ত্রী থাকতে, যে লোক অন্য মেয়েকে বিছানায় নেয় তাকে আর যাই হোক, ভালমানুষ বলা যায় না।

অথচ সাঈদ জানে, শায়লাকে প্রচণ্ড ভালবাসে সে। শায়লাকে বাদ দিয়ে নিজের কথা, জীবনের কথা ভাবতেই পারে না। তার একেবারে কোনই দোষ নেই তা নয়, কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে তার এই দুর্বলতার জন্যে ওরাই বেশি দায়ী। সে কাউকে কাছে না ডাকলেও তার চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে তারা কাছে এসে পড়ে। তখন আর নিজেকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছে করে না।

ইচ্ছে হলো, প্রতিজ্ঞা করে—শায়লার প্রতি সৎ থাকব। কিন্তু সাথে সাথেই বুঝল, প্রতিজ্ঞাটা সে রাখতে পারবে না। তাহলে? নিজের ওপর এতই যদি কম আস্থা, কেন সে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে না?

এ ব্যাপারটা নিয়ে কারও সাথে পরামর্শ করবে নাকি?

হাত বাড়িয়ে বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিল সাঈদ। বোতলটা তিন ভাগের দু'ভাগখালি হয়ে রয়েছে দেখে একটু অবাকই হলো। তারমানে দুপুরে লাঞ্চের পর বেশ অনেকটা খেয়েছে সে। এটা আরেকটা সমস্যা, এই মদ।

হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল সাঈদ, আসলে সে সত্যি ভাল মানুষ।

শায়লার প্রতি অন্যায় করছে সে, সেজন্যে একটা অপরাধবোধ সারাক্ষণ তাকে ধাওয়া করছে, আর পালাবার জন্যে মদের বোতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাখ্যাটা বেশ পছন্দ হলো তার, অস্থিরতা একটু কমল। হাতের বোতলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সেটা। এই তো, মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিল সে, শাবাশ, এক-আধটু সংযম এখনও তোমার মধ্যে আছে। এসব থেকে উদ্ধার পাবার আশা একেবারে যে নেই তা নয়।

ভালা হইয়া যা, সময় থাকতে ভালা হইয়া যা! নিজের সাথে রসিকতা করে আপন মনে হেসে উঠল সাঈদ। বিছানা থেকে নেমে এগোল বাথরুমের দিকে। খুশি লাগছে মনটা, গুণ গুণ করে উঠল।

ঠিক ছ'টায় পায়ে হেঁটে সেফ হাউসে পৌঁছুল সাঈদ। দেখল, ঠোঁটে সিগারেট, দরজার দিকে তাকিয়ে একটা ফাইলে চোখ বুলাচ্ছে সোহেল। দরজা বন্ধ করে কয়েক পা এগিয়ে থামল সাঈদ! সোহেল বলল, 'এসো, সাঈদ। বসো।' হাতের ফাইলটা বন্ধ করে দেরাজে ভরে রাখল সে।

ডেস্কের সামনে একটা হাতলছাড়া চেয়ারে বসল সাঈদ।

'এক ঝামেলা গেছে। হেদায়েত আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সব বেশ সুষ্ঠু ভাবেই ঘটেছে বলতে হবে।' একটু থেমে আবার বলল সোহেল, 'পুলিসও সেতুর ব্যাখ্যাটা সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়েছে। তারমানে উটকো কোন ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে না। ওরা জানিয়েছে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটায়, রাস্তার ধারে, একটা ব্যারিয়ার মত তৈরি করা হবে, আর যাতে কোন অ্যাক্সিডেন্ট না হয়।'

সোহেলের সাথে সাঈদও হেসে উঠল।

'আজ সকালে সেতুর সাথে কথা হয়েছে আমার,' বলল সোহেল। 'ওর কথা শুনে বুঝলাম, শেষ দিকে বুড়োকে নিয়ে তোমরা একটু ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ, খাদের গায়ে এক জায়গায় আটকে গিয়েছিল।'

'ভাগ্যিস রশি ছিল সেতুর কাছে!' প্রশংসার হাসি দেখা গেল সোহেলের মুখে। 'তবে, সেতুর কাছ থেকে এটাই আমরা আশা করি। যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে আগে থেকে তৈরি থাকে ও।'

কেন ডেকেছেন তাকে সোহেল ভাই, ভাবল সাঈদ। আলাপটা কি নিয়ে? আরেকটা কাজ দেবেন? হঠাৎ করেই তার মনে হলো, ভীষণ ক্লান্ত সে। লক্ষ করল, তার দিকে তাকিয়ে হাসছে সোহেল।

'ছোট্ট একটা কাজ দেব তোমাকে, সাঈদ। তারপর তোমার দু'হপ্তা ছুটি। গত দু'বছর বেশ অনেক খেটেছ তুমি, যথেষ্ট কাজ করেছ। এবার ছুটি নিয়ে, যাও, দূরে কোথাও থেকে বেরিয়ে এসো।'

'কাজটা কি, সোহেল ভাই?'

'এই যে,' বলে ব্রেস্ট পকেট থেকে লম্বা একটা কাগজ বের করল

সোহেল। কাগজটায় কি যেন সব টাইপ করা রয়েছে। 'তেল আবিবে খবর পৌঁছে গেছে, ওখানে আমাদের হয়ে যারা কাজ করবে তারা সবাই তৈরি। এই কাগজে ওদের সবার নাম ঠিকানা এইসব আছে। ওদের লীডার এই মুহূর্তে লেবাননে রয়েছে, তালিকাটা হাতে পেলেই সীমান্ত টপকে ইসরায়েলে ঢুকবে সে। বেশ কিছুদিন তার বা ওদের সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ থাকবে না। নিজের বুদ্ধি মত, স্বাধীন ভাবে কাজ করবে সে। তালিকাটা ঢাকা থেকে লেবাননে নিয়ে যাচ্ছে সাদেক। ওকে তো তুমি চেনো।'

'জ্বী।'

'তোমার কাজটা হলো, কাল সকালে সাদেকের সাথে এয়ারপোর্টে দেখা করে এই তালিকাটা তাকে পৌঁছে দেয়া। এগারোটার সময় তার ফ্লাইট, তুমি ওখানে পৌঁছবে সাড়ে দশটায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে তালিকাটা দেবে তাকে। প্লেনে উঠে তালিকার ওপর চোখ বুলিয়ে সব মুখস্থ করে নেবে সাদেক, তারপর ওটা নষ্ট করে ফেলবে। বুঝতে পারছ তো, তালিকাটা কি রকম গুরুত্বপূর্ণ?'

'জ্বী।'

কাগজটা সাঈদের দিকে বাড়িয়ে ধরল সোহেল। সেটা নিয়ে নামগুলোর ওপর চোখ বুলাল সাঈদ। তারপর ভাঁজ করল, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ভরল তাতে। 'আর কিছু, সোহেল ভাই?'

'না। কাল সকাল সাড়ে দশটায়, মনে থাকবে তো? সাদেকের ফ্লাইট এগারোটায়। তালিকাটা পৌঁছে দিয়েই সোজা বাড়ি ফিরে যাবে তুমি। পনেরো দিন ছুটি তোমার।'

'ঠিক আছে,' বলে উঠে দাঁড়াল সাঈদ। মানিব্যাগটা পকেটে ভরল। 'আসি তাহলে, সোহেল ভাই।'

'এসো,' বলল সোহেল। 'পনেরো দিন পর তোমার সাথে যোগাযোগ করব আমি।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাল সাঈদ। রামপুরা থেকে মৌচাক খুব বেশি দূর নয়, রিকশা না নিয়ে হেঁটেই হোটেলের দিকে পা বাড়াল সে। হোটেলের গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি ফেরার ইচ্ছে।

রাস্তার দু'ধারে আলো ঝলমলে দোকানপাট। মেঘ করেছে আকাশে, শোঁ শোঁ বাতাসও বইছে। হাঁটতে ভালই লাগছে সাঈদের। জীবন মোটামুটি মন্দ নয়, ভাবল সে। ছোটবেলা থেকেই ভয়-ডর কাকে বলে জানে না, সাহস আর বুদ্ধি দেখাবার সুযোগ খুঁজে বেড়িয়ে বড় হয়েছে—মেজাজ আর প্রকৃতির সাথে চমৎকার মিলে গেছে পেশা। নিজেকে তার কোন দিক থেকেই অসুখী মনে করার কোন কারণ নেই। চিন্তা-ভাবনার এই সূত্র ধরেই মনে পড়ে গেল শায়লার কথা।

শায়লা বড় ভাল মেয়ে। এই মুহূর্তে কি করছে শায়লা?

হোটেলের কাছে চলে এসেছে সাঈদ, এই সময় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য! ঢাকা হলো কি! এভাবে ব্যাঙের ছাতার

মত গজাতে থাকলে একদিন দেখা যাবে শহরের অলিতে গলিতেও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে চাইনিজ রেস্তোরাঁ। এদিক দিয়ে যাওয়া-আসা যে একেবারেই হয় না তো তো নয়, অথচ এই রেস্তোরাঁটা তার চোখেই পড়েনি। নীল রঙের জ্বলজ্বলে টিউব দিয়ে স্পষ্ট লেখা রয়েছে—সোয়ান ফেঙ, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বার। অ্যান্ড বার, কি মজা! নিশ্চয়ই নতুন খুলেছে, একবার ঢুঁ মেরে না গেলে কেমন যেন দেখায়। ঢাকায় এমন কোন বার আছে যেখানে তার পায়ের ধুলো পড়েনি? যেই ভাবা সেই কাজ। কোনদিকে দৃকপাত না করে রাস্তা পেরোল সে, সুইংডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

প্রথমেই একটা গমগমে গুঞ্জনের ধাক্কা খেল কান দুটো। অবাক কাণ্ড! এত বড় একটা জায়গা নিয়ে সোয়ান ফেঙ, বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না। রেস্তোরাঁ আর বার একই সাথে। রেস্তোরাঁ নামকাওয়াস্তে, আসল কথা বিদেশী মদ বেচা। গোটা পঞ্চাশ টেবিল পাতা রয়েছে, তারমানে চেয়ার পড়েছে শ'দুই। আর, সন্ধে হতে না হতেই অর্ধেকের বেশি টেবিল দখল হয়ে গেছে। সংগীতের সুমধুর মূর্ছনা, আর নীল-সবুজ রঙের কোমল আলোছায়া পরিবেশটাকে স্বপ্নময় করে তুলেছে। একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে সাঈদ লক্ষ করল, খদ্দেরদের মধ্যে তরুণ-যুবকদের সংখ্যাই বেশি, তবে কিছু আধা-বয়সী আর প্রৌঢ় ভদ্রলোকও রয়েছেন।

কথার তুবড়ি ছুটছে চারপাশে, যেন বলার কথা কারও চেয়ে কারও কম নয়। অনেকগুলো টেবিল পাশ কাটিয়ে এল সাঈদ, জানালার দিকে মুখ করে কোণের এক টেবিলে বসল। সাথে সাথেই হাজির হলো ওয়েটার। ডাবল হুইস্কি আর সোডা চাইল সে।

শরীরটা কেমন যেন লাগছে তার। সে কি দুর্বল হয়ে পড়ল? নাকি স্রেফ ক্লান্ত? হ্যাঁ, তাই হবে। হোটেলের বিছানায় প্রায় সারাটা দিন শুয়ে কাটালেও, ঘুম হয়েছে বড় জোর দুই কি আড়াই ঘণ্টা। বাকি সময়টা শুধু এপাশ ওপাশ করেছে সে। ঠিক করল, হুইস্কিটুকু গলায় ঢেলে হোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরবে। তারপর বিছানা। এবং ঘুম।

কে যেন বলল, 'খোদার কসম, একেই বলে ডানাকাটা পরী!'

ঝট্ করে ফিরল সাঈদ। সাদা পাঞ্জাবী-পাজামা পরা এক যুবক, সম্ভবত নবীন লেখক, সম-বয়সী সঙ্গীর পাঁজরে তখনও কনুই দিয়ে মৃদু গুঁতো মারছে, তাকিয়ে আছে আরেক দিকে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল সাঈদ। দেখল, এদিকে মুখ করে বসে রয়েছে মেয়েটি। দেখা মাত্র ছলকে উঠল বুকের রক্ত, রোমাঞ্চকর শিরশিরে একটা সুখানুভূতি জাগল সারা শরীরে। সুন্দরী মেয়ে দেখলে জ্ঞান থাকে না তার। আর এই মেয়েটিকে শুধু সুন্দরী বললে অন্যায় হবে, সত্যি সত্যি ডানাকাটা পরী যেন।

মেয়েটিকে যতই দেখছে, মন ততই অস্থির হয়ে উঠছে সাঈদের। সেই যে তাকিয়েছে, আর চোখ ফেরাতে পারেনি। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে এদিক ওদিক থেকে দুএকটা ইঙ্গিতময়, আপত্তিকর মন্তব্য আসছে, কিন্তু সেদিকে তার কান নেই। অসংখ্য প্রশ্ন জাগল তার মনে। ও একা কেন? ওর চেহারা

অমন ম্লান কেন? চোখে ওর কিসের ভয়?

সত্যি, মেয়েটির চেহারা কেমন যেন বিষণ্ন। মাঝে মধ্যেই ঘাড় একটু ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছে, যেন কেউ আসবে বলে অপেক্ষা করছে এখানে। তার অস্থিরতা আর অস্বস্তিটুকু অনুভব করতে পারল সাঈদ, ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি কোন বিপদে পড়েছেন? আপনার কি কোন সাহায্য দরকার?

হয়তো তাই যেত সাঈদ, কিন্তু বাতাসে ভেসে বেড়ানো দু'একটা মন্তব্য শুনে কানে পানি ঢুকল। 'ভাই রে, যা দিনকাল পড়েছে, কে যে ভদ্রঘরের মেয়ে আর কে যে ইয়ে, বলা ভারি কঠিন।' আরেকজন বলল, 'খোঁজ নিলে দেখা যাবে, দশজনের সাথে প্রেম করে বেড়ায়, মদ খেয়ে গিয়ে চার দেয়ালের ভেতর ন্যাংটো হয়ে ড্যান্স করে…' একটা টেবিল থেকে চারজন যুবক গলা ছেড়ে হো হো হা হা করে হাসতে শুরু করল। তাদের হাসিকে ছাড়িয়ে উঠল আশ্চর্য চিকন মেয়েলি, কিন্তু পুরুষের একটা কণ্ঠস্বর, 'বল হাজার টাকা দিবি, একরাতের জন্যে ম্যানেজ করে দিই তোকে।'

মেয়েটির চোখে কিসের ভয় এতক্ষণে টের পেল সাঈদ। এই পরিবেশে আগে কখনও আসেনি ও, হঠাৎ এসে পড়ে সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু এল কেন? নিশ্চয়ই কারও সাথে দেখা করার জন্যে। যার সাথে দেখা হবে, সে দেরি করছে।

মেয়েটির টেবিলে ওয়েটার। প্রথমে মাথা নাড়ল, তারপর কি যেন বলল সে। ওয়েটারের চেহারা গম্ভীর, ফিরে যাচ্ছে! কি মনে করে তাকে ডাকল মেয়েটি, 'এই শোনো।'

ফিরে এল ওয়েটার। নিচু গলায় কি যেন বলল মেয়েটি। ওয়েটার ছাড়া কেউ শুনতে পেল বলে মনে হলো না। আবার ফিরে যাচ্ছে ওয়েটার।

যার সাথে দেখা করার কথা, সে যদি না আসে? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মেয়েটি চলে যাবে। কিন্তু মদ খেতে আসা একপাল যুবকের মাঝখানে ঢুকে অত সহজে কি চলে যাওয়া সম্ভব? সন্দেহ নেই, কিছু যুবক পিছু নেবে। এদের মধ্যে রঙবাজ টাইপের বা রাস্তাঘাটে মেয়েদেরকে বিরক্ত করতে অভ্যস্ত এমন কেউ যদি থাকে, নিশ্চয়ই মেয়েটির পথ আগলে দাঁড়াবে, বলবে, একা একা কোথায় চলেছ, সুন্দরী? চলো না, আমরা তোমাকে নিয়ে যাই। সবাই মিলে একটু ফুর্তি করি।

কাল্পনিক শত্রুদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিজ্ঞা করে বসল সাঈদ। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। বিপদে পড়লে মেয়েটিকে সাহায্য করবে সে। আর, শালাদেরকে একহাত দেখিয়ে দেবে।

মেয়েটির বয়স কত হবে আন্দাজ করতে গিয়ে হোঁচট খেল সাঈদ। বিশ বাইশ হতে পারে, আবার ত্রিশ বত্রিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। অনুমানের মধ্যে এত ফারাক হবার কারণটা আবিষ্কার করতে অসুবিধে হলো না। এমন একটা শরীর, শরীরের এমনই গঠন, এই মেয়ের বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেলেও এই গঠন আর সৌষ্ঠব নষ্ট হবার নয়। শরীরটা তুলতুলে নরম নয়, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ

চামড়ার নিচে বুক, কোমর, নিতম্ব, উরু, পায়ের গোছা সবই আশ্চর্য নিরেট আর ভরাট বলে মনে হয়। মুখে কোন মেকআপ নেই, কিন্তু কানে ঝুমকো আর এক হাতে দু'গাছি চুড়ি রয়েছে। হাতঘড়িটা বাঁ হাতে, খানিক পরপরই চোখ বুলাচ্ছে সেটায়।

প্রথমবার চোখাচোখি হলো, আবার একবার বুকের রক্ত ছলকে উঠল সাঈদের। বড় বড় মায়াভরা চোখ মেয়েটির। রাজ্যের অস্বস্তি আর ভয় সেখানে। মনে মনে বলল সাঈদ, 'চিন্তা কি তোমার, আমি তো আছি।'

যেন সাঈদের মনের কথা টের পেয়েই আবার একবার তাকাল মেয়েটি। এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর দৃষ্টি নামিয়ে নিল সে। তার দৃষ্টি লক্ষ করে এতক্ষণে সাঈদ আবিষ্কার করল, হুইস্কি আর সোডা রয়েছে তার টেবিলে। ওয়েটার কখন দিয়ে চলে গেছে, জানেও না।

মেয়েটির টেবিলে আরেকবার ফিরে এল ওয়েটার। কয়েক সেকেন্ড পর মেয়েটি আর সাঈদ একই সাথে চুমুক দিল যে যার গ্লাসে—সাঈদ হুইস্কির গ্লাসে, আর মেয়েটি সেভেন-আপের গ্লাসে। চুমুক দেয়ার ফাঁকে মেয়েটি আবার তাকাল, আর সাঈদ তো চোখই ফেরায়নি। এবার অনেকক্ষণ, তা পাঁচ-সাত সেকেন্ড হবে, তাকিয়ে থাকল। তার দৃষ্টিতে অসহায় একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখল সাঈদ। জবাবে মৃদু একটু হেসে অভয় দিল সাঈদ।

'খদ্দের জুটিয়ে ফেলেছে রে!' পাশ থেকে কে যেন বলল।

ঠোঁটে গ্লাস তুলছিল সাঈদ, মাঝপথে থেমে গেল সেটা। যেদিক থেকে কথাটা এসেছে, ধীরে ধীরে সেদিকে তাকাল সে। হঠাৎ করেই একটা অস্বস্তিকর নীরবতা জমাট বাঁধল রেস্তোরাঁর ভেতর। অনেকেই তাকিয়ে আছে সাঈদের দিকে, কিন্তু আর কেউ কোন মন্তব্য করল না। কথাটা কে বলেছে, বুঝতে পারল না সাঈদ। হাতের গ্লাস টেবিলে ঠক্ করে নামিয়ে রাখল সে, টানটান হয়ে দাঁড়াল, বুক ফুলিয়ে আরেকবার তাকাল চারদিকে, তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটির টেবিলের সামনে। বেশ স্পষ্ট ও জোর গলায় বলল, যাতে সবাই শুনতে পায়, 'লতা, তোমাকে আমি দেখেই চিনতে পেরেছি। কি মনে করবে, তাই এতক্ষণ কথা বলিনি। কিন্তু এই রকম একটা জায়গায় তুমি, তাও একা—কেন?'

থতমত খাওয়া চেহারা হলো মেয়েটির। আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না বা ওই ধরনের কিছু বলতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। ঠোঁট কাঁপা একটু হাসি দেখা গেল, বলল, 'আপনাকেও আমার চেনা চেনা লাগছিল···এখন চিনতে পেরেছি, আপনি নঈম ভাই না?' সাঈদকে চেনার প্রশ্নই ওঠে না মেয়েটির, জীবনে কখনও দেখা হয়নি ওদের, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে জবাবটা বানাল সে। 'দাঁড়িয়ে কেন বসুন' পাশের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বলল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সাঈদ বলল, 'মহী কেমন আছে? অনেকদিন ওর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তোমরা তো সেই মালিবাগের বাড়িতেই আছ, তাই না?' মেয়েটির পাশের চেয়ারে বসল সাঈদ।

আশপাশ থেকে আর কোন মন্তব্য আসছে না। চাপা একটা উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছিল, সেটা কেটে গিয়ে অনেকটা হালকা হয়ে গেছে পরিবেশ। ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করেছে লোকজন। কেউ কেউ স্রেফ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, কারও কারও চোখে তীক্ষ্ণ, সতর্ক দৃষ্টি, চেহারায় দ্বিধা আর সন্দেহ। ওরা দু'জন সে-সব দেখেও না দেখার ভান করল।

'মহী ভাই চাকরি নিয়ে আমেরিকায় চলে গেছে,' বলল মেয়েটি। 'আর সবাই সেই মালিবাগের বাড়িতেই আছে, শুধু আমি ছাড়া।'

'তোমার কর্তা...'

রেস্তোরাঁর আরেক প্রান্ত থেকে একদল যুবক হৈ-চৈ করে উঠল। মাইকেল জ্যাকসনের থ্রিলার বাজছে, আরও জোরে বাজাতে বলছে ওরা। কাউন্টারে বসা লোকটা রেকর্ড প্লেয়ারের ভলিউম বাড়িয়ে দিল।

'একটা ব্রুট! ছোটলোক!' চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল মেয়েটি।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সাঈদের চেহারা। 'কি?'

মুখ তুলে তাকাল মেয়েটি। 'না, কিছু না।' হাতব্যাগ খুলে সাদা একটি রুমাল বের করে কপাল মুছল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব। আপনি এভাবে এগিয়ে না এলে ওরা আমাকে অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ত...'

'ওদের তেমন দোষ নেই,' নিচু গলায় বলল সাঈদ। 'ভদ্রঘরের মেয়েরা এসব জায়গায় একা কখনও আসে না।'

'জানলে কি আর আসতে রাজি হতাম...' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটি। ওদের কথা এখন আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

'কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন?' জানতে চাইল সাঈদ।

মাথা নিচু করে বসে থাকল মেয়েটি। সাথে সাথে কোন জবাব দিল না। নখ দিয়ে টেবিলের কোণা খুঁটছে। এক সময় চোখ তুলল।

সাঈদ দেখল, মেয়েটির চোখ চিকচিক করছে, পানি জমেছে দুই কোণে।

'হ্যাঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল মেয়েটি। 'আমার ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমাকে দেখাবার জন্যে তাকে নিয়ে আসার কথা।' একটু থেমে হাতঘড়ি দেখল সে, দরজার দিকে তাকাল, তারপর ফিরল সাঈদের দিকে। 'কিন্তু আজও ধোঁকা দিয়েছে আমাকে। আসবে না।'

'কিছুই কিন্তু বুঝলাম না,' বলল সাঈদ।

মেয়েটি নিরুত্তর। যেন সাঈদের কথা শুনতে পায়নি।

'কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞেস করল সাঈদ। 'বুঝতেই তো পারছেন, জায়গাটা আপনার জন্যে নিরাপদ নয়। বললে আপনাকে আমি পৌঁছে দিতে পারি।'

দ্রুত আরেকবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে মেয়েটি বলল, 'না, আরেকটু দেখতে চাই। প্লীজ, চলে যাবেন না। আমি একা হয়ে গেলে আবার ওরা...'

'আপনাকে একা রেখে আমি যাচ্ছি না,' বলল সাঈদ।

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি। বেশ অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না। মাঝেমধ্যে দরজার দিকে তাকাল মেয়েটি। ঘড়ি দেখল। কিন্তু সাঈদের দিকে তাকাল না আর।

নিস্তব্ধতা ভাঙল সাঈদই। 'এভাবে চুপচাপ বসে না থেকে আমরা তো কথা বলতে পারি।'

গভীর ভাবে কি যেন ভাবছিল মেয়েটি, সাঈদের কথায় তার সংবিৎ ফিরল। 'জ্বী? কিছু বলছিলেন?'

হেসে ফেলল সাঈদ। 'জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার নাম কি? নাকি নেহাতই ব্যক্তিগত হয়ে গেল প্রশ্নটা?'

'আমি···আমি শম্পা, মানে মিসেস শম্পা।'

'মিসেস সে-তো আগেই জেনেছি,' বলল সাঈদ। 'আমি সাঈদ সাঈদ মাহমুদ। মিনিস্ট্রি অভ ওয়ার্কস-এ আছি। আপনার স্বামী? কি করেন ভদ্রলোক?'

শম্পার চেহারায় পরিষ্কার ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল। 'ওর কথা আমি আলোচনা করতে চাই না।'

আলাপ যখন একবার শুরু করা গেছে, সেটাকে মাঝপথে থামাতে চায় না সাঈদ। শম্পা থামতে সাথে সাথেই জানতে চাইল, 'আপনার ছেলে—নিশ্চয়ই খুব ছোট, কার সাথে আসবে সে?'

'কার সাথে আবার, জানোয়ারটারই নিয়ে আসার কথা,' হিসহিস করে উঠল শম্পার গলা। চোখে ধিকিধিকি ঘৃণার আগুন জ্বলছে। 'কিন্তু আজও সে আনবে না। এই নিয়ে তিনবার ধোঁকা দিল আমাকে।'

শ্রাগ করল সাঈদ। 'বেশ বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোক আপনার জীবনটাকে হেল করে তুলেছেন, তা···'

'ভদ্রলোক! হুঁহ্!'

'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' নরম সুরে প্রশ্ন করল সাঈদ।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে মুখ তুলল শম্পা।

'নাক গলানো হয়ে গেলে মাপ করবেন,' বলল সাঈদ। 'আপনার কথার মধ্যে কিছুটা রহস্য, কিছুটা ট্র্যাজেডির গন্ধ পাচ্ছি বলেই কৌতূহল হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি, আপনার জীবনে একটা সমস্যা আছে। আমি হয়তো কিছুই করতে পারব না, তবু সমস্যাটা কি জানতে পারলে হয়তো দু'একটা পরামর্শ দিতে পারতাম।'

মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল শম্পা, সেদিকেই তাকিয়ে রইল।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল সাঈদ। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'আমি ড্রিঙ্ক করলে আপনি কিছু মনে করবেন?'

'ড্রিঙ্ক?' কেন যেন চমকে উঠল শম্পা।

'হ্যাঁ,' বলে নিজের টেবিলের দিকে তাকাল সাঈদ। গ্লাসটা অর্ধেক খালি অবস্থায় রয়ে গেছে ওখানে। 'হুইস্কিটুকু শেষ করতে চাই।'

'ছি ছি, আপনিও এসব খান?' প্রায় আঁতকে উঠল শম্পা। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি কোল্ড ড্রিঙ্ক…'

'আপনার স্বামী বুঝি মদ খান?'

'মদ খায় কিনা জানি না, তবে মদ যে তাকে খায় তাতে কোন সন্দেহ নেই।' কথাটা বলে আড়ষ্ট হয়ে গেল শম্পা, দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল, যেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কথা বলে ফেলেছে।

ওয়েটারকে ডেকে গ্লাসটা আনাবার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল সাঈদ। রিস্টওয়াচ দেখল ও। এই টেবিলে আসার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার তাগাদাটা আবার অনুভব করল। ভাবল, এখানে যদি চিঁড়ে না ভেজে, বাড়ি ফিরে গিয়ে ঘুমানোই ভাল। তবে, সিদ্ধান্ত নিল, এর শেষটা দেখা দরকার। দুঃখে, রাগে, ঘৃণায় অস্থির হয়ে আছে, এ ধরনের মেয়েরাই তো ফাঁদে পা দেয়। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়।

'আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চান?' জানতে চাইল সে।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল শম্পা। কিন্তু মাথা নিচু করে বসেই থাকল, উঠল না।

মেয়েটার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আর কিছু বলল না সাঈদ।

'আমার ছেলে,' বলেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল শম্পা। 'আজ একবছর তাকে আমি দেখি না…'

চট্ করে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সাঈদ। কেউ কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে বটে, তবে তাদের চেহারা থেকে বিদ্রূপের ভাবটুকু দূর হয়ে গেছে। 'শান্ত হোন,' ফিস ফিস করে বলল সে। 'লোকে হাসবে যে! প্লীজ, শান্ত হোন।'

রুমাল দিয়ে চোখ মুছল শম্পা। কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল সে। 'কি বলব আপনাকে! আমার স্বামী…মানুষ নয় সে। বিয়ের পর একটা বছর সুখেই ছিলাম। তারপর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসতে শুরু করল বাড়িতে। আমার সামনে বসে জুয়া খেলত, মদ খেত। আপত্তি করলে হাত তুলত গায়ে। এভাবেই কেটে গেল চারটে বছর। ইতিমধ্যে ছেলেটা হয়েছে। মেনেই নিয়েছিলাম সব। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা ধরল ও, বলল, ওর নাকি অনেক টাকা দরকার।'

'তারপর?'

'এবার যারা বাড়িতে আসতে শুরু করল তারা সবাই তার ব্যবসার পার্টনার,' বলল শম্পা। সাঈদের দিকে তাকাতে পারছে না সে। 'তারা আমার দিকে যেভাবে তাকাত, আমার সহ্য হত না। তারপর একদিন মাথায় আমার আকাশ ভেঙে পড়ল…ও বলল, ওদেরকে আমার খুশি করতে হবে। বলল, ওদের সাথে বসে আমাকে মদ খেতে হবে। সেদিন সারারাত মারধর করল আমাকে। পাশের ঘরেই আড্ডা বসেছিল ওদের, জোরে কাঁদতেও পারলাম না। পরদিন সকালে আমাকে জোর করে ঠেলে পাশের ঘরে পাঠাল…' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে, থরথর করে কেঁপে উঠল তার শরীর।

'আমার শরীর থেকে আগেই সব কাপড় খুলে নিয়েছিল...'

'আর আমি শুনতে চাই না!' পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে সাঈদ। দাঁতে দাঁত চাপল সে।

'চিৎকার দিয়ে ফিরে এলাম শোবার ঘরে, ওর পা জড়িয়ে ধরে বললাম, আমি তোমার ছেলের মা, এইটুকু শুধু দয়া করো—ছেলেকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে দাও আমাকে।...দুপুরের দিকে বাড়ি থেকে বের করে দিল আমাকে, কিন্তু ছেলেটাকে রেখে দিল।'

'আপনি একটু শান্ত হোন...'

'ভাগ্যিস একটা চাকরি করতাম,' বলে চলল শম্পা। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়েছে, এখন আর কাঁদছে না। 'ওকে বিয়ে করায় আত্মীয়স্বজনরা খেপে ছিল, তাদের সাহায্য পেলাম না। অফিসের লোকজনদের ধরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। কিন্তু ছেলেকে ছেড়ে থাকি কিভাবে, বলুন? তাই একদিন অনেক সাহস করে গেলাম ওর অফিসে। আমাকে দেখে খুব খাতির করে বসাল ও। বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে। তা টাকা নিয়ে এসেছ? জানতে চাইলাম, কিসের টাকা? বলল, ছেলেকে ফেরত পেতে চাও না? দশ হাজার দাও, ছেলে নিয়ে যাও। এক হপ্তার মধ্যে টাকা দিতে হবে, তা না হলে ডবল হয়ে যাবে অঙ্কটা।...অনেক কষ্টে জোগাড় করলাম টাকা। নেকলেসটা বিক্রি করে দিতে হলো। টাকা নিয়ে অফিসে গেলাম। দিলাম ওর হাতে। বলল, রনিকে তো আজ আনিনি, তুমি বরং কাল নিউ ওয়েভ রেস্তোরাঁয় এসো, রনিকে নিয়ে সন্ধে সাতটায় আমি যাব ওখানে।'

'কিন্তু পরদিন সে ওখানে যায়নি?'

'না। রেস্তোরাঁ থেকে গেলাম ওর বাড়িতে। গিয়ে শুনলাম, বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সে। কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারল না। পরদিন আবার অফিসে গেলাম। নিজের হাতে টাকা দিয়েছি, গুণে নিয়েছে ও। অথচ বলল, টাকা সে নেয়নি। জানিয়ে দিল, রনিকে পেতে হলে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, টাকাটা তাকে অ্যাডভান্স দিয়ে যেতে হবে। টাকা পাবার পর আমাকে জানাবে কবে, কোথায় গেলে রনিকে পাব আমি।'

'আবার তাকে আপনি টাকা দিলেন?'

'দিতাম না, কিন্তু ওর এক বন্ধু সব শুনে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, আমি যখন ব্যাপারটা জেনেছি, খায়রুল আর গোলমাল করতে পারবে না। ওর নাম খায়রুল।'

'তারপর?'

'আবার দিলাম পাঁচ হাজার,' বলল শম্পা। 'কিন্তু আবারও ধোঁকা দেয়া হলো আমাকে। এরপর দেখা করলাম ওর সেই বন্ধুর সাথে, সে-ই আজ আমাকে এখানে আসতে বলেছিল। খায়রুলের সাথে নাকি আগেই কথা হয়েছে তার। আজ সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে রনিকে নিয়ে এখানে আসবে সে।'

হাতঘড়ি দেখল সাঈদ। 'সাড়ে আটটা। তার মানে, আজও সে আসবে

না।'

'না।'

'হুঁ।' গম্ভীর হলো সাঈদ। 'আপনার উচিত মামলা করা। ডিভোর্স চেয়ে মামলা করুন, কোর্টের কাছে আবেদন জানান ছেলেকে আপনি নিজের কাছে রাখতে চান।'

'এসবের মধ্যে জড়াতে চাই না, ভয় করে...তাছাড়া, ভাল একটা পরামর্শ দেবে, এমন কেউ নেই আমার।' চোখ মুছল শম্পা। 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। এসব কথা কাউকে আমি বলিনি, আপনাকেও বলতে চাইনি। কিন্তু হঠাৎ করে কি যে হলো, সব বলে ফেললাম। আমি দুঃখিত। আপনি হয়তো মনে করেছেন...'

বাধা দিল সাঈদ, বলল, 'আমি কিছুই মনে করছি না। ভাবছি, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করা যায়।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মামলা করাই উচিত। কিন্তু উকিলদের সম্পর্কে যা শুনি, মামলা করতে ভরসা হয় না। একটা ট্রাভেল এজেন্সীতে চাকরি করি, ভালই বেতন পাই, কিন্তু মামলা চালাবার মত...'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' আশ্বাস দিল সাঈদ। 'আমার জানাশোনা এক উকিল আছে, প্রয়োজনের চেয়ে এক পয়সা বেশি নেবে না সে। আপনি বরং আপনার ঠিকানাটা দিয়ে রাখুন আমাকে...'

'ঠিকানা তো গেলেই জানতে পারবেন,' বলল শম্পা। '...মানে, আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন তো? অনেক কষ্ট করেছেন, আরেকটু করতে হবে। আমি একা এখান থেকে বেরুতে পারব না। এই তো, কাছেই আমার ফ্ল্যাট।'

'তাহলে আমরা উঠতে পারি, তাই না?'

হাতঘড়ি দেখল শম্পা, দরজার দিকে আরেকবার তাকাল। তারপর ম্লান গলায় বলল, 'শয়তানটা আসবে না। হ্যাঁ, চলুন।'

ওয়েটারকে ডেকে দু'জনের বিল মিটিয়ে দিল সাঈদ। শম্পা আপত্তি করল, কিন্তু সাঈদ সেটা হেসেই উড়িয়ে দিল।

বাইরে এসে ফুটপাথে কিছুক্ষণ দাঁড়াল ওরা। ওদের পিছু পিছু রেস্তোরাঁ থেকে কেউ বেরিয়ে এল না।

'কতটা কাছে আপনার ফ্ল্যাট?' জানতে চাইল সাঈদ। 'হেঁটে, নাকি রিকশায়?'

'এই তো, রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকের গলিতে ঢুকেই—বিল্ডিংটা পাঁচতলা, আমি থাকি তিনতলায়। আসুন।'

শম্পার সাথে হাঁটা ধরল সাঈদ।

গলিটায় ঢুকে মনে মনে খুশি হলো সাঈদ। অভিজাত লোকদের বসবাস এদিকে, কোন বাড়িই একতলা নয়। এসব এলাকার সুবিধে হলো, কেউ কারও খোঁজ-খবর রাখে না। কোন্ বাড়িতে কে এল কে গেল তা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না কেউ।

সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠল ওরা। ওঠার সময় কারও সাথে দেখা হলো

না। হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলল শম্পা। কবাট খুলে ফিরল সাঈদের দিকে। নেমপ্লেটের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ঠিকানাটা লিখে নিন, নাকি মনে থাকবে?'

'মনে থাকবে,' বলল সাঈদ। 'আমি দু'একদিনের মধ্যেই উকিলের সাথে আলাপ করব।'

'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে! আজ যদি ওখানে আপনি না থাকতেন, নির্ঘাত একটা বিপদে পড়তাম আমি।'

'আপনার ফ্ল্যাটে ফোন আছে?' জানতে চাইল সাঈদ।

'ও, হ্যাঁ, ভুলেই গেছি। নাম্বারটা লিখে নিন।' নাম্বার বলল শম্পা, লিখে নিল সাঈদ।

'অফিসের ফোন?'

'স্কাইরাইড ট্রাভেল এজেন্সী, নাম্বার হলো...' অফিসের ফোন নাম্বারটাও বলল শম্পা।

নোট বুকটা পকেটে রেখে সাঈদ বলল, 'আমার বাড়ির নাম্বারটাও রেখে দিন। যদি কোন বিপদে পড়েন, ফোন করলেই চলে আসব আমি।'

'ছি, ছি! কি মানুষ আমি। কেমন দাঁড় করিয়ে রেখেছি, একবার ঘরে ঢুকে বসতে পর্যন্ত বলিনি।' লজ্জায় মুষড়ে পড়ল শম্পা। 'আসুন, প্লীজ। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। তা না হলে আমি কিন্তু মনে করব আপনি মাইন্ড করেছেন। চা খেয়ে ফোন নাম্বারটা লিখে দিয়ে যাবেন। কই, আসুন।'

এই আমন্ত্রণের অপেক্ষাতেই ছিল সাঈদ, সেটা আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে মনে মনে ভয়ানক চটে উঠছিল শম্পার ওপর। ভাবছিল মেয়েটার মধ্যে কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই?

বলল, 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন।' শম্পার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল সে। তার পাশে, অন্ধকারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দরজায় তালা লাগাল শম্পা। মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধ পেল সে। শম্পা সরে যেতে গন্ধটাও হারিয়ে গেল। অথচ আবার সেটা পেতে চাইল সে। প্যাসেজের আলো জ্বালল শম্পা। সাঈদ দেখল একটা ঘরের তালা খুলছে সে।

'আসুন,' বলে সাঈদকে নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকল শম্পা। অন্ধকার ঘর। ভেতরে ঢুকে একপাশে সরে দাঁড়াল সাঈদ। ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল শম্পা, 'সরি,' বলে সরে গেল একটু। তারপর বলল, 'আলোর সুইচটা গেল কোথায় ছাই?'

'আমি দেখছি,' বলে দেয়ালের দিকে হাত তুলল সাঈদ। নরম একটা হাতের ওপর পড়ল তার হাত। শম্পা তার হাত সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু ইতোমধ্যে সেটা ধরে ফেলেছে সাঈদ। ছাড়ল, তবে কয়েক সেকেন্ড পর। শম্পার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ কানে ঢুকল তার।

'পেয়েছেন?' জানতে চাইল শম্পা। 'দরজার পাশেই তো। না হয় সরুন, আমিই দেখি।'

ভয়টা দূর হয়ে গেল সাঈদের। হাতটা ধরে রাখায় শম্পা রেগে গেছে

কিনা ভেবে ভয় পাচ্ছিল সে। গলার স্বর শুনে বুঝল ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। শুভলক্ষণ? নিজেকে প্রশ্ন করল সে। চান্স মিলেগা?

দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচবোর্ডটা পেয়ে গেল সাঈদ। গায়ে এখন আর গা ঠেকে নেই, কিন্তু টের পেল পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে শম্পা। আবার সেন্টের মিষ্টি গন্ধ ঢুকল নাকে।

'কি, পেলেন না?' চাপা হাসির সাথে আবার জানতে চাইল শম্পা।

'কোথায়?'

এবার বেশ শব্দ করে হেসে উঠল শম্পা। 'সরুন, আপনার কম্ম নয়।' এরপর একেবারে সাঈদের গায়ের ওপর এসে পড়ল সে।

অন্ধকার দেয়ালে দুটো হাত। সুইচবোর্ডের দিকে শম্পার হাত এগোলেই সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে সাঈদ। বলছে, 'এদিকে নয়, এদিকটা আমি দেখছি।'

'কিন্তু ওদিকটাতেই তো থাকার কথা,' বলে আবার হাত বাড়াল শম্পা।

দুটো হাত এক হলো।

'শিল্পীর হাত।'

'কি বললেন?' শম্পার গলায় একটু ঝাঁঝ, একটু কৌতূহল, খানিকটা শাসন।

'আপনার আঙুলগুলো, লম্বা লম্বা। শিল্পীদের হাত নাকি এরকম হয়।'

'আপনার বউয়ের হাত বুঝি...'

'বিয়েই করিনি।'

'আপনার কাছে দিয়াশলাই নেই? কিংবা লাইটার?'

'বলতাম নেই, কিন্তু দেখেছেন আছে,' বলল সাঈদ। পকেট থেকে লাইটারটা বের করল সে। 'হাত পাতুন।'

'কেন, আপনিই জ্বালুন না।'

'অন্ধকার আমার ভাল লাগছে,' ফিসফিস করে বলল সাঈদ। 'নিজের হাতে এই অন্ধকারকে আমি খুন করতে পারব না।'

'আপনি বেশ সুন্দর কথা বলতে জানেন,' বলল শম্পা। 'দিন।'

'কোথায়? আপনার হাত কোথায়?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল সাঈদ।

'এই তো।'

শম্পার কাঁধের ওপর হাত পড়ল সাঈদের। 'কোথায়?'

'আরে, এই তো আপনার সামনেই।'

শম্পার হাতটা ধরল সাঈদ। গুঁজে দিল লাইটারটা। একটা হাত এখনও শম্পার কাঁধে। তাকে কাছে টানল সে।

শক্ত হয়ে গেল শম্পার শরীর। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে। হাঁপাচ্ছে।

আরেকটু জোর খাটাল সাঈদ। এতদূর এসে বঞ্চিত হতে চায় না সে।

ছোট্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এল শম্পার গলা থেকে, 'না।'

'সরি,' বলে শম্পাকে ছেড়ে দিল সাঈদ। পায়ের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, খানিকটা দূরে সরে এসেছে সে । কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেল,

বোধহয় সোফার সাথে।

'আ-আপনি কি চলে যাচ্ছেন?'

'না।' কয়েক হাত দূর থেকে ভেসে এল সাঈদের গলা। 'যদি বলেন তো চলে যাই।'

তারপর আর কোন কথা নেই, শব্দ নেই।

'আপনি রাগ করেছেন,' অনেকক্ষণ পর বলল শম্পা।

জবাব দিল না সাঈদ।

'আলোটা দয়া করে জ্বালবেন?' খানিক পর জানতে চাইল সাঈদ।

কান্নার আওয়াজ পেল সাঈদ। ফোঁপাচ্ছে শম্পা।

অন্ধকারে এগিয়ে এল সাঈদ। শম্পার সামনে এসেছে বুঝতে পেরে থামল সে। তাকে স্পর্শ করল না। বলল, 'যা ঘটে গেছে, সেজন্যে আমিই দায়ী। প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। হঠাৎ কি যে হলো...'

আচমকা সাঈদের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পরল শম্পা। 'কেউ আমাকে ভালবাসে না! আজ অনেক দিন পর কারও সাথে মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমারও হঠাৎ কি যে হলো...প্রশ্রয় না দিলে এতটা এগোতে পারতেন না। আপনি নন, আমি দায়ী...'

আলো আর জ্বলল না।

শম্পার মাথায় হাত দিল সাঈদ। তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। আর শম্পা তার বুকে মুখ ঘসতে লাগল। এক সময় শম্পার দুই হাত জড়িয়ে ধরল সাঈদের গলা।

খানিক পর সোফার দিকে এগোল ওরা। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে, যেন কেউ কাউকে হারাতে চায় না।

জানালা দিয়ে ঢুকে মেঝের ওপর জ্যামিতিক একটা নকশা তৈরি করেছে সোনালী রোদ। আধ খোলা চোখে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে সাঈদ, ওটাকে চিনতে চেষ্টা করছে। শুয়ে আছে সে, একটা হাত মাথার দিকে, আধ-বোজা চোখে ঝাপসা দৃষ্টি। আরও একটু সজাগ হলো সে। দেখল, কামরার দেয়াল নীলচে ডিসটেম্পার করা। ফার্নিচারগুলো হালকা খয়েরি রঙের। বিছানার ওপর মখমল, লাল রঙের। ভাবল, আমি কোথায়? লাল মখমলের ওপর শুয়ে আছি কেন?

একটা হাত মুখের সামনে নিয়ে এসে হাই তুলল সে, পা দুটো লম্বা করে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। মাথাটা বালিশে তুলে দিয়ে ব্যাপারটা কি মনে করার চেষ্টা করল।

গত রাতের কথা মনে পড়তেই তৃপ্তির একটা পুলক অনুভব করল সাঈদ। আলো জ্বালার সময় যা যা ঘটেছিল, খুঁটিয়ে সব স্মরণ করল। আপনমনে হাসতে লাগল সে। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, পেশীর পরতে পরতে ক্লান্তি, কিন্তু মনে কোন অবসাদ বা খেদ নেই। ভাবল, যে যা চায় তার কপালে ঠিক তা জুটেও যায়। সুন্দরী মেয়েদের ওপর ভীষণ দুর্বলতা রয়েছে তার, ভাগ্যগুণে

কিভাবে যেন পেয়েও যায়। অন্তর থেকে স্বীকার করল সে, শম্পা তাকে ভারি আনন্দ দিয়েছে। বিছানায় মেয়েটা আর সবার মত নয়। ওর আচরণে বৈচিত্র্য ছিল, ছিল নতুনত্ব।

এই সকাল বেলা কেমন দেখাচ্ছে তাকে? কাপড়চোপড় পরেছে, নাকি সেই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে আছে? পাশ না ফিরেই পিছন দিকে হাত বাড়াল সে। বিছানার ওপরটা হাতড়াল কিছুক্ষণ। তারপর ঘাড় ফেরাল। বিছানায় নেই।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল সাঈদ। বিছানায় নেই কেন? কোথায় গেল? কিচেনে, নাস্তা তৈরি করছে? নাকি বাথরুমে, গোসল করছে?

বিছানা থেকে নামল সাঈদ। রোদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। কামরার আরেক প্রান্তে, একটা চেয়ারের ওপর পড়ে রয়েছে স্বচ্ছ নাইলনের একটা নাইটি—শম্পার। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে সেটাই কোমরে জড়িয়ে নিল সে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ পেরিয়ে ঢুকল কিচেনে। বাথরুমটা আগে দেখেছে।

গেল কোথায়? গেস্টরুম আর ড্রইংরুম এখনও দেখা বাকি রয়েছে বটে, কিন্তু গোটা ফ্ল্যাট আশ্চর্য প্রাণহীন লাগল সাঈদের। তার মনে হলো, ফ্ল্যাটে সে একা রয়েছে। গেস্টরুম হয়ে ড্রইংরুমে ঢুকল। চেহারায় অস্থিরতা। চোখ দুটো একটু উজ্জ্বল আর সতর্ক হয়ে উঠল। সোফার ওপর তার সব কাপড়চোপড় পড়ে রয়েছে। দ্রুত সেদিকে এগোল সে। ভাবল, কোথায় আর যাবে, নিশ্চয়ই পাশের ফ্ল্যাটে বা প্রতিবেশীদের কারও সাথে কোন দরকারে কথা বলতে গেছে। হাতঘড়ি দেখল সে—না, অফিসে যাবার সময় হয়নি এখনও। তারপর বিদ্যুৎ চমকের মত একটা প্রশ্ন জাগল মনে, নিজেকে মিথ্যে অভয় দিচ্ছে না তো সে? এমনও তো হতে পারে···। আশঙ্কাটার কথা মনে হতেই শিউরে উঠল সাঈদ।

প্রথমেই ট্রাউজারের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল সে। খুলে ভেতরে তাকাল। পাঁচশো টাকার কয়েকটা নোট, কয়েকটা একশো টাকার, বাকি সব দশ আর পাঁচ টাকার—সব ঠিক আছে। নোটগুলোর ভেতর লুকিয়ে থাকতে পারে মনে করে এক এক করে সবগুলো নোটের ভাঁজ খুলে পরীক্ষা করল সে। দম আটকে যাবার মত অবস্থা হলো তার। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। মানিব্যাগে যা কিছু ছিল সব টেবিলের ওপর নামাল। নেই।

পাগল হয়ে গেল সাঈদ। ট্রাউজারের সবগুলো পকেট হাতড়াল। যদিও তার কোন দরকার ছিল না। কারণ, পরিষ্কার মনে আছে তার, কাগজটা মানিব্যাগেই রেখেছিল সে। তারপর শার্টের পকেটগুলো দেখল।

তেল আবিবে বি. সি. আই.-এর হয়ে যারা কাজ করবে তাদের নাম-ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ছিল ওই কাগজে। সোহেল ভাই কাগজটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে অবহেলা করেননি। মাথাটা ঘুরতে শুরু করল সাঈদের। হাত থেকে খসে পড়ল শার্টটা। ধপ করে সোফার কিনারায় বসে পড়ল। হাত দুটোর ওপর মাথা নামিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নীলচে দেয়ালের দিকে। তারপর গুঙিয়ে উঠল, 'গড···ওহ্ গড!'

# পাঁচ

ঘুম ভাঙতেই চোখ পড়ল টেবিল ক্লকের ওপর। সকাল দশটা। আঁতকে ওঠার কথা সেতু ইঞ্জিনিয়ারের, তড়াক করে লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ার কথা। ছ'টায় ঘুম ভাঙে তার। আধঘণ্টা ব্যায়াম করে। গোসল করে নাস্তা সারতে আরও আধ ঘণ্টা। সাতটা পনেরো বা বিশে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দুটো দোকান তার, দুটোই নিজের হাতে খোলে। কর্মচারীরা কেউ পৌঁছুবার আগেই হিসাবের খাতায় চোখ বুলাল সে, নোট বুকে নির্দেশ ইত্যাদি লিখে রেখে মার্কেটের হালচাল বোঝার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। আজ পাঁচ বছর ধরে চলছে এই নিয়ম, শুধু মিনিস্ট্রির কোন কাজ পড়লে এর ব্যতিক্রম ঘটে।

পরশু রাতে বিছানায় যাওয়ারই সুযোগ হয়নি সেতুর, দিনটা কেটেছে ব্যবসা নিয়ে, কাজেই আজ ঘুম ভাঙতে এত দেরি হয়ে গেল। দেরি হবে জানত সে, তাই দোকানের চাবি দুই ম্যানেজারকে দিয়ে এসেছে।

কেন যেন, মনটা খুশি লাগছে তার। কারণটা কি? মিনিস্ট্রির কাজটা সুষ্ঠুভাবে সারতে পেরেছে বলে?

সেটা একটা কারণ বটে, কিন্তু এই সাফল্যের সাথে আরও একটা প্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেটাই আসল কারণ। চিন্তার এই সূত্র ধরেই মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রাহাত খান আশ্চর্য সব চেহারা নিয়ে তার মানস চক্ষে উদয় হতে শুরু করলেন।

চোখ বুজে পরিষ্কার দেখতে পেল সেতু, রাহাত খান প্রকাণ্ডদেহী একজন পুরুষ, ক্লিনসেভ্ন্, চুলে এখনও পাক ধরেনি, ভয়ানক রাগী চেহারা, চোখ দুটো আগুনের মত লাল, গলার আওয়াজ যেন বাঘের গর্জন। কাউবয় সেজে আছেন তিনি, কোমরে ঝুলছে হোলস্টার। উঁহুঁ! এই চেহারা আর পোশাক পছন্দ হলো না সেতুর, বাতিল করে দিয়ে আরেক ধরনের একটা কল্পনা করতে শুরু করল।

এক এক করে অনেকগুলো চেহারা কল্পনা করল সেতু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই মনে ধরল না। তারপর আপন মনে হেসে ফেলল সে। ছেলেমানুষি আর কাকে বলে! যাকে জীবনে কখনও দেখার সুযোগ হয়নি, তার চেহারা কি আন্দাজ করা সম্ভব?

সেদিন সাঈদের সাথেও বিষয়টা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। তার মত, সাঈদেরও একটা স্বপ্ন, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ রাহাত খানের দর্শন লাভ। শুধু পূর্ণাঙ্গ এজেন্ট হতে পারলেই খুলবে সৌভাগ্যের দরজা। আর পুরোদস্তুর এজেন্ট হতে হলে হাতের মুঠোয় আসা চাই একের পর এক সাফল্য। প্রতিটি সাফল্য এক একটা পয়েন্ট। পয়েন্টের নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা আছে, সেটা পেরোলেই সফল হবে স্বপ্ন। কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যাটা কি,

তা ওদের কারও জানা নেই। আর তাই, প্রতিটি সাফল্যের পরই আশায়-নিরাশায় দোলে ওরা।

একটা কাজ শেষ করতে পারলে আগামী দু'তিন হপ্তা ছুটি, নতুন কোন কাজের জন্যে সাধারণত ডাকা হয় না। জরুরী কোন কাজ পড়লে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

অন্যদের মধ্যে যারা পুরোপুরি এজেন্ট নয়, শুধু সাঈদকেই চেনে সেতু। নিশ্চয়ই তারা শুধু এই দু'জন নয়, আরও অনেক আছে। কে কার চেয়ে কত নম্বর পেয়ে এগিয়ে আছে জানতে পারলে ভাল হত।

পুরোদস্তুর এজেন্ট হবার পর সে হয়তো আর ব্যবসা দেখাশোনা করতে পারবে না, তখন হয়তো পুরো সময়টাই দেশ-সেবায় ব্যয় করতে হবে। নিজের ব্যবসা নিজে দেখাশোনা না করতে পারলে কিছুটা ক্ষতি হবে, কিন্তু সেটুকু ক্ষতি গ্রাহ্য করবে না সে। জেনেশুনেই এই পথে পা বাড়িয়েছে, আরাম আয়েশ, সংসার-ধর্ম ত্যাগ করতে হলেও দ্বিধা আসবে না তার। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের চেয়ে দেশ তার কাছে অনেক বড়।

ক্রিং ক্রিং।

সেরেছে! বিছানার ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে উঠে বসল সেতু। তার পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে দেখে নিশ্চয়ই দোকান থেকে করা হয়েছে ফোনটা। রিসিভার তুলে জানতে চাইল, 'কে?'

'সেতু?' পাল্টা প্রশ্ন হলো।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। সোহেল ভাইয়ের গলা। প্রথমেই মনে হলো, নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছে।

'সেতু।' সোহেলের গলায় এবার একটু বিরক্তি।

'জ্বী। জ্বী, সোহেল ভাই।'

'দু'নম্বর সেফ হাউস—চেনো?'

'জ্বী।' মাথার ভেতর ঝড় বইছে। কি হতে পারে? নতুন কোন কাজ? অসম্ভব।

'বিশ মিনিটের মধ্যে চলে এসো ওখানে,' বলল সোহেল। পরমুহূর্তে যোগাযোগ কেটে দিল সে।

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড পাথর হয়ে রইল সেতু। একটা কাজ শেষ করার পর এভাবে কখনোই তার সাথে যোগাযোগ করা হয় না। ডাকল, তাও আবার এক নম্বর সেফ হাউসে নয়। সেফ হাউস বদল—সচরাচর ঘটে না। নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছুতে হবে, মনে পড়তেই লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল সে। গোসল করার সময় নেই, সময় নেই দাড়ি কামাবার। ছুটে বাথরুমে ঢুকল সে। চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল। 'আমার চা' বলে হাঁক ছাড়ল একটা, কাপড় পরতে শুরু করেছে। দু'মিনিট পর ডাইনিংরূমে ঢুকল সে। সেই সাড়ে ছ'টা থেকে টেবিলে সাজানো আছে নাস্তা, ঢাকনি তুলে প্লেট থেকে সেদ্ধ একটা ডিম তুলে মুখে পুরল। কয়েক ঢোক পানি খেয়ে ঠক্ করে নামিয়ে রাখল গ্লাসটা। চায়ের

কাপে চুমুক দিল, 'গেছিরে।' বলে চেঁচিয়ে উঠে উহ্ উহ্ করল কয়েক সেকেন্ড—জিভ পুড়ে গেছে।

ফোন পাবার ছয় মিনিটের মাথায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেতু ইঞ্জিনিয়ার। যুক্তি দিয়ে সমর্থন মেলে না, কিন্তু তবু মনে তার ক্ষীণ একটু আশা, আজ হয়তো তার স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে।

দু'নম্বর সেফ হাউসটা ধানমণ্ডিতে। ছোট একটা ডেস্কের পিছনে বসে আয়েশ করে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে সোহেল। দরজায় নক হলো। 'কাম ইন।'

পর্দা সরিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল সেতু। কবাট ভিড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এল সে, একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়াল। 'এনিথিং রঙ, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল সে।

মৃদু হাসল সোহেল, অনেকটা অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে। 'কেন, সেতু?'

'একটা কাজের পর এত তাড়াতাড়ি ডাকা হয় না...' একটু আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল। '...তাই আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে।' আশঙ্কার কথাটাই পাড়ল সেতু, আশার কথাটা তোলার সাহস নেই তার।

চোখ-ইশারায় ফ্লাস্কটা দেখাল সোহেল। 'কফি। খেতে পারো।'

খালি একটা কাপে কফি ঢালছে সেতু, সোহেল আবার বলল, 'হ্যাঁ, অনেক কিছু গোলমাল হয়ে গেছে, সেতু।'

কিছু বলল না সেতু। কফির কাপে সাবধানে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে ভাবল, সোহেল ভাই ঘাড়ে নতুন কিছু চাপাবেন। নিশ্চয়ই কঠিন কিছু হবে সেটা। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, তার স্বপ্ন এত তাড়াতাড়ি সফল হতে যাচ্ছে না। তবে, এগোচ্ছে সে, সন্দেহ নেই। মাত্র একটা কাজ শেষ করেছে, পরপরই আবার ডাক, তারমানে ওর ওপর আস্থা আছে, ওর ওপর ভরসা করা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে নির্দিষ্ট পয়েন্ট পেতে খুব বেশি দেরি হবে না। আচ্ছা, কাজটা কি হতে পারে? আমাদের কেউ কি কোন কাজে ব্যর্থ হয়েছে? তার অসমাপ্ত কাজটা ওকে করতে দেয়া হবে?

'সব কথা তোমাদের জানানো হয় না,' বলল সোহেল। 'যখন যাকে যতটুকু দরকার তখন তাকে ঠিক ততটুকু জানানো হয়। এই নিয়ম শুধু প্রতিষ্ঠানের জন্যে নয়, তোমাদের জন্যেও ভাল।'

'বুঝি, সোহেল ভাই,' বলল সেতু। 'আমরা কেউ যদি ধরা পড়ি, বেশি কিছু বলতে পারব না, কারণ খুব অল্পই জানি। যাদের হাতে ধরা পড়ব তাদেরও এ-কথা জানা আছে, কাজেই কথা আদায়ের জন্যে তারা উঠে পড়ে লাগে না। আমরা টরচারের অভিশাপ থেকে বেঁচে যাই।'

'ঠিক তাই,' বলল সোহেল। হাসি হাসি মুখ। কাপে শেষ একটা চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল সে। 'কিন্তু আজ তোমাকে অনেক কথাই বলব আমি, সেতু। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা জটিল এক প্যাঁচের মধ্যে পড়ে গেছি।'

'পরশু রাতে যে কাজটা করলাম, এর সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে, সোহেল ভাই?' নিচু গলায় জানতে চাইল সেতু। 'হেদায়েত খানের

ব্যাপারটার সাথে?'

'ইয়েস…অ্যান্ড নো,' বলল সোহেল। 'ব্যাপারটা হলো, তেল আবিবে আমাদের হয়ে কাজ করবে এমন কিছু লোকের একটা তালিকা দেয়া হয়েছিল সাঈদকে। আজ সাড়ে দশটার ফ্লাইটে আমাদের এক লোক লেবাননে যাচ্ছে, তালিকাটা তার হাতে পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল। বুঝতেই পারছ, তালিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'জ্বী।'

'কাল সন্ধের সময়,' বলল সোহেল, 'মানিব্যাগের ভেতর তালিকাটা নিয়ে এক নম্বর হাউস থেকে বেরিয়ে যায় সাঈদ। মৌচাকের কাছে নতুন একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট হয়েছে, দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সেতু। 'সোয়ান ফেঙ। শুধু রেস্টুরেন্ট নয়, বারও।'

'হ্যাঁ। সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল সাঈদ, গলা ভেজাবে বলে ভেতরে ঢোকে। ওখানে তার সাথে একটা মেয়ের পরিচয় হয়।' ক্ষীণ একটু হাসল সোহেল, সেতু বুঝতে পারল, সাঈদকে নিঃশব্দে ব্যঙ্গ করলেন সোহেল ভাই। 'মেয়েটি নাকি অপরূপ সুন্দরী। সেরকমই হবার কথা।' আবার ঠোঁট-বাঁকা হাসিটা দেখা গেল। 'আলাপের সময় জানতে পারে, লম্পট এক পাষণ্ড নাকি তার স্বামী, লোকটা নাকি তাকে ব্ল্যাকমেইলও করছে।'

সেতু মনোযোগ দিয়ে শুনছে, কোন মন্তব্য করল না।

'ওখান থেকে ওরা মেয়েটির ফ্ল্যাটে আসে,' বলল সোহেল। চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'রাতটা সাঈদ ওই ফ্ল্যাটেই কাটায়। সকালে উঠে দেখে, মেয়েটি নেই। মানিব্যাগটা আছে, টাকা এবং অন্যান্য কাগজ-পত্র সব আছে, কিন্তু তালিকাটা নেই।'

'সর্বনাশ।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ আর কিছু বলল না সোহেল। এক সময় সেতু জানতে চাইল, 'আমাকে আপনি কি করতে বলেন, সোহেল ভাই?'

'তুমি তো অনেকদিন ধরে সাঈদের সাথে কাজ করছ, তাই না, সেতু?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। 'পনেরো ষোলোটা কাজ একসাথে করেছ তোমরা। ওকে তুমি ভাল করে চেনো…পছন্দও করো, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল সেতু। 'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন—সাঈদকে আমার ভাল লাগে। ওর মধ্যে কি রকম জানি একটা ম্যাগনেটিক পাওয়ার আছে—কাছে টানে। কেন, তা ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু ওর সব কিছুই আমাকে অবাক, না হয় মুগ্ধ করে। যেমন, ওর হাঁটার ভঙ্গিটার কথাই ধরুন—চেয়ে চেয়ে দেখি আমি। মনে হয়, আমি ওর মত হতে পারলে দারুণ হত।'

'শুধু এর জন্যে?' ভুরু একটু কুঁচকে জানতে চাইল সোহেল। 'শুধু ওর চেহারার জন্যে ওকে তোমার ভাল লাগে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল সেতু। 'না-না, তা নয়। ওর রিফ্লেক্স অ্যাকশন, আপনি জানেন, ভারি চমৎকার। আর প্রায় সব ক'টা কাজে দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

দিয়েছে ও। তাছাড়া প্রয়োজনে সাংঘাতিক কঠোর হতে জানে সাঈদ। অন্তত…'

সেতুর চেহারায় ক্ষণিকের জন্যে একটা ইতস্তত ভাব দেখা দিতেই দ্রুত জানতে চাইল সোহেল, 'অন্তত মানে কি, সেতু? বুঝতে পারছ তো, ওর সম্পর্কে এখন তুমি যা বলছ তার গুরুত্ব অনেক। মনে রেখো, এর ওপর মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।'

'মানে তালিকাটায় যাদের নাম রয়েছে…'

'হ্যাঁ।'

খানিক চুপ করে থাকল সেতু, চুমুক দিল কফির কাপে। 'কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না,' বলে আরও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে। কথাগুলো গুছিয়ে নেয়ার বা মনস্থির করার জন্যে তাকে সময় দিতে চায় সোহেল, তাই তাগাদা দিল না। আরও কয়েক সেকেন্ড পর মৃদু কণ্ঠে বলল সেতু, 'শেষ দিকের দু'একটা কাজে ব্যাপারটা চোখে পড়েছে আমার, সোহেল ভাই। সাঈদ কেমন যেন অস্থিরতায় ভুগছে। অনেকগুলো ভুল করে ফেলেছে, যে সব ভুল ওর কাছ থেকে আশা করা যায় না। নেহাতই মনোযোগের অভাব, বা গুরুত্ব না দেয়ার ফল। তারপর ধরুন, ওর মদ খাওয়ার ঝোঁক। দিনে দিনে সেটা বাড়ছেই। হয়তো এসব কিছুই না, স্রেফ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে…'

'আর কিছু?'

'নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না,' বলল সেতু। 'এটা-সেটা দেখে অনেক কিছুই তো মনে হয়, কিন্তু এই মনে হওয়াটা সব সময় ঠিক হয় না। দু'একবার ওদের বাড়িতে গেছি, দেখেছি, শায়লা ভাবী ওর দিকে কেমন যেন আড়চোখে তাকায়—সাঈদের ব্যাপারে কি যেন একটা কৌতূহল আছে তার, অথবা সাঈদের বিরাট কোন রহস্য তার জানা হয়ে গেছে।'

'একটু ব্যাখ্যা করো দেখি,' বলল সোহেল, 'কি বিষয়ে এত কৌতূহল শায়লার? সাঈদের কোন্ রহস্যটা সে জেনে ফেলতে পারে?'

জুলফির নিচটা একটা আঙুল দিয়ে ঘষল সেতু। 'তা আমি কি করে বলব! কিন্তু একটা ব্যাপার জানি, মেয়েরা সাঈদকে খুব পছন্দ করে। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েরা ওর জন্যে পাগল। মুশকিল হলো মেয়েদের ওপর সাঈদেরও দুর্বলতা রয়েছে—ভীষণ দুর্বলতা। ওদের ক্লাবেও গেছি বার কয়েক, দেখেছি, মেয়েরা ওকে ঘিরে আছে। কিছু মেয়ের সাথে সাঈদের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করেছি, ঢাকার সেরা সুন্দরীদের মধ্যে পড়ে তারা।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা কি জানেন, সোহেল ভাই, সাঈদ আসলে অনেকটা রেসের ঘোড়ার মত,' বলল সেতু। 'যে-কোন কাজে উঠেপড়ে লাগাই ওর স্বভাব। আমি বলতে চাইছি, একটা কাজে ওর সবটুকু শক্তি একসাথে ঢেলে দেয় ও। এ-ও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। ইমার্জেন্সীর জন্যে খানিকটা যে রিজার্ভ রাখা দরকার, সেটা ওর মনে থাকে না। ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তাই,—মদ ভাল

লাগে, কাজেই সময় অসময় নেই, ইচ্ছে হলেই খাচ্ছে। মেয়েদের ওপর দুর্বলতা, কাজেই যাকে ভাল লাগছে তার সাথেই প্রেম করছে।'

'শেষ কাজটা করার সময় বিশেষ কিছু লক্ষ করলে?'

'হ্যাঁ,' বলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সেতু, তারপর মুখ খুলল, 'সাভারেও দেখলাম, অস্থিরতার একেবারে চরমে পৌঁছে আছে ও। ইদানীং সব অ্যাসাইনমেন্টেই এই অবস্থা হতে দেখেছি। কারও কারও যেমন মঞ্চ-ভীতি থাকে, স্টেজ ফ্রাইট, বোধহয় সে ধরনের একটা ভীতি আছে ওর। এই যার অবস্থা, কাজটা শেষ হলে, সে তো একটু নেতিয়ে পড়বেই। আর তখন যদি নিজেকে চাঙা করার জন্যে মদ খায়, আশ্চর্য হবার কি আছে?' হঠাৎ থেমে গেল সেতু, সোহেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'সেকেন্ড, তারপর ক্ষীণ একটু হেসে বলল, 'এসব বিষয় নিয়ে আপনি আমার সাথে আলাপ করছেন, আমার কিন্তু খুব অবাক লাগছে, সোহেল ভাই।'

'কেন?'

'এতদিন ধরে আপনি আমাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসছেন, আপনার অন্তত একটা ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা আছে আমার,' বলল সেতু। 'সেটা হলো বুদ্ধি। সেজন্যেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, সাঈদ সম্পর্কে এসব কথা আপনার জানা নেই। আমার মনে হয়, আপনি সবই জানেন।'

'ঠিক আছে, ধরা যাক, সবই আমি জানি—তাতে কি?'

'তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ওর এই অবস্থা জানার পরও, এত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় আরেকটা কাজ কেন ওকে করতে দেয়া হলো? কেন ওর রিয়্যাকশনের কথা মনে রাখা হলো না?'

'এটা একটা ভাল পয়েন্ট, সেতু,' বলল সোহেল। 'কিন্তু জানোই তো অনেক সময় সব কথা মনে রেখে কাজ ভাগ করা সম্ভব হয় না।'

'জানি, কিন্তু...'

'আজ সকালে সাঈদের সাথে দেখা হয়েছে আমার,' সেতুকে থামিয়ে দিয়ে বলল সোহেল। 'যা যা ঘটেছে সব আমাকে বলল। তারপর সোয়াঙ ফেঙ-এ গেল, কিন্তু মেয়েটাকে কেউ তারা চেনে না, আগে কোনদিন দেখেনি। কাল যখন সোয়ান ফেঙ-এ ঢুকল সাঈদ, মেয়েটা তখন ওখানেই ছিল—এটা একটা অসম্ভব কাকতালীয় ঘটনা, কারণ আর কখনও ওখানে যায়নি সাঈদ। অথচ ওখানে মেয়েটার উপস্থিতির একটাই কারণ—তালিকাটা সাঈদের কাছ থেকে চুরি করা।'

'সাঈদ কি ঠিক জানে, ওর ঢোকার আগে থেকেই মেয়েটা ওখানে ছিল?'

নিঃশব্দে হাসল সোহেল। 'প্রশ্নটা তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম। না, তা হতেই পারে না—মেয়েটা সাঈদের'পর ঢুকেছে।'

'মাই গড! তারমানে সাঈদের পরিচয় ওদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে! এর অর্থ...'

'হ্যাঁ।' সোহেল গম্ভীর। 'এর অর্থ, সাঈদকে ফলো করা হয়েছে। হয় হেদায়েতের ওখান থেকে ফেরার সময়, অথবা আরও আগে থেকে, আর

অনেক দিন আগে থেকে, নজর রাখা হয়েছে ওর ওপর। সেদিন, আমার ধারণা, পালা করে কয়েকজন ফলো করেছিল ওকে—শেষবার ওর পিছু নেয় মেয়েটা। একটা কাজ শেষ করলে বা পেটে খানিকটা মদ পড়লে সাঈদের কি রিয়্যাকশন হয়, তা ওদের ভাল করেই জানা ছিল।'

'আপনি বলতে চাইছেন, হেদায়েত খানের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'সম্ভব। লোকজন তো ওদেরও কম নেই। খরচের ব্যাপারে কার্পণ্য নেই, এই কাজে ওরাও গুণী লোক পায়। হেদায়েত ছিল তাদের একজন।'

'একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না,' বলল সেতু। 'আপনি হেদায়েতকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তার একটা কারণ ছিল?'

'কারণ, তেল আবিবে আমাদের অপারেটররা ধরা পড়ে গেছে—তাদের পরিচয় একমাত্র হেদায়েতের পক্ষেই ফাঁস করে দেয়া সম্ভব ছিল। তেল আবিবে খবর পাচার করার একটা মাধ্যমের কথা আমরা জানতাম। কিন্তু আরও একটা আছে, যেটার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। ফলে হেদায়েত যখন ইনফরমেশনটা পাঠায়, আমরা টেরও পাইনি। এই অবস্থায় হেদায়েতকে সরিয়ে না দিয়ে উপায় ছিল না।'

'হেদায়েতকে সরিয়ে না দিয়ে আমাদের উপায় নেই, হেদায়েতের কর্তারা কি সেটা আগে থেকে বুঝতে পারেনি?' জিজ্ঞেস করল সেতু। 'তারা কি জানত না, হেদায়েতকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে আমরা কাউকে পাঠাব? জানত না হেদায়েতই যে আমাদের লোককে ধরিয়ে দিয়েছে তা আমরা বুঝতে পারব?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সোহেল। ওর চোখ দুটো একটু উজ্জ্বল হলো, আর চিকচিক করে উঠল। কারও ওপর খুশি হলে বা কেউ প্রশংসা পাবার মত কিছু করলে এই রকম হয় তার। 'তুমি ঠিক ধরেছ, সেতু। কি বলতে চাইছ আমি জানি। বলতে চাইছ, হেদায়েতের ওপরওয়ালারা জানত তাকে সরাবার জন্যে লোক পাঠাব আমরা। জানত, আমাদের যে ক্ষতিটা হয়েছে তার জন্যে আমরা হেদায়েতকেই দায়ী করব। আমাদের এই অবস্থায় পড়লে তারা যা করত আমরাও তাই করব, এ-ও তাদের অজানা ছিল না। আর তাই, হেদায়েতের ওপর নজর রেখেছিল তারা। আমরা হেদায়েতকে নিয়ে কিছু একটা করব, এই অপেক্ষায় ছিল।'

'তা হয়তো সত্যি, কিন্তু সাভারে ওদের টিকটিকি থাকলেও, সাঈদের পিছু নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ধরনের কোন ঝুঁকি তারা নিতে পারে না। অত রাতে রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া বলতে কিছুই থাকে না। কেউ পিছু নিলে সাঈদ তাকে দেখতে পেত।'

'ঠিক,' বলল সোহেল। 'তারমানে দাঁড়াল, কেউ জানত সাঈদ সাভারে যাচ্ছে। জানত, ওখানে সাঈদের কাজটা কি হবে। এমন একজন কেউ, যে আন্দাজ করতে পেরেছিল সেই রাতেই সাভারে যাচ্ছে সাঈদ। এখন বলো,

এসব থেকে কি বুঝছ তুমি?'

'আমি…,' এক মুহূর্ত চিন্তা করল সেতু। '…আপনি আমাকে ফোন করার আগে পর্যন্ত এ-ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। আপনার ফোন পাবার পর আমি রঁদেভো ক্লাবে সাঈদের সাথে যোগাযোগ করি। মাই গড!' হঠাৎ আঁতকে উঠল সে।

'ঠিক ধরেছ,' বলল সোহেল। 'ওই রঁদেভো ক্লাবে এমন কেউ একজন ছিল যে জানত হেদায়েতের সময় হয়ে এসেছে। সাঈদ যে বি. সি. আই.-এর হয়ে কাজ করছে, তাও জানত সে। সাভার থেকে সাঈদ ফিরে আসার পর তাকে নজরবন্দী করতে পারে তারা, তা সে যেভাবেই হোক। কাজটা তেমন কঠিনও নয়। সাভার থেকে ঢাকায় ফেরার সহজ রাস্তা ওই একটাই। ঢাকায় ফিরে আসার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত তারা চোখে চোখে রাখে সাঈদকে।'

'সাঈদ যদি এত আগে ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে পরশু রাতে আপনার সাথে এক নম্বর সেফ হাউসে দেখা করতে যাওয়ার সময়ও ওর পিছনে কেউ ছিল,' বলল সেতু। উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। 'তার মানে জায়গাটা ওরা চিনে ফেলেছে, সোহেল ভাই!'

'চিন্তার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল সোহেল। 'এক নম্বর সেফ হাউস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওটা আর কখনও ব্যবহার করা হবে না।'

আপনমনে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সেতু। 'লক্ষণ খুবই খারাপ, সোহেল ভাই। এসব আমার একদম ভাল ঠেকছে না। এখন আমাকে আপনি কি করতে বলেন? আপনার জন্যে, আর বিশেষ করে সাঈদ আর শায়লা ভাবীর জন্যে আপনি আমাকে যা বলবেন তাই করব আমি।'

খুব নরম সুরে জানতে চাইল সোহেল, 'শায়লাকে তুমি পছন্দ করো, তাই না, সেতু?'

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল সেতু। 'পছন্দ করি? বলতে পারেন, সোহেল ভাই, দেবী আর শায়লা ভাবীর মধ্যে পার্থক্য কি? ওর মত মেয়ে হয় আজকাল? কই, আমার তো চোখে পড়ে না। বিশ্বাস করুন, সোহেল ভাই, শায়লা ভাবীর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে আমার।' সোহেলের হাসি হাসি মুখ, ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে ওঠা চোখ দেখে দ্রুত আবার বলল সেতু, 'না-না, অন্য কোন সেন্সে নেবেন না, প্লীজ! ওকে আমার ভাল লাগার মধ্যে কোন লোভ বা খারাপ আর কিছু নেই। শায়লা ভাবীকে আমার ফুলের মত লাগে—নির্মল, পবিত্র…' হঠাৎ অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সেতু। 'নাহ্ এ আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, সোহেল ভাই।' হঠাৎ তার মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল। 'আচ্ছা, সাঈদ কি করে সে-সম্পর্কে শায়লা ভাবী কিছু জানে? তার এই পেশা সম্পর্কে?'

মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'না। শুধু জানে, একটা মন্ত্রণালয়ে চাকরি করে সে।'

'বুঝেছি। এখন তাহলে আমাকে কি করতে বলেন আপনি?'

'ব্যাপার হলো, তালিকাটা মেয়েটার হাতে রয়েছে।'

'কিন্তু তাতে কি?' জানতে চাইল সেতু। 'তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদেরকে মেসেজ পাঠিয়ে সাবধান করে দিলেই তো হয়।'

'হয় না,' বলল সোহেল। 'কারণ মেসেজ পাঠাবার আর কোন উপায় নেই। তেল আবিবে একটাই মেসেজ পাঠানো হয়েছে, দ্বিতীয় মেসেজ পাঠাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না, পাঠানো হবে না বলে তাদের জানিয়েও দেয়া হয়েছে। মেসেজটা পেয়ে যে যার কাজের জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে তারা, যার যে-রকম দরকার সব কাগজ-পত্রও পেয়ে গেছে সবাই। এখন শুধু তাদের লীডার লেবানন থেকে ওখানে পৌঁছে নির্দেশ দিলেই কাজ শুরু করতে পারে তারা। না, সেতু,' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সোহেল, 'ওদেরকে সাবধান হতে বলার কোন উপায়ই নেই।'

'তার মানে,' সেতুর চোখে অবিশ্বাস, 'আমাদের এতগুলো লোক জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হাতে ধরা পড়ে মারা যাবে, আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'কিছুই করার নেই, সেতু। তেল আবিবে আর কোন লোক নেই আমাদের, কাজ করালে ওদেরকে দিয়েই করাতে হবে। ঢাকা থেকে তালিকাটা যার লেবাননে নিয়ে যাবার কথা, সে সকালের ফ্লাইটেই রওনা হয়ে গেছে। লোক দিয়ে তালিকাটার একটা ডুপ্লিকেট কপি পাঠিয়ে দিয়েছি তাকে আমি।'

'এ-কথা জেনেও যে…?'

'আমাদের একমাত্র আশা, তালিকাটা বাংলাদেশ থেকে পাচার হবার আগেই কিছু একটা করতে পারব আমরা,' বলল সোহেল। 'আর তা যদি না পারি…'

'ওখানে আমাদের লোকেরা মারা পড়বে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল, আর কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করল না।

হাত দুটো মুঠো করে ব্যর্থ আক্রোশে দাঁতে দাঁত চাপল সেতু। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'ঠিক আছে, তালিকাটা মেয়েটার হাতে। সেটা তো কাউকে তার দিতে হবে, তাই না? তেল আবিবে ওটা পাঠাবার জন্যে কি ব্যবস্থা নেবে তারা?'

'হেদায়েত একটা রেডিও ব্যবহার করছিল,' বলল সোহেল, 'সেটা আমরা উদ্ধার করেছি, হেদায়েতকে নিয়ে তার বাড়ি থেকে সাঈদ বেরিয়ে আসার পরপরই। আমাদের আশঙ্কা ছিল, তার বা তার লোকের কাছে আরও একটা রেডিও আছে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, দ্বিতীয় কোন রেডিও ওরা ব্যবহার করছে না।'

'কি করে বুঝলেন?'

'তেল আবিবে আমাদের লিয়াজোঁ অফিসারের পরিচয় হেদায়েত মাস কয়েক আগেই জেনে ফেলেছিল,' বলল সোহেল। 'কিন্তু এতদিন পর এইমাত্র সেদিন তাকে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ধরল। এই দেরি দেখে মনে হচ্ছে, ওদের

কাছে দ্বিতীয় একটা রেডিও না থাকারই সম্ভাবনা। লোক মারফত তথ্য পাচার করছে।'

'তার মানে তালিকাটা পাচার করতে সময় লাগবে ওদের···'

'এমনিতে,' বলল সোহেল, 'কিছু পাচার করতে হলে হেদায়েতের মাধ্যমে বা তার সাহায্য নিয়েই কাজটা করছিল ওরা। সেটা ধরে নেয়াই সঙ্গত, কারণ এখানে যারা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করছে তাদের হেড করেই পাঠানো হয়েছিল হেদায়েতকে। সে এখন নেই। কাজটা তাহলে অন্য কেউ করবে। এমন একজন, যাকে আমরা চিনি না।'

'তাকে খুঁজে বের করা, তারপর তালিকাটা উদ্ধার করা, সে তো অনেক দূরের কথা,' হতাশ সুরে বলল সেতু। 'যদি দেরি হয়ে যায়, আদৌ ওটা ফেরত···'

'এতটা নিরাশ হলে চলবে কেন, সেতু? আমাদের হাতে অন্তত একটা সূত্র তো রয়েছেই। রঁদেভো ক্লাবে সে-রাতে যারা ছিল তাদের মধ্যে কেউ একজন জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের লোক, হেদায়েতের অনুপস্থিতিতে সে-ই দায়িত্ব পালন করছে। তাকেই আমরা খুঁজছি। তালিকাটা তার মাধ্যমেই দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে।'

গুম হয়ে বসে থাকল সেতু।

'কাজে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি, সেতু। ঢিলেমি এখন হারাম। প্রয়োজনে আমরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠব। এখন শোনো···' টেবিলের ওপর দিয়ে সেতুর দিকে মাথা সরিয়ে আনল সোহেল।

গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাঈদ। প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে, অথচ বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না তার। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া, ফুটপাথে লোকজন—তাকাচ্ছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না সে। এমন একটা মনের অবস্থা, নিজেও ভাল বুঝছে না। অনুশোচনার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক একটা অনুভূতি পিষে ফেলছে তাকে। শাস্তি হিসেবে নিজেকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, সাঈদের অনুভূতি অনেকটা সেই লোকের মত।

সকালে সোহেলের সাথে কথা হয়েছে তার। সোহেলের ভাবভঙ্গি আর সিদ্ধান্ত কি হবে তাই নিয়ে ভয়ানক উদ্বেগের মধ্যে ছিল সে। শুধু উদ্বেগ নয়, রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছিল। বি.সি.আই. তার এজেন্টদের ওপর অত্যন্ত সদয় আর উদার, কিন্তু কর্মকর্তারা কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে জানে সে-সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা আছে তার। তবে কথা বলার সময় অবাকই হলো সাঈদ। তার বর্ণনা আর ব্যাখ্যা এমন সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করল সোহেল, যেন একটুও বিস্মিত হয়নি সে। সব শোনার পর কয়েকটা মাত্র কথা বলল। বললও খুব শান্ত ভঙ্গিতে, 'হ্যাঁ, তেল আবিবে যারা আমাদের হয়ে কাজ করবে তাদের জন্যে বিরাট একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা। লেবানন থেকে ইসরায়েলে ঢোকার জন্যে ওদের লীডার তৈরি হয়ে আছে, তার প্রোগ্রাম বাতিল করার কোন উপায় নেই। তারিখ, সময় সব ঠিক হয়ে

গেছে, সে সব বদলানো সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমরা শুধু তালিকার একটা ডুপ্লিকেট কপি পাঠাতে পারি তাকে, আর আশা করতে পারি চুরি যাওয়া তালিকাটা তেল আবিবে পাচার হতে বেশ কয়েক দিন সময় লাগবে। ইতিমধ্যে, ভাগ্য যদি ভাল হয়, ওটা আমরা উদ্ধার করতে পারব। আর তা যদি না পারি, তালিকাটা যদি তেল আবিবে পৌছে যায়,' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল, 'ওখানে আমাদের সব কজন মারা পড়বে। শুধু মারা পড়বে, তাই নয়—তুমি তো জানো, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স বিদেশী স্পাইদের নিয়ে কি করে। প্রতিটি হাড়ের দুই জয়েন্টের মাঝখানটা ভাঙবে ওরা। অথচ আমাদের লোকেরা কাজই শুরু করেনি, কোন তথ্যই ওরা দিতে পারবে না। কষ্ট থেকে বাঁচবে সে-উপায়ও নেই তাদের, কারণ ডেথ-পিল দেয়া হয়নি কাউকে। কাজটা তুমি ভাল করোনি, সাঈদ।'

আরও আধ ঘন্টা পর বাড়িমুখো হলো সাঈদ। এতক্ষণে শায়লার কথা মনে পড়ল তার। আর সব বারের মত সাধারণ ঘটনা হলে বাড়ি না ফেরার জন্যে বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প বানিয়ে বুঝ দিত শায়লাকে, কিন্তু আজ সে কিছু বলারই প্রয়োজন বোধ করছে না। নিজে তো কোণঠাসা হয়ে পড়েছেই, সেই সাথে অদ্ভুত একটা নির্লিপ্ত ভাব পেয়ে বসেছে তাকে। কারও সাথেই তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। একবার ভাবল, মাথাটাকে যদি অচল করে দেয়া যেত! এত সব চিন্তা আসছে মাথায়, অসহ্য!

ফিরে আসছে সাঈদ, এই সময় পিছন থেকে সোহেল বলেছে, 'তুমি বরং হপ্তা কয়েক ছুটি নাও, সাঈদ। তারপর আমি তোমার জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা দেখব।'

সাঈদ বলেছে, 'আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, সোহেল ভাই। আমি ভেবেছিলাম, এরপর আমাকে বাদ দেয়া হবে।' আসলে আরও খারাপ কিছু ভেবেছিল সাঈদ। ভেবেছিল, যে অন্যায় সে করেছে তার জন্যে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এ ধরনের গাফিলতির জন্যে বি.সি.আই. কি ব্যবস্থা নিয়ে থাকে সাঈদের তা জানা নেই, কিন্তু সি.আই.এ, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স, কে.জি.বি. বা অন্য আরও অনেক অর্গানাইজেশনের কথা জানা আছে তার—বড় ধরনের গাফিলতির শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়। আবার কখনও কখনও, পদাবনতি ঘটানো হয়, ফিল্ড অপারেটর হয়ে যায় ডেস্ক ক্লার্ক, উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এজেন্টের ফাইলে লেখা হয় 'দায়িত্বপূর্ণ কাজ কখনোই দেয়া যাবে না একে'। এসবের যে-কোন একটা যদি তার কপালে থাকে, তার চেয়ে আত্মহত্যা করাও ভাল।

আবার তাকে কাজ দেয়া যাবে কিনা ভেবে দেখা হবে, সোহেলের এই কথায় খুব যে একটা ভরসা পেয়েছে সাঈদ, তা নয়। শাস্তির সম্ভাবনা এখনও একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না। আসলে ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে আরও কিছু সময় লাগবে। হেডকোয়ার্টার যদি কোন সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা সাথে সাথে নাও জানাতে পারে। হয়তো শেষ মুহূর্তে জানাবে, শাস্তিটা দেয়ার সময়।

ওর কথার উত্তরে সোহেল বলেছে, 'এরূপর এ ধরনের আর কোন ভুল তোমার করা চলবে না, সাঈদ। সেটা তোমার জন্যে ভাল হবে না। যা করেছ, এর কোন ক্ষমা হয় না। তবু, আবার একটা সুযোগ তুমি পাবে।'

সত্যিই কি তাই? সোহেল ভাই তাকে মিথ্যে আশ্বাস দেননি তো?

একটা সুপারমার্কেটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। ফুটপাথে সুন্দরী মেয়েদের ভিড়। তাদের কেউ একজন খিল খিল করে হেসে উঠল। সাঈদের শরীর ঘৃণায় রী রী করে উঠল। ইচ্ছে হলো গাড়ি থামিয়ে মেয়েটার সামনে দাঁড়ায়, তার গলা টিপে ধরে খুন করে ফেলে।

ফ্ল্যাট সিস্টেমের বাড়ি। গ্যারেজে গাড়ি রেখে তিনতলায় উঠে এল সাঈদ। মন একটু যেন শান্ত হয়েছে। বাড়ি ফিরে এলে এই শান্ত ভাবটা আসে তার। বোধহয় ঘরের লক্ষ্মী বউটিরই কৃতিত্ব। সব কথা তাকে বলা যায় না, কিন্তু সব কথা শোনার জন্যে সে জেদও ধরে না, স্বামীর মঙ্গল কামনায় যার জুড়ি নেই, সেবায় যার নেই এতটুকু ত্রুটি, সেই তো আদর্শ স্ত্রী! শায়লা, অন্তর থেকে স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল, আমি তোমাকে নিজের চেয়েও ভালবাসি। তোমার ওপর অনেক অন্যায় করেছি, সেজন্যে তুমি আমাকে মাফ করো।

চাবি বের করে দরজা খুলল সাঈদ। ইচ্ছে হলো গলা ছেড়ে শায়লার নাম ধরে ডাকে, সামনে এলে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়। প্রথমে ড্রইংরুমে ঢুকল সে। এ-সময় এখানেই শায়লার থাকার কথা। দিনের বেলা ঘুমায় না সে, সোফায় আধশোয়া হয়ে বই-পত্র পড়ে। শায়লার এই আধশোয়া ভঙ্গিটা সাঈদের খুব প্রিয়। যতবার দেখে, শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। নিজেকে আবার তার অপরাধী মনে হলো, কই, কথাটা তো কোন দিন বলা হয়নি শায়লাকে!

কাপড় ছাড়ল না সাঈদ। আগে শায়লার সামনে দাঁড়াবে। শায়লার শান্ত চেহারা, প্রশ্রয় দেয়া হাসি, এসবের ভেতর আশ্চর্য একটা নিরাপদ আশ্রয় আর নির্বিঘ্ন সুখ খুঁজে পায় সে।

নেই। নিশ্চয় কোথাও গেছে। মার্কেটে? ম্যাটিনি শোতে? একা মার্কেটে যেতে পারে, কিন্তু সিনেমায় যাবে না। তারপরই সাঈদের মনে হলো, সে বাড়ি ফেরেনি, এই অবস্থায় কোথাও তো যাবার কথা নয় শায়লার তাহলে?

কোথাও বেরুলে একটা চিরকুট রেখে যায় শায়লা। বেডরুমে ফিরে এল সাঈদ। যা ভেবেছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়না আর পিছনের হার্ডবোর্ডের মাঝখানে সরু ফাটলটার মধ্যে আটকানো···কিন্তু ছোট একটুকরো কাগজের বদলে আজ এনভেলাপ কেন? ভুরু কুঁচকে উঠল সাঈদের। প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগল, কিছু ঘটেছে?

এনভেলাপটা হাতে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সাঈদ। নতুন ধরনের একটা অনুভূতি, এই অনুভূতির সাথে পরিচিত নয় সে—একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সাঈদ। বাইরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ,

আকাশে নিঃসঙ্গ একটুকরো মেঘ, এসব দেখে কেন যেন বিষাদে ছেয়ে গেল তার মন। ধীরে ধীরে এনভেলাপটা খুলল সে।

শায়লা লিখেছে:

প্রিয় সাঈদ,

ব্যাপারটা জানার পর তুমি হয়তো আঘাত পাবে। কিন্তু আমি যতটুকু বুঝি, এ-ধরনের একটা আঘাত তোমার পাওনা হয়েছে। আরও মনে হচ্ছে, ইদানীং তোমার কাছে আমি এতটাই তুচ্ছ আর নগণ্য হয়ে উঠেছিলাম যে আমার কোন আচরণই তোমাকে আঘাত দিতে পারবে বলে মনে হয় না। এই ব্যাপারটার জন্যে তুমি যদি কষ্ট পাও জেনো তাতে আমার আনন্দ নেই। যাতে সহজে মেনে নিতে পারো সেই কামনাই করি।

সম্পদ, তা সে যত নগণ্যই হোক, হারালে ব্যথা লাগে। আর পুরুষদের বেলায়, তাদের অহঙ্কারে আঘাত লাগে। কিন্তু যদি মনে রাখো, আমারও অহঙ্কারে অনেক দিন ধরে অনেক বড় বড় আঘাত লেগেছে, তাহলে হয়তো ব্যথা কিছুটা কম পাবে। তুমি আমাকে মর্যাদা দাওনি, আমি তোমার অমর্যাদা করলাম—ব্যাপারটা শোধবোধ হয়ে গেল।

তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি—শুধু এই কারণে নয় যে আমি অসুখী (যদিও গত তিন চার মাস আমার মত অসুখী মেয়ে দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি ছিল কিনা সন্দেহ)। বাইরে রাত কাটিয়ে এসে আমাকে মিথ্যে অজুহাত শোনাতে, সেটাও কারণ নয়। আমি চলে যাচ্ছি, বিশ্বাস করো, একজনের প্রেমে পড়েছি বলে। কোন দিক থেকেই ও তোমার মত নয়, কিন্তু তবু ওকে আমি গভীর ভাবে ভালবাসি। এর মানে যদিও এই নয় যে তুমি আমার অমর্যাদা না করলেও ওর প্রেমে পড়ে আমি ঘর ছাড়তাম। না, তা ছাড়তাম বলে মনে হয় না। হয়তো, সেক্ষেত্রে আমি ওর প্রেমেই পড়তাম না। কিংবা পড়লেও, সময় মত নিজেকে সামাল দিতে পারতাম। আমাকে যদি তুমি সুখী করতে পারতে তাহলে হয়তো আমার স্বামী, আমার ছোট্ট সোনার সংসারটাই আঁকড়ে ধরে থাকতাম আমি। কিংবা যদি জানতাম, তোমার জীবনে আমি এতটাই বড়, এতটাই জায়গা দখল করে আছি যে আমি চলে গেলে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে, অথবা আত্মহত্যা করবে, তাহলে অতটা নিষ্ঠুর হতে মন চাইত না।

ব্যাপারটা জানার পর কি করবে তুমি, আমি জানি না। কিন্তু আশা করি, চিন্তা-ভাবনার কাজটা সেরে, কি করবে বলে ঠিক করলে, তোমার সময় মত আমাকে একটু জানাবে।

ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নিয়ো না, কিংবা ভেব না এটা আমার একটা ছেলেমানুষি, রাগ করেছি, রাগ মিটে গেলে আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। এই রকম কিছু ভাবলে বোকামি করবে। কারণ, আমি আর তোমার কাছে ফিরে আসব না।

তোমার মঙ্গল কামনা করি, সাঈদ। একটা সময় আমরা খুব উপভোগ

করেছি। দুঃখ এই যে সেই সময়টা থাকল না। শায়লা।

বিঃ দ্রঃ ভাল কথা, ওর পরিচয় অবশ্যই তোমার জানা উচিত— দ্য সিলভা।

চিঠিটা পড়ার সময় মুখে প্রচুর রক্ত উঠে এসে সাঈদের চেহারা টকটকে লাল করে তুলেছিল। ব্যাপারটা মনের গভীরে আসন গাড়ার সাথে সাথে রক্ত নেমে গিয়ে সাদা, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। চিঠি ধরা হাতটা কাঁপছে তার, চিঠিটা নিজের অজান্তেই হাত থেকে খসে পড়ে গেল। একবার টলে উঠল সে, জানালার গ্রিল ধরে সামলে নিল। মনে হলো, মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। এমন হাঁপাচ্ছে, যেন এইমাত্র দু'মাইল দৌড়ে এল। তিন মিনিট নড়ল না সে। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত এগোল আলমিরার দিকে।

হুইস্কি আর গ্লাস বের করল সাঈদ।

## ছয়

বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার।

আজ মাসুদ রানা আসছে। ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সোহেল। চোখ রয়েছে খোলা ফাইলে, কিন্তু কান দুটো করিডরের দিকে। খানিক পর পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠল তার। পরমুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল চেহারা। পায়ের আওয়াজই কিন্তু রানার নয়। দোরগোড়ায় দেখা গেল সলীলকে।

'ব্যস্ত?' জানতে চাইল সলীল।

'নিশ্চয়ই তোর সেই মতলব নিয়ে এসেছিস?'

'না…মানে,' আরও খানিক ইতস্তত করে হেসে ফেলল সলীল। '…মানে, পপি জানতে চাইল তুই চা খাবি কিনা। পারভিন আজ আসেনি, তাই আমিও ভাবলাম আমরা খাব আর তোর কপালে জুটবে না, তা কি করে হয়। এর মধ্যে মতলব কি দেখলি?'

'দিতে বল,' বলল সোহেল। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে ছুঁড়ে দিল সলীলের দিকে। সলীল সেটা লুফে নিল। 'বারবার ভান করবি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। ওটায় পাঁচটা সিগারেট আছে, মোট ছয়বার চা খাওয়াবি। মনে থাকে যেন।'

চেহারা বিরূপ হয়ে উঠল সলীলের। 'ছয়বার কেন?'

'একসাথে পাঁচটা ফাইভ-ফাইভ পাচ্ছিস, বদলে আমি এক কাপ চা বোনাস হিসেবে পেতে পারি না?'

'ঠিক আছে, পপি কি বলে দেখি,' বলল সলীল। সোহেল বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে লক্ষ করে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদল করল সে, 'হ্যাঁ রে, আজ নাকি

স্বয়ং বি. সি. আই. আসছে?'

জবাব না দিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করল সোহেল। তার দেখাদেখি সলীলও দরজার দিকে ফিরল। কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলল না। সোহেলে দিকে পিছন ফিরল সলীল, এগিয়ে গিয়ে দরজা পেরোল, করিডরে দাঁড়িয়ে তাকাল রিসেপশন রুমের দিকে। পিছন থেকে আচমকা মাথায় গাঁট্টা খেয়ে ব্যথা ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল সে। ঝট করে ফিরতেই সোহেলকে নয়, দেখতে পেল রানাকে। 'ও, আপনি, ঘটক মহাশয়!'

ভেতরে অফিস থেকে সোহেলও দেখতে পেল ওকে। চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল সে। 'আরে! ওদিক দিয়ে কোত্থেকে এলি; রানা?'

ঘরে ঢুকল ওরা। এগিয়ে এসে সোহেলের ডেস্কের এক কোণে বসল রানা। ঝুলে থাকা পা দুটো ঘন ঘন দুলছে। 'আকাশ থেকে পড়লাম!' বলে রহস্যময় একটু হাসল ও।

'বুঝেছি,' বলল সোহেল। 'বসের পার্সোনাল এলিভেটরে চড়ে সরাসরি ওঁর ওখানে গিয়েছিলি।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'পারভিন কোথায় রে, দেখছি না যে?'

'ছুটিতে।'

সলীলের দিকে ফিরল রানা, 'পপিকে চা দিতে বল না।'

সলীল ইতস্তত করতে লাগল। দু'বার মুখ খুলল, কিন্তু আওয়াজ বের না করে বন্ধ করে ফেলল আবার। তারপর নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল, 'তুই তো জানিস, রানা, আমরা একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করার জন্যে সংগ্রাম করছি...'

'তোদের সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক, এই কামনা করি,' বলল রানা। এটা যে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ, সলীল সেটা ধরতে পেরেছে বলে মনে হলো না। ট্রাউজার আর শার্টের পকেটেগুলোয় হাত চাপড়ে আবার বলল রানা, 'নেই। তুই তো জানিস, আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।'

'শালা!' বিড়বিড় করে বলল সলীল, রানা যাতে শুনতে না পায়। 'আরও এক বছর পর ছাড়লে কি হত।'

'কিছু বলছিস?' জানতে চাইল রানা।

'ও আর কি বলবে,' হাসি মুখে কামরায় ঢুকল পপি, হাতে ট্রে। রানার দিক থেকে সলীলের দিকে ফিরল সে। 'এই, তোমার না তিনটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট? ক'টা বাজে খেয়াল আছে?'

হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠল সলীল।

ইতোমধ্যে ট্রেটা সোহেলের ডেস্কে নামিয়ে রেখেছে পপি, সলীলকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই কামরা থেকে বের করে দিল সে।

ওদেরকে চা পরিবেশন করল পপি, সাথে কেক। কেকে একটা কামড় বসিয়ে সোহেল সহাস্যে জানতে চাইল: 'মিয়ার মতলব ছিল সিগারেট, বিবির মতলবখানা কি জানতে পারি?'

'যান, আপনি ভারি ইয়ে!' রানার দিকে চোখ তুলল পপি। 'সোহানা'পা

কেমন আছে, মাসুদ ভাই?'

সোহানার প্রসঙ্গ উঠতেই ম্লান হয়ে গেল রানার চেহারা। অনেক দিন পর একসাথে একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ হয়েছিল ওদের। সব না হলেও অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে। পরস্পরকে ওরা কত গভীর ভাবে ভালবাসে, তা যেন নতুন করে উপলব্ধি করেছে ওরা। যদিও একই সাথে দু'জনেই বুঝছে, ওদের এই প্রেমের মধ্যে কাঁটা আছে অনেক, আছে খাদ ঢাকা ফাঁদ আর গরল। অনেক ব্যাপারেই মতের অমিল রয়েছে; সেটা যে-কোন সময় দুস্তর হয়ে উঠতে পারে, আর তাহলেই পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে ওরা। দূরে সরে যাবে, কিন্তু পরস্পরকে ওরা কেউ ভুলে থাকতে পারবে না। যে যার আলাদা জগৎ নির্মাণ করে সুখী হবে, সে-উপায় নেই। এ-বাঁধন অদৃশ্য, কিন্তু ইস্পাতের চেয়েও কঠিন, সেটাকে শুধু বোধহয় মৃত্যুই ছিঁড়ে ফেলার শক্তি রাখে।

অনেকদিন পর সোহানাকে কাছে পেয়ে লোভী হয়ে উঠেছিল রানা। ভেবেছিল গভীর অন্ধকারে থাকবে দু'জন, পরস্পরের অণুপরমাণু আবিষ্কার করবে। কিন্তু এমন একটা ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত ভাব দেখাল সোহানা, একেবারে চুপসে গেল রানা। তারপর সোহানার মন যখন বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে গোলাপ কুঁড়ি হয়ে উঠল, যখন ফুটে উঠে গন্ধ বিলাবার জন্যে উন্মুখ, রানা তখন অভিমান সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। হাজার হোক মেয়ে তো, পুরুষের মান ভাঙাবার হাজারটা অস্ত্র জানা আছে সোহানার। এক এক করে ব্যবহার করতে শুরু করল সে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

এরপর দু'জনেই গম্ভীর। পরিবেশ হয়ে উঠলে থমথমে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ওদের গাম্ভীর্যের মুখোশও একটু একটু করে খুলছিল। এই সময় ঢাকায় চলে আসতে হলো রানাকে। 'সোহানা?' বর্তমানে ফিরে এসে পপির দিকে তাকাল রানা। 'ভাল, ভাল আছে ও।'

ফিক করে একটু হেসে পপি বলল, 'ইঁট আর সিমেন্টের কথা সোহানা'পা আপনাকে কিছু বলেনি, মাসুদ ভাই?'

'আচ্ছা,' হেসে উঠল সোহেল। 'বিবির তাহলে এই মতলব!'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' বলল রানা। 'কন্ট্রোল দরে সিমেন্ট আর এক নম্বর ইঁট দরকার তোমাদের—বাকিতে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে, শুনেছি আপনার কিছু বন্ধু-বান্ধব আছেন যাঁরা...'

'ইঁট-সিমেন্টের ডিলার। ঠিক আছে, ওদের সাথে আমি সলীলের যোগাযোগ করিয়ে দেব।'

ইতোমধ্যে চা খাওয়া শেষ হয়েছে ওদের, কাপ-পিরিচ ট্রে-তে তুলে নিয়ে ডানা মেলা পরীর মত কামরা থেকে যেন উড়ে বেরিয়ে গেল পপি। আনন্দের ঢল নেমেছে তার মনে। সেই সাথে কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল তার অন্তর। রানাকে যারা চেনে তারা জানে ওই 'যোগাযোগ করিয়ে দেব' বলে ও আসলে জানিয়ে দিল ইঁট সিমেন্ট বাকিতে পাইয়ে দেব। আর ওগুলো বাকিতে কিনতে

পারলেই শুধু পাঁচতলা কমপ্লিট করা সম্ভব।

পপি বেরিয়ে যেতেই দেরাজ থেকে নতুন একটা প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল সোহেল, জানতে চাইল, 'তারপর, ওদিকের আর সব খবর কি বল?'

'ভাল,' ছোট্ট করে জবাব দিল রানা। 'এদিকের খবর কি?'

'এদিকের খবর,' জিজ্ঞেস করল সোহেল, 'বস তোকে বলেননি?'

'ঢাকার ব্যাপার নিয়ে তেমন কোন আলাপ হয়নি,' বলল রানা। 'বললেন, এখানে যা ঘটছে, আমাকে একটু দেখতে হবে। তোর কাছ থেকেই সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে নিতে বললেন।'

'হ্যাঁ, সব দায়িত্ব তোকেই নিতে হবে,' বলল সোহেল। 'বসের সাথে আগেই আলাপ হয়েছে আমার। কোত্থেকে শুরু করব বল দেখি। কতটুকু জানিস তুই?'

'কিছু কিছু জানি,' বলল রানা। কথাটা ঠিক নয়, আসলে গত কয়েকদিন ঢাকায় যা কিছু ঘটেছে, সবই রানার প্ল্যান মোতাবেক। 'কিন্তু তুই বরং প্রথম থেকেই শুরু কর। কম কথায় সারবি।'

'আমি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছি, প্ল্যানটা বসের,' বলল সোহেল। 'অপূর্ব একটা প্ল্যান দিয়েছেন তিনি, তুলনা হয় না। আগেই বলে রাখি, সম্পূর্ণ প্ল্যানটা আমিও জানি না। সাঈদকে তো চিনিসই, তোর হাতেই ট্রেনিং পেয়েছে। ষোলো-সতেরো মাস ধরে বেশ ভাল কাজ দেখিয়ে আসছিল সে। কিন্তু মাস তিন-চার আগে থেকে তার মধ্যে দুটো দোষ দেখা যায়—একটা মদ, আরেকটা মেয়েমানুষ।'

'জানি।'

'জানিস?'

'সবার খবর বা বলা উচিত সব খবরই এক-আধটু রাখতে হয়,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'তাছাড়া, বিশেষ করে নিজের হাতে যাদের ট্রেনিং দিয়েছি, তাদের খবর নিয়মিতই রাখি আমি। বলতে পারিস এটা আমার একটা হবি।'

'ছোট্ট একটা কাজ দেয়া হয়েছিল সাঈদকে...'

সোহেলকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ওটাকে তুই ছোট্ট একটা কাজ বলিস?'

'তুই জানিস কি কাজ দেয়া হয়েছিল ওকে?'

'হেদায়েতকে সরানোর কাজটা তো?'

অসহায় ভঙ্গিতে একবার চোখ বন্ধ করে মাথা দোলাল সোহেল। 'সবই তো দেখছি জানিস, তাহলে আবার শুনতে চাইছিস কেন?'

'ঠিক আছে, আর বাধা দেব না, তুই বলে যা,' বলল রানা।

যা যা ঘটেছে, সংক্ষেপে সবই বলল সোহেল। সে ভেবেছিল, উদ্বেগে অস্থির হবে রানা, কিংবা রাগে ফেটে পড়বে। কিন্তু রানা সম্পূর্ণ শান্ত। 'কি রে, তুই ব্যাপারটাকে এত সহজ ভাবে নিচ্ছিস কিভাবে?' জানতে চাইল সোহেল।

'এত প্যাচাল না পেড়ে আমাকে কি করতে হবে তাই বল,' জানতে চাইল রানা।

'গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার কি ধারণা তাও তোর জানা দরকার,' বলল সোহেল। 'সাঈদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে বটে, ওরা জানে সাঈদ বি. সি. আই.-এর হয়ে কাজ করছে, কিন্তু এজেন্ট হিসেবে তার ভূমিকা কতটুকু, কি তার ক্ষমতা বা অধিকার, এ-সব ওদের জানা নেই। সাঈদের পিছু নিয়ে বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার আর আমাদের সেরা এজেন্টদের পরিচয় জানতে চেয়েছিল ওরা। সেজন্যেই হেদায়েতকে আমরা সরাব জেনেও বাধা দেয়নি, বরং নির্লিপ্ত ছিল, বিনিময়ে চেয়েছিল এই সুযোগটা। ওদের ভাগ্যই বলতে হবে, হেদায়েতকে সরাবার কাজটা সারার পরপরই সাঈদকে আমরা আরও একটা ছোট্ট কাজ দেই।'

'দেয়া কি উচিত হয়েছে?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা। 'একটা কাজ শেষ করার পর নিয়ম হলো…'

'প্ল্যানের একটা অংশ,' রহস্যময় একটু হাসি দেখা গেল সোহেলের ঠোঁটে, আর কিছু ব্যাখ্যা করল না সে। পরমুহূর্তে গম্ভীর দেখাল তাকে, বলল, 'সাঈদের চরিত্র তাদের জানা ছিল। জানত একটা কাজের পর রিয়্যাকশনে ভোগে সে। জানত, পেটে একটু মদ পড়লে আর সামনে সুন্দরী মেয়ে দেখলে দুনিয়ার কোন খবর থাকে না ওর। সেই সুযোগটাই ওরা নিয়েছে।'

ডেস্কের ওপর বসে রয়েছে রানা, মুখটা দরজার দিকে ফেরানো, সোহেলের কথা মন দিয়ে শুনছে বলে মনে হলো না। সোহেল থামতেও তার দিকে তাকাল না। জানতে চাইল, 'আমাকে কি করতে হবে?'

'কাজটায় সাঈদকে সাহায্য করছিল সেতু ইঞ্জিনিয়ার, তোর আরেক শিষ্য,' বলল সোহেল। 'ওকে নির্দেশ দেয়া আছে, তুই যোগাযোগ করলেই ওর সাহায্য পাবি।' একটু বিরতি নিল সোহেল, তারপর আবার বলল, 'সন্দেহ নেই, রহস্যটা রঁদেভো ক্লাবেই। সে রাতে ওখানে যারা ছিল তাদের নামের একটা তালিকা দিচ্ছি তোকে।' রানা ফিরল, ওর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল সোহেল।

'কিছু বিদেশী লোকজনও ছিল দেখছি,' তালিকায় চোখ রেখে বলল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল সোহেল। 'ওরা বেশিরভাগই বিদেশী দূতাবাসের অফিসার।'

'দ্য সিলভা—চিনি না, মিস চেরি—চিনি না, মিসেস জ্যোতি—উঁহুঁ, নাফিজা বেগম—নাহ্, নাসরিন—দুচ্ছাই একজনকেও চিনতে পারলাম না।'

'শায়লাকে?'

'পরিচয় নেই,' বলল রানা। 'তবে জানি, সাঈদের বউ।'

'সাঈদকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, আজ সন্ধের পর তার সাথে দেখা করবি তুই।' বলল সোহেল। 'অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে, সম্ভবত। ওকে তোর মন খুলে কথা বলতে হবে। তালিকায় যারা রয়েছে, বিশেষ করে মেয়েদের কথা বলছি, ওদের সম্পর্কে ওর কাছ থেকেই সব জানতে হবে তোর।'

'হুঁ।'

'এমন হতে পারে, ওর চোখে যেটা ধরা পড়েনি, তুই সেটা দেখতে পাবি,' বলল সোহেল। 'আর, সাঈদকে নিয়ে কি করা হবে সেটা তোর ওপরই ছেড়ে দিতে বলেছেন বস্। যদি দরকার মনে করিস, যতটা ইচ্ছে কঠোর হতে পারবি তুই।'

'ঠিকানা?'

'সেতুর সাথে যোগাযোগ করবি,' বলল সোহেল। 'সে-ই তোকে সাঈদের ঠিকানা জানিয়ে দেবে।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে পানির মত সহজ একটা কেস,' বলল রানা। 'তবে একটা পয়েন্ট বেশ মজার। মেইন আইডিয়াটা ছিল, ওরা জানত আমরা হেদায়েতকে সরাতে যাচ্ছি। আমরা কি করছি না করছি জানার জন্যে হেদায়েতকে ওরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে, তেমনি আমরাও ওদের সম্পর্কে জানার জন্যে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছি সাঈদকে। এসব থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল।'

'কি?'

'সাঈদ কোথায় থাকে, ওরা জানে,' মৃদু হেসে বলল রানা।

জবাবে সোহেলও একটু হাসল। বলল, 'ঠিক ধরেছিস। নিশ্চয়ই সাঈদের ঠিকানা জানে ওরা।'

'চমৎকার। কাজ শুরু করার একটা উপায় বেরিয়ে এল এ থেকে। এরই মধ্যে একটা আইডিয়া উঁকি দিচ্ছে, বুঝলি। তুইও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছিস। সেতু আর গিলটি মিয়াকে সাথে নিয়ে ভাল একটা নাটক করা যাবে, কি বলিস?'

'শুরু হিসেবে ওটা মন্দ হবে না, তা ঠিক,' সায় দিল সোহেল।

ডেস্ক থেকে নামল রানা। 'তবে, সময়ের চেয়ে একটু পিছিয়ে আছি আমি। ওই তালিকাটা আমাদের দরকার, তাই না? দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাবার আগেই উদ্ধার করতে হবে।'

একটু হাসল সোহেল। 'বললাম না, বস্ চমৎকার একটা প্ল্যান দিয়েছেন। চমকটা হলো, চুরি যাওয়া তালিকার কোন মূল্যই নেই। ওটাকে নকল বা ভুয়া যা খুশি বলতে পারিস। আসলে, হেদায়েতকে যে ওরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে, এটা আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন বস্। তারা জানত, হেদায়েতকে আমরা সন্দেহ করি। বস্ আরও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, তারা সাঈদের জন্যে একটা ফাঁদ পাতবে। আসল তালিকাটা আমরা সেদিনই এগারোটার ফ্লাইটে লেবাননে পাঠিয়ে দিয়েছি। যেটা চুরি গেছে সেটা যে নকল, তা কিন্তু সাঈদ জানে না।'

মনে মনে হাসল রানা, অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে বুড়ো ওর প্রতিটা নির্দেশ। এমন কি প্ল্যানটা যে ওর তৈরি, সে কথা সোহেলকে পর্যন্ত জানায়নি। গুড, ভেরি গুড। লক্ষ্মী ছেলে। অবশ্য নিরাপত্তার খাতিরে যাকে যা বলার প্রয়োজন নেই তাকে সেকথা কখনও বলেন না মেজর জেনারেল।

'কি হলো তোর?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সোহেল, 'পাগলের মত আপনমনে হাসছিস কেন?'

'সে তুই বুঝবি না,' বলে এড়িয়ে গেল রানা। 'ভাল কথা, দরকার মত সেতু আর গিলটি মিয়ার সাহায্য নেব, কিন্তু হেডকোয়ার্টারের সাথে কোন যোগাযোগ রাখব না আমি। মানে, একান্ত বাধ্য না হলে।'

'হ্যাঁ, দূরে দূরে থাকা উচিত তোর,' সমর্থন করল সোহেল। 'এখানে ঢিল পড়েছে, ওখানে এলোমেলো হয়ে গেছে, কোথাও উল্টে পড়ে আছে সব—আমি জানি, আবার সব তুই পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিবি। এই অ্যাসাইনমেন্টে এটাই তোর কাজ। আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা। প্রতিশোধের ব্যাপারটা আরও পরে আসবে। ওরা আমাদের বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেছে, রানা।'

'নাকে তেল দিয়ে ঘুমো,' সোহেলকে আশ্বস্ত করল ও। 'আমি দেখছি কি করা যায়।' শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল রানা।

বেডরুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে রানা। মেঘ করেছে আকাশে, অন্ধকারকে বার বার চিরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বোধহয় বৃষ্টি হবে। এক জোড়া পটলচেরা চোখ বিরক্ত করছে ওকে। চোখ তো নয়, এক জোড়া গভীর কালো দীঘি, টলমল করছে স্বচ্ছ পানি। নাক দিয়ে জোরে বাতাস টানতেই মিষ্টি সেন্টের গন্ধ পেল ও—আসলে পায়নি, গন্ধটা শুধু স্মরণ করতে পারল। ভাবল, ওয়াশিংটনের আকাশেও কি মেঘ জমেছে? সোহানাও কি খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ওর কথা ভাবছে?

ওয়াশিংটনে সোহানাকে রেখে ঢাকায় ফিরে আসার পর থেকে ওর প্রতি আকর্ষণটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে রানার। স্বপ্নে-জাগরণে বার বার শুধু মনে উঁকি দিচ্ছে সোহানা। এখানের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবে বলে আশা করছে ও। তারপর ছুট। সোহানাকে তার কাছে পেতে হবে।

কানে ফোনের রিসিভার, কিন্তু সেতু ইঞ্জিনিয়ারের কথা কিছুই শুনছে না রানা। কিভাবে কি করা হবে তা ব্যাখ্যা আর বর্ণনা করেছে রানা, সেটাই এতক্ষণ ধরে পুনরাবৃত্তি করল সেতু।

সেতুর শেষ কথাটার খেই ধরে রানা বলল, 'হ্যাঁ, এখান থেকে ন'টায় বেরুচ্ছি আমি। হোটেল ব-দ্বীপ-এ ঢুকে এক কাপ কফি খাব, তারপর বেরিয়ে এসে দাঁড়াব ফুটপাথে। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে সাঈদের ফ্ল্যাটে যাব আমি। আমার পিছনে একজন থাকবে।' প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করল ও। তারপর বলল, 'তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে, সেতু। একটা জিনিসের অনেকটা গভীর পর্যন্ত দেখতে পাও তুমি। আমি জানি, সাঈদকে তুমি পছন্দ করো। বলো তো, তার সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি?'

'কি বলব, মাসুদ ভাই…'খানিক ইতস্তত করে বলল সেতু, '…আসলে, ওকে আমি শুধু শুধু পছন্দ করি না। ওর মত গুণী ছেলে খুব কমই চোখে পড়ে। কথা হলো, আমাদের মধ্যে সেরা লোকটিও ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে,

তাই না? আমি ঠিক কি বলতে চাইছি…'

'বুঝেছি। কিন্তু আমাদের এই পেশায় কারও নার্ভ নেতিয়ে পড়লে কি চলে?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা। 'তোমার নার্ভ, সেতু? সেটা কি নেতিয়ে পড়েছে?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল সেতু ইঞ্জিনিয়ার।

'ঠিক আছে, তাহলে সেই কথাই রইল, কেমন? সাঈদের ওখানে যাচ্ছি আমি। দেখা হবে।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

জানালা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকল রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। তারপর এগিয়ে গিয়ে আলমিরা থেকে ক্যাসেট টেপরেকর্ডারটা বের করল, বোতাম চাপ দিয়ে অন করল সেটটা। 'তুই শালা যদি অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করিস, আমি তোকে পেত্নী সেজে ভয় দেখাব। আর তোকে…তোকে আমি…স্রেফ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেব…' সোহানার কৃত্রিম ঝাঁঝ আর আক্রোশ মেশানো গলা। অনেক দিন আগে, একটা দুর্লভ মুহূর্তে রানার বুকে মাথা রেখে হুমকিগুলো দিয়েছিল সে। জানত না, টেপ চালু করে রেখেছে রানা।

আপনমনে হাসতে হাসতে কাপড় বদলাল রানা। দেরাজ থেকে বের করে হোলস্টারে ভরল ল্যুগার পিস্তলটা। এটা সাধারণ একটা ল্যুগার, শুধু দু'ইঞ্চি কেটে ফেলে দিয়ে ছোট করা হয়েছে ব্যারেল। ছোট করা ব্যারেলের শেষ মাথায় আটকানো আছে একটা সাইলেন্সার।

'তুই আমার গায়ের গন্ধ, ভোরবেলার ফুলের সুবাস। পেঁয়াজ কাটার ছুরি, বড়ই দরকারী।

'সাতরাজার ধন মাণিক আমার। তোকে কি হারাতে পারি?…'

হাসি চাপতে গিয়ে এমন অবস্থা হলো, আরেকটু হলে বিষম খেত রানা। রেকর্ডপ্লেয়ার অফ করে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও।

আধঘণ্টা পর ব-দ্বীপ রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল রানা। পাঁচ মিনিট আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঝক ঝক করছে রাস্তা-ঘাট, লোকজন আর যানবাহনের ভিড়ও কমে এসেছে।

হাঁটতে শুরু করল রানা।

জোরে একটু বাতাস বা বৃষ্টি হলে ঢাকার অনেক এলাকাতেই ইলেকট্রিসিটি থাকে না। কোন কোন এলাকায় ইলেকট্রিসিটি না থাকাই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এত অসংখ্য বার বিদেশে গেছে রানা, কোথাও কখনও কারেন্ট চলে গেছে বলে মনে পড়ে না ওর। শুনেছে, ও-সব দেশে বড় বড় শহরগুলোয় দশ বছরে একবারও কারেন্ট যায় না। দেশটা ঠিকমত চলছে না, ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে ছোট একটা টর্চ বের করে জ্বালল ও। একটা চিন্তার সূত্র ধরে আরও কিছু চিন্তা এল মাথায়। আমি সরকারী চাকুরে। মানুষকে বিপদ আর অসুবিধের মধ্যে ফেলে টাকা আদায় করি, ভয় দেখিয়ে ঘুষ খাই। আমি একজন বিদেশী ডিগ্রীধারী ডাক্তার, প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে দৈনিক পাঁচ হাজার টাকা ফি আদায় করি। আমি একজন

সরকারী আমলা, আমার যা খরচ তাতে বেতনের টাকায় তিনদিনও চলে না, শহরের সেরা এলাকায় পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে একটা বাড়ি বানাচ্ছি। আমি একজন ব্যবসায়ী, বছরে আমার লাভের অঙ্ক কয়েক কোটি টাকা, আল্লাহ আমাকে ভালই রেখেছেন। রানা জানে এরা যদি সত্যি কথা বলে তাহলে এই কথাগুলোই এদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তা তারা বলবে না। না বললেও এই সত্যগুলো মিথ্যে হয়ে যাবে না।

এরা ছাড়া আর একটা দল আছে, সংখ্যায় তারাই ভারী। আমি একজন শিক্ষিত বেকার যুবক, আমার কোন আয় নেই। কিংবা আমি একজন সর্বহারা, দিন মজুর বা ভূমিহীন কৃষক, বছরে আমার আয় মাত্র কয়েকটা টাকা, আর হাত পেতে যতটুকু পাওয়া যায়। আমি একজন কেরানী, যা বেতন পাই তা দিয়ে মায়ের চিকিৎসা করতে পারি না, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে পারি না, পেট ভরে দু'বেলা খেতে পাই না। কথাগুলো কেউ মুখ ফুটে বলুক বা না বলুক, এগুলোও সত্য।

দেশটা গরীব, সেটাও একটা কথা।

আমার রাজনীতি করা উচিত ছিল, ভাবল রানা। ভাল একজন কর্মী হতে পারতাম, হয়তো। কিংবা কে জানে, রাজনীতির যা দশা, লাইসেন্স পারমিটের বদৌলতে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যেতাম, অথবা ব্যর্থ নেতৃত্বের দরুণ গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকতাম রাস্তায়।

দশ মিনিট হেঁটে সাঈদের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে গেল রানা। এদিক ওদিক কোন দিকে তাকাল না ও, গেট দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। তিনতলায় উঠে সাঈদের ফ্ল্যাটে দরজায় নক করল ও। দরজা না খোলা পর্যন্ত ট্রাউজারের পকেটে হাত গলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কবাট সরে গেল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সাঈদ, তার পিছনে আলোকিত প্যাসেজ থাকায় একহারা লম্বা শরীরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথা বলার আগে একবার ঢোক গিলল সে। ভাবল, বন্ধু, নাকি আজরাইল? বলল, 'মাসুদ ভাই, আপনি?'

'তুমিও জানো, কেউ না কেউ আসতই,' হাসিমুখে বলল রানা 'আমাকেই ওরা পাঠাল।'

'আসুন, ভেতরে আসুন,' পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল সাঈদ।

দরজা বন্ধ করে এগোল সাঈদ, তার পিছু পিছু ড্রইংরূমে ঢুকল রানা। ঘরের মাঝখানে থেমে ফিরল রানা, দেখল, দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাঈদ।

'বসুন, মাসুদ ভাই,' নিচু গলায় বলল সাঈদ 'আজ সকালে সোহেল ভাইয়ের সাথে কথা বলার পর ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা চুকে গেছে। ভেবেছিলাম, আমি যে অন্যায়টা করেছি সেটা ভুলে যাওয়া হয়েছে।' ম্লান একটু হেসে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আসলে এত সহজে এসব সারে না, এখন বুঝতে পারছি।'

'বাহ্!' রানার চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাকিয়ে রয়েছে

একটা ক্যালেন্ডারের দিকে। সাঈদের কথা ও যেন শুনতেই পায়নি। এগিয়ে গিয়ে ক্যালেন্ডারের সামনে থামল ও। বিদেশী ক্যালেন্ডার, রঙিন ছবিতে দেখা যাচ্ছে পাকা গম খেতে ছুটোছুটি করছে একদল কিশোর কিশোরী। কাছেই নদী, শ্রমিকরা কাটা গম বস্তায় ভরে কার্গো ভেসেলে তুলছে। মেশিনের সাহায্যে গম কাটার কাজ চলছে আরেক দিকে। 'ওরা ভাগ্যবান, কি বলো? যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের সুযোগ রয়েছে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল সাঈদের।

'ড্রইংরূমটা কিন্তু দারুণ সাজিয়েছ তোমরা!' রানার মুখ থেকে প্রশংসা ঝরে পড়ল। ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছে ও। অয়েলপেইন্টিংগুলো একটাও বাদ দিল না, সব ক'টার সামনে একবার করে থামল।

তবে কি সে ধরে নেবে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে পাঠানো হয়নি মাসুদ ভাইকে, ভাবল সাঈদ। ট্রেনিঙের সময় থেকে জানে সে, মাসুদ ভাই মাটির মানুষ। কখনও কোন কাজে বাধ্য করেনি তাকে। কিন্তু সেই সাথে সে জানে, এটা মুদ্রার মাত্র একটা পিঠ। আরেক পিঠের সাথে তার পরিচয় নেই। তবে শুনেছে। শুনেছে, প্রয়োজনে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে জানে মাসুদ ভাই। ওর যারা জাত শত্রু, নিষ্ঠুরতায় তারা কম যায় না, তবু ওর নাম মনে পড়লে তাদেরও নাকি বুক কাঁপে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রানা, অবাক হেসে বলল, 'আরে, দাঁড়িয়ে কেন, বসো!'

দম দেয়া পুতুলের মত এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসে পড়ল সাঈদ।

'তোমার ওয়াইফকে একটু ডাকো না,' নরম সুরে বলল রানা। 'এক গ্লাস পানি খাই। কি যেন নাম, শায়লা না?'

'ও নেই,' বলে সোফা ছেড়ে উঠল সাঈদ। মাথা নিচু করে ড্রইংরূম থেকে বেরিয়ে গেল সে। একটু পরই ফিরে এল আবার, হাতে পানির গ্লাস।

'নেই মানে? বাইরে কোথাও গেছে বুঝি?' জানতে চাইল রানা। দু'ঢোক পানি খেয়ে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা সোফায় সাঈদের সামনে বসল ও। 'কিন্তু রাত তো কম হয়নি এখনও ফিরছে না কেন?'

'ও আমাকে…ছেড়ে চলে গেছে, মাসুদ ভাই।' কার্পেটের ওপর চোখ রেখে বলল সাঈদ।

'সেকি!' রানা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'কবে? কেন?'

'আজই। একজনকে নাকি ভালবাসে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। আমার কি বিশ্বাস, জানো? একটা মেয়ে তার স্বামীকে ছেড়ে কখন চলে যায়? স্বামী দেবতাটি যখন তার অমর্যাদা করে, যখন তার অহমিকায় আঘাত করে।' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা, কিন্তু সাঈদ কিছু বলল না বা মুখ তুলল না দেখে আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল সে। তারপর মৃদু শব্দে হেসে উঠল। 'নাহয় বউ পালিয়েছে, তাই বলে তুমি এমন মুষড়ে

পড়বে?' এবার মুখ তুলে তাকাল সাঈদ। একটা চোখ মটকে কৌতুক করল রানা। 'তোমাকে যতটুকু চিনি, এতে তো তোমার সুবিধেই হয়েছে। একজনের বদলে হাজার জনকে নিয়ে সময় কাটাবার সুযোগ পেয়ে গেছ। কি, ঠিক বলিনি? কোন ঝুট-ঝামেলা নেই, ভরণপোষণ দেয়ার দরকার নেই, কোন অভিযোগ শুনতে হবে না, একটার পর একটা নতুন নতুন আসবে আর যাবে··· কি মজা, তাই না?'

এতক্ষণে টের পেল সাঈদ, মাসুদ ভাইয়ের কথায় ব্যঙ্গ ঝরছে। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল তার। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করতেই পরম স্বস্তি অনুভব করল সে। উপলব্ধি করল, মাসুদ ভাই যদি কঠোর কোন শাস্তি দিতে আসতেন, তাহলে তাকে তিরস্কার করার পিছনে সময় নষ্ট করতেন না।

'কে?' জানতে চাইল রানা। চেহারা কঠোর হয়ে উঠল ওর।

'জ্বী?' প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে থাকল সাঈদ।

'শায়লা কার সাথে পালিয়েছে?' সরাসরি জানতে চাইল রানা, সোজা তাকিয়ে আছে সাঈদের দিকে।

'লোকটা বিদেশী,' বলল সাঈদ। অস্বস্তি বোধ করলেও রানার চোখ থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। 'নাম, দ্য সিলভা। স্পেনের লোক, খুব স্মার্ট। আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি···'

'ভারি ইন্টারেস্টিং তো,' বলল রানা। 'যে রাতে তুমি সাভারে গেলে, সে-রাতে রঁদেভো ক্লাবে একজন দ্য সিলভা ছিল। নিশ্চয়ই এ সেই দ্য সিলভা?'

'হ্যাঁ।' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল সাঈদের মুখে। 'হেডকোয়ার্টার তাহলে এরই মধ্যে এসব জেনে ফেলেছে?'

'আরও কত আগে, আরও কত কি জেনেছি আমরা, শুনলে তুমি হার্টফেল করবে,' বলল রানা।

চুপ করে থাকল সাঈদ।

'রঁদেভো ক্লাবে সে-রাতে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমরা সন্দেহ করছি, সাঈদ,' শান্ত, নিচু গলায় বলল রানা। 'তোমাকে বুঝতে হবে, তুমি যে বি. সি. আই.-এর লোক, ওদের কেউ সেটা জানত। দেখা যাচ্ছে ঘটনা আরও একটু গড়িয়েছে। শায়লা চলে গেছে দ্য সিলভার কাছে সে রাতে যে রঁদেভোয় ছিল।'

'মাসুদ ভাই, আপনি কি বোঝাতে চাইছেন···?'

'কিছুই বোঝাতে চাইছি না, শুধু ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছি, সাঈদ। আমি আশা করব, তুমি আমার সাথে সহযোগিতা করবে। আশা করব, কিছু না লুকিয়ে সব আমাকে খুলে বলবে তুমি। তোমাকে মনে রাখতে হবে, তোমার যা অবস্থা, আমার সাথে অসহযোগিতা করলে নিজেরই ক্ষতি করবে তুমি।'

'আপনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে নেব, মাসুদ ভাই,' মাথা নিচু করে বলল সাঈদ।

'শাস্তি তোমাকে কেউ দেবে না, সাঈদ তুমি নিজেই সেটা নিজেকে দিচ্ছ,' বলল রানা। 'এই যে অনুশোচনায় ভুগছ, এটাই তো শাস্তি। কিন্তু শাস্তি

পাওয়া না পাওয়াটা বড় কথা নয়। বড় কথা, নিজেকে তুমি শুধরে নিতে পারবে কিনা। তোমার কি যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, যাতে এ-ধরনের ভুল আর না হয়?'

নখ দিয়ে সোফার কিনারা খুঁটতে লাগল সাঈদ। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমি আর কিছুই চাই না, মাসুদ ভাই, শুধু আরেকটা সুযোগ দিন আমাকে। কাজ করার সুযোগ পেলে, কথা দিতে পারি, এ-ধরনের ভুল আমার আর হবে না।'

'ভেরি গুড! তুমি আমাকে বাঁচালে!'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে মুখ তুলল সাঈদ।

'অপমানটা আর কাউকে নয়, আমাকে করেছ তুমি, সাঈদ,' বলল রানা। 'আমার হাতে ট্রেনিং পাওয়া ছেলে তুমি, তুমি একটা অন্যায় করলে সরাসরি সেটা আমার ব্যর্থতা নয়?' এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল রানা, 'প্রায় একই সাথে ট্রেনিং নিয়েছ তোমরা, তুমি আর সেতু। সেতুর চেয়ে অনেক পয়েন্ট বেশি পেয়ে এগিয়ে ছিলে তুমি, এখন ওর চেয়ে কয়েক পয়েন্ট নিচে নেমে এলে। তবে, এরপর যদি সাবধান হও, আর যদি কোন ভুল না করো, সেতু বাদে আর সবার চেয়ে এগিয়ে থাকবে তুমি। তুমি যদি পুরোদস্তুর এজেন্ট হতে পারো, সেটা তো আমারই গর্ব, সাঈদ।'

অনেক কষ্টে চেপে রেখেছিল সাঈদ, এবার আর পারল না। তার চোখে পানি এসে গেল। লুকাবার জন্যে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল সে।

'এই কাজটার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চেপেছে,' বলল রানা। 'কোন কাজ করতে এলে, সেটা আমি শেষ করি। এটাও করব। কোন কাজে খুঁত রাখা আমার স্বভাব নয়, এটাতেও রাখতে চাই না। সেজন্যেই তোমার সহযোগিতা দরকার আমার।'

'আপনি যা জানতে চান…'

'অনেক প্রশ্ন করব আমি, সব হয়তো তোমার পছন্দ হবে না।'

'আপনার কাছে লুকোবার আমার কিছুই নেই, মাসুদ ভাই,' বিশ্বাস করাবার জন্যে ব্যাকুল সুরে বলল সাঈদ।

'রঁদেভো ক্লাবের সদস্য কতজন জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কমপ্লিট একটা লিস্ট জোগাড় করে দিতে পারবে আমাকে?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল সাঈদ, তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, 'সত্তর-পঁচাত্তর জন হবে। নামের একটা তালিকা জোগাড় করা যাবে। চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব জ্যোতি ভাবীর ওপর, তাকে ধরলেই হবে।'

'সে রাতে ক্লাবে যারা ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম জেনেছি,' বলল রানা। 'স্পেনিয়ার্ড দ্য সিলভা ছিল। একজন কানাডিয়ান ছিল, এর নামটা আমার জানা হয়নি। বিদেশীদের মধ্যে আর ছিল একজন অস্ট্রেলিয়ান, রক হার্ডউইক, আর একজন জার্মান, ব্রান হেগেল। বাংলাদেশী পুরুষদের মধ্যে ছিল কায়সার আহমেদ, বিখ্যাত দাবাড়ু। মনির হোসেন, শিল্পপতি। রায়হান চৌধুরী, ফার্স্টক্লাস কন্ট্রাক্টর। মেয়েদের মধ্যে ছিল. শায়লা, মিসেস

জ্যোতি, মিসেস নাসরিন, মিসেস নাফিজা, মিস চেরি—নাম চেরি হলেও এ-ও বাঙালী। বলো দেখি, আর কেউ ছিল কিনা?'

'বোধহয় আর কেউ ছিল না,' বলল সাঈদ। 'আরও দু'একজন হয়তো এসেছিল, তাদের আমি দেখিনি, হয়তো একবার করে ঢুঁ দিয়েই চলে গিয়েছিল।'

'তোমার সম্পর্কে যতটুকু জানি,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'তুমি মেয়েদের সঙ্গ একটু বেশি পছন্দ করো, আর মেয়েরাও তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়। তা, সে-রাতে ওরা যারা ছিল, ওদের মধ্যে কার কার সাথে তোমার বেশ ভাল সম্পর্ক? মানে, আমি জানতে চাইছি, ওদের সবাইকেই কি তুমি নাচিয়ে আসছ?'

মুখের চেহারা লাল হয়ে উঠল সাঈদের। চুপ করে থাকল সে।

'আগেই বলেছি, আমার সব প্রশ্ন তোমার পছন্দ হবে না,' বলল রানা। 'কিন্তু পছন্দ না হলেও, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে জানতে হবে, সাঈদ।' একটু কঠোর শোনাল রানার গলা।

'আমার যারা ঘনিষ্ঠ বান্ধবী তারা সেদিন কেউ আসেনি,' নিচু গলায় বলল সাঈদ।

'ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছ, আমি জানি না,' বলল রানা। 'কিছু মনে কোরো না, আমি বরং আরও সরাসরি প্রশ্ন করি। এদের মধ্যে কার কার সাথে বিছানায় গেছ তুমি?'

মুখ তুলতে পারল না সাঈদ।

'এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, সাঈদ,' কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর বলল রানা।

'যদি ইচ্ছে করি…তাহলে…' নির্লজ্জের মত শোনাবে ভেবে কথাটা উচ্চারণ করতে পারছে না সাঈদ, '…ওদের সবাইকে আমি নিতে পারি…'

'বিছানায়,' সাঈদের কথাটা রানাই শেষ করল। তারপর বলল, 'বিশ্বাস করো, সাঈদ, অন্তত এই একটা বিষয়ে তোমাকে আমি ঈর্ষা করি। এটা একটা মস্ত বড় আর্ট, বুঝলে, এই মেয়ে পটানো। সবাই পারে না।' আবার হঠাৎ করেই প্রসঙ্গে চলে এল রানা, 'কিন্তু আমি তা জানতে চাইনি। কার সাথে পারো সেটা নয়, কার সাথে পেরেছ, সেটা।'

সংক্ষেপে জবাব দিল সাঈদ, 'নাসরিন।'

'ব্যস, এই একজনই?'

এবার বলল সাঈদ, 'চেরি আর নাসরিন।'

'এদের মধ্যে কাকে তোমার বেশি ভাল লাগে?'

'ব্যাপারটা একটু অন্য রকম, মাসুদ ভাই,' খানিক ইতস্তত করে বলল সাঈদ। 'কম বা বেশি, ভাল আমাকে ওদেরই লাগে। ওরাই এসে ধরা দেয়, তারপর আবার সরে যায়। কোন মেয়ের সাথেই আমি কখনও জড়িয়ে পড়ি না।'

'একটু ব্যাখ্যা করবে?'

'মানে, ওদের কারও ওপর আমার ভয়ানক দুর্বলতা আছে, সেরকম কিছু না,' বলল সাঈদ। 'এমন নয় যে ওদেরকে ছাড়া আমার চলে না। আমি বলতে চাইছি, কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে বা অন্যায় সুযোগ নিতে পারে, এমন সুযোগ আমার কাছ থেকে ওরা কেউ পায়নি।'

'তুমি আসলে বলতে চাইছ, ওদের কারও কাছে নিজেকে তুমি বিকিয়ে দাওনি,' বলল রানা। 'কিন্তু ওদেরকে তোমার যে ভাল লাগে, এ-কথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। একটা মেয়ের হয়তো চোখ দুটো তোমার কাছে ভারি সুন্দর, আরেকজনের হাঁটার ভঙ্গি তোমার ভেতর তোলপাড় তোলে। কারও হাত খুব সুন্দর, কারও চুলের স্টাইল দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, আমি জানি, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস। যাকে বলে প্রেম, সেটা শায়লা ছাড়া আর কারও সাথে নেই তোমার। কিন্তু স্ত্রীকে ভালবাসলেও একজন পুরুষমানুষ অন্য মেয়ের দিকে ঝুঁকতে পারে। তোমার বেলায় ঠিক সেটাই ঘটেছে। এটা এমন কিছু কঠিন নয়, চেষ্টা করলেই এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায়।'

সাঈদ চুপ করে থাকল। ভাবল, নিজেকে শোধরাবার একটা সুযোগ পর্যন্ত আমাকে দিল না শায়লা! কোন অভিযোগ না, অভিমান না, প্রতিবাদ না, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত হঠাৎ একটা চিঠি লিখে রেখে চলে গেল। প্রচণ্ড অভিমানে শ্বাস আটকে এল তার।

'এই মেয়েগুলোর কাউকে কখনও কি কোন ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছে তোমার? কখনও মনে হয়েছে, ওই মেয়েটা শত্রুপক্ষের হতে পারে? না, তা হয়নি। হলে, নিজেই সাবধান হতে তুমি। কিন্তু যা ঘটে গেছে, তারপর এখন তোমার কি মনে হয়? ওদের মধ্যে কাকে তুমি সন্দেহ করবে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল সাঈদ, জোর দিয়ে বলল, 'এদের মধ্যে···অসম্ভব, মাসুদ ভাই! ওরা কেউ সে-ধরনের মেয়ে নয়, হতেই পারে না। জ্যোতি ভাবীর কথা ধরুন, মস্ত এক সরকারী আমলার স্ত্রী, বিয়ের যোগ্য দুটো মেয়ে আছে, একটা ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তেমন চালাক-চতুরও তাকে বলা যাবে না—আপনিই বলুন, কি করে এই মহিলাকে স্পাই বলে সন্দেহ করি? স্বীকার করি, পুরুষমানুষ দেখলে বিশেষ করে ছোকরা কাউকে দেখলে তার মাথার ঠিক থাকে না, কিন্তু তাই বলে···' আবার এদিক ওদিক মাথা নাড়তে শুরু করল সাঈদ। 'তারপর ধরুন, নাসরিন। অনেকদিন ওর ধারে কাছে ঘেঁষা সম্ভব হয়নি। আর সবার চেয়ে একটু আলাদা ও। ওর স্বামী বিরাট শিল্পপতি, কোন কিছুরই অভাব নেই, ও কেন ওই ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াবে? তারপর ধরুন চেরি···' ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা গেল সাঈদের।

'চেরির ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'ওকেও সন্দেহ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। মেয়ে স্পাইদের যে-সব জিনিস থাকা দরকার ওর সে-সব কিছুই নেই। ওর শুধু কোমরের নিচেটা···মানে, আকর্ষণীয়, চেহারা মোটেও ভাল না। ওর আরও একটা

জিনিস নেই···মানে, যেটা না থাকলে মেয়েদেরকে ভালই লাগে না।'

হাসি চেপে জানতে চাইল রানা, 'কোন্ জিনিসটা?'

'মানে···ফ্ল্যাট ব্রেস্টেড আর কি।'

'তাহলে তাকে তোমার ভাল লাগে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শুনে মনে হচ্ছে ওর ওপর তোমার আগ্রহ কম নয়।'

'কেন যে ভাল লাগে, বুঝিয়ে বলতে পারব না,' বলল সাঈদ। 'আমি নিজেও ঠিক জানি না। আসলে, মেয়েদের অনেক ব্যাপারই আমি বুঝি না। ওর মধ্যে কিছু একটা আছে যা কাছে টানে, কিন্তু কেন কি জানি, ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

'ওর জন্যে তোমার দুঃখ হয়, আর তাই ওর সাথে এতটা ঘনিষ্ঠতা করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ অনেকটা বোধহয় তাই,' বলল সাঈদ। 'ব্যাপারটা কি গুরুত্বপূর্ণ?'

'তেমন নয়,' সহজ সুরেই বলল রানা। 'আমি আসলে একটা ছবি পেতে চাইছি।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'কোথাও যেয়ো না, সাঈদ। ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত বাড়িতেই থেকো। তোমাকে আবার আমার দরকার হতে পারে, তখন যেন এখানে এসে তোমাকে পাই। দু'একদিনের মধ্যে তোমাকে একটা ফোন করব, কেমন?'

অস্থির দেখাল সাঈদকে, ব্যগ্র একটা ভাব ফুটল চেহারায়। 'মাসুদ ভাই, এই ক্ষতি কি পূরণ করা যাবে? আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবেন আপনি?' একটা ঢোক গিলল সে। 'তালিকায় যাদের নাম ছিল, তেল আবিবে আমাদের হয়ে যারা কাজ করবে, ওদের কথা ভেবে রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। তালিকাটা যদি পাচার হয়ে যায়···'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তাহলে ওদেরকে আমরা হারাব। তবে, যাতে পাচার হবার আগেই ওটা উদ্ধার করা যায়, সে চেষ্টা হচ্ছে। দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। ভাল কথা, সাঈদ, প্রশ্নটা ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জিজ্ঞেস না করেও উপায় নেই—শায়লার ব্যাপারটা নিয়ে কি ভাবছ? কি করতে চাও? তুমি কি তার সাথে দেখা করবে, কিংবা সিলভার সাথে?'

শ্রাগ করল সাঈদ। 'আপনি যা বলবেন তাই হবে, মাসুদ ভাই,' বলল সে। 'আপনাদের অসুবিধে হয় এমন কিছু করতে চাই না আমি···'

'গুড! আমি বলি কি, এখুনি কিছুই তোমার করার দরকার নেই। স্রেফ গ্যাঁট হয়ে ঘরে বসে থাকো। সে রাতে রঁদেভোয় যারা ছিল তাদের সম্পর্কে আমি ইন্টারেস্টেড, তাই বলছি এমন কিছু কোরো না যাতে রসালো একটা কেলেঙ্কারি নিয়ে সবাই একজোট হয়ে মেতে উঠতে পারে। এই ব্যাপারটা মিটে যাক, তারপর তোমার যা খুশি কোরো।'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল সাঈদ। ভাবল, যা হারিয়েছি তা হারিয়েইছি। পরে সে-ব্যাপারে তুমি কি করলে না করলে তাতে কিছু আসে যায় না।

সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল রানা, এবার সিধে হলো ও, তারপর ঝুঁকে পড়ল সাঈদের দিকে। 'এবার সাঈদ, আরও ডিটেলসে যাব আমরা। ভুল

করেও কিছু গোপন রাখবে না, সব বলবে আমাকে। প্রথমে, তোমার বান্ধবীদের সম্পর্কে। তাদের কথা যা জানো সব আমাকে বলো। কে কি পরে, কার কি দুর্বলতা, সমাজে কার কোথায় জায়গা, কিভাবে তারা সময় কাটায়—স-ব। নাসরিনকে দিয়ে শুরু করা যাক, কি বলো? সবচেয়ে আগে বলো...'

নরম সুরে ক্রস এগজামিনেশন শুরু করল রানা।

# সাত

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের জট ছাড়াচ্ছে শায়লা। কাঁধের ওপর দিয়ে নিয়ে এসে ঘন কালো চুলগুলো শরীরের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে, ডগাগুলো নাভি ছুঁই ছুঁই করছে। সেদিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল শায়লার। সাঈদের সাথে বিয়ের সময়ও তার চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমে গিয়ে ঢেকে ফেলত নিতম্ব। তারপর হঠাৎ কি যে হলো, উঠতে শুরু করল চুল। সেই যে শুরু হয়েছে, তারপর আর থামাথামি নেই, রোজই একগাদা করে উঠে যাচ্ছে। নিদ্রাকুসুম থেকে শুরু করে কত রকম তেলই তো ব্যবহার করে দেখল, ঠেকানো যায় না। কতটুকু সত্যি কে জানে, সিলভা তো বলছে স্পেনে নাকি চুল ওঠা বন্ধ করার ভাল ওষুধ আছে, কিছুদিন ব্যবহার করলে শুধু যে চুল ওঠা বন্ধ করে তাই নয়, ওগুলো আরও সুন্দর আর লম্বাও হবে।

মুচকি একটু হাসি ফুটল শায়লার ঠোঁটে। মেয়েদের সাথে আচরণের দিক থেকে সিলভার মত ভদ্রলোক সারা দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। কোন মেয়ে যদি হাতে স্বর্গ চায়, তাও নিয়ে এসে দেবার প্রতিশ্রুতি দেবে সে। শায়লা তাকে আভাসে জানিয়ে দিয়েছে, সাঈদের সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে ডিভোর্স হবার পর ওরা বিয়ে করবে, আর শুধু তখনই ওর কাছে আসতে পারবে সিলভা, তার আগে যেন সিলভার মাথায় কোন রকম বদ মতলব না ঢোকে। কথাটা ঠিকই বুঝেছে সিলভা, সেই থেকে বেচারা ভদ্রোচিত এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। নিজের বেডরূম শায়লাকে ছেড়ে দিয়েছে সে, আশ্রয় নিয়েছে ড্রইংরূমে। ভুলেও কখন শায়লার বেডরূমে ঢোকেনি, আর কথা বলছে পাঁচ হাত দূর থেকে।

চুল ওঠার দুঃখ ভুলে যেতেই নিজেকে খুব সুখী মনে হলো ওর। ভুরু কুঁচকে আয়নায় নিজের চোখে তাকাল ও, জিজ্ঞেস করল সব কিছু এত ভাল লাগার কারণ কি? অনেকটা যেন ভাল লাগার অনুভূতি মন থেকে দূর করার জন্যেই সাঈদকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল ও।

গোটা ব্যাপারটাই সাঈদের জন্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত হয়ে দেখা দেবে। শুধু তাই নয়, একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়বে সে। বিনা মেঘে বজ্রপাত বলে মনে হবে তার। কিন্তু এটা তার পাওনা ছিল। এখন শুধু শায়লা আশা করতে

পারে, শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা সাঈদের জন্যে মঙ্গলই ডেকে আনবে। একটু শিক্ষা হোক। বুঝুক। জানুক, সংসারে সব কিছুরই একটা সীমা আছে, সীমা লংঘন করলে ভুগতে হয়। বয়সই হয়েছে সাঈদের, কিন্তু পরিণত হয়নি—এই ঘটনা তাকে পরিণত হতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। আহা, বেচারা সাঈদ···

সাঈদকে ছেড়ে চলে আসার পর সিলভা তাকে এত কিছু উপহার দিয়েছে, সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যাবে। হালকা নীল ভেলভেটের এই ফ্রকটা আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছিল সিলভা, এই ফ্ল্যাটে শায়লা পা রাখার এক ঘণ্টার মধ্যে দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছে। বিদেশী পোশাক, প্রথমে তো পরতেই চায়নি শায়লা। কিন্তু ওর অনিচ্ছা দেখে সিলভার চেহারা ম্লান হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই পরতে হয়েছে। আজও আবার সেই পোশাকটা পরেছে ও। প্রথমে ভাল না লাগলেও এখন এটা পরে থাকার একটা লোভ পেয়ে বসেছে ওকে। কারণ আর কিছুই নয়, এটা পরলে নিজেকে ওর কিশোরী কিশোরী লাগে, মনে হয় বেড়ে ওঠা শরীরে এইমাত্র আসতে শুরু করেছে যৌবনের জোয়ার। গলার কাছে কালচে লাল রঙের একটা লেসস্কার্ফ, নীলকান্ত মণি বসানো একটা ব্রোচ ধরে আছে সেটাকে।

এই পোশাকের সাথে ঝুলে থাকা চুল বেমানান। জট ছাড়িয়ে মস্ত একটা খোঁপা তৈরি করল শায়লা। খুশি খুশি লাগলেও, মনটাকে মুহূর্তের জন্যেও বাগে আনতে পারছে না ও। সাঈদের কথা মনে পড়ছে, সিলভার কথা ভাবছে, চোখের সামনে ভেসে উঠছে একজোড়া কাঁচা-পাকা ভুরু। খানিক পরপরই যুক্তি দিয়ে গোটা ব্যাপারটা বিচার করতে চেষ্টা করছে ও। সাঈদ তাকে সুখে রাখেনি। কিন্তু ও সুখী হতে চেয়েছে। সেটা কি অন্যায়? সুখী হবার অধিকার তো সবারই আছে। যা কিছু করেছে ও, বা এখনও যা করছে, সব সেই ওই একটা কারণে—নিজেকে সুখী করার জন্যে। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন দেখা যাক কোথায় গিয়ে পড়ে। ঝুঁকি আছে সে-কথা জেনেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। কে জানে, শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে, ওর সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল, লোকসান বৈ লাভ হয়নি কিছু।

আজই প্রথম খোঁপা বাঁধল শায়লা। সিলভা বার বার অনুরোধ করেছে, কিন্তু তার অনুরোধ রাখেনি ও। আজ ওকে খোঁপা বাঁধতে দেখে সিলভা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক খুশি হবে।

আশ্চর্য একটা মানুষ, সন্দেহ নেই। একটা কথা মনে পড়তে চোখ জোড়া সতর্ক হয়ে উঠল ওর। আয়নার দিকে পিছন ফিরে তাকাল টেলিফোনের দিকে। তারপর ত্রস্ত পায়ে চলে এল টেবিলের সামনে। টেলিফোন সেটটা থেকে বেরিয়ে একটা কর্ড দেয়ালে বসানো কাঠের একটা বোর্ডের ভেতর ঢুকে গেছে। টেবিলের সামনে থেকে সরে এল শায়লা, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। এক মিনিট পর আবার ফিরে এল ড্রইংরূমে, হাতে একটা ধারাল ছুরি। অত্যন্ত সাবধানে, সতর্কতার সাথে কর্ডের গা ছিলে ভেতর থেকে তামার তার বের করল ও। তারপর তারটা দু'টুকরো করল। কাজ শেষ করে

টেলিফোনটা পরীক্ষা করল ও। ডেড।

তালায় চাবি ঢোকাবার আওয়াজ পেল শায়লা। দ্রুতহাতে মাঝখানটা ভাঁজ করে হাতলের গায়ে ছুরির পাতটা ঢুকিয়ে দিল ও। তারপর ফ্রকের পকেটে লুকিয়ে ফেলল। একটা বুক শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল, বই-পত্র দেখছে। ঘরে যখন ঢুকল সিলভা, শায়লার হাতে তখন অ্যাস্ট্রোলজির একটা বই, চেহারা উদ্ভাসিত।

ঘরে ঢুকে, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সিলভা। সুদর্শন, চমৎকার স্বাস্থ্য, কিন্তু মুখের চেহারা কেমন যেন ম্লান। পায়ের আওয়াজ পেয়ে সিধে হলো শায়লা। ঘুরল। সিলভার যে মন ভাল নেই, একবার তাকিয়েই বুঝতে পারল ও। শায়লার হাসি খুশি ভাব দেখেও হাসল না সিলভা, অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে, যেন ওর সম্পর্কে নিজের চিন্তা ভাবনাগুলো সঠিক কিনা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে।

'কি হলো তোমার,' মিষ্টি হেসে, কোমল সুরে জানতে চাইল শায়লা, 'মন এত খারাপ কেন?' হাতের বইটা শেলফের ওপর রেখে দিয়ে সিলভার দিকে তাকাল ও, একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কাঁধ ঝাঁকাল সিলভা। সামান্য একটু হাসল, নেহাতই ভদ্রতার খাতিরে, তারপর শায়লাকে পাশ কাটিয়ে ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল দেয়াল আলমিরার সামনে। আলমিরা খুলে ককটেল তৈরি করল সে, হাতে গ্লাস নিয়ে শায়লার দিকে ফিরল। ওর চোখে চোখ রেখে চুমুক দিল গ্লাসে। তারপর বলল, 'বুঝলে শায়লা, মাই ডার্লিং, সব ভাল যার শেষ ভাল। তোমার আমার ব্যাপারটা এত চমৎকার ভাবে শুরু হলো, কিন্তু...' থেমে গিয়ে আবার কাঁধ ঝাঁকাল সিলভা। '...একে যদি প্রেম না বলি, দুনিয়ায় তাহলে প্রেম বলে কিছু আছে কি? তোমাকে দেখেই আমার সব ওলটপালট হয়ে গেল, আমি পাগল হয়ে গেলাম।' ঠোঁটের কোণে কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল, ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল সে, 'হামি টোমায় ডেকলাম আর বহুট খুব ভালবাসিলাম। বাট,' এরপর আবার থেমে থেমে অনেকটা তোতলামির সাথে অনভ্যস্ত ইংরেজীতে বলল, 'গোটা ব্যাপারটাই যে নেহাত একটা ছেলেমানুষি, একটা যাচ্ছেতাই বোকামি, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এমন চমৎকার, ওয়ান্ডারফুল ঘটনা আমার জীবনে আর ঘটেনি, কিন্তু জানি, আমার মন বলছে এর শেষটা হবে খুবই করুণ, দুঃখজনক।'

শায়লার মুখের হাসিটা একটু ম্লান হলো, কিন্তু নিভল না। বলল, 'বুঝতে পারছি, তুমি আসলে চিরকেলে নার্ভাস। দুশ্চিন্তায় ভোগা তোমার স্বভাব। জানি, তুমি আমার স্বামীর কথা ভেবে ভয় পাচ্ছ। কি ভাবছে সে, কি করতে যাচ্ছে।' এগিয়ে এল ও। সিলভার সামনে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত ধরল। বাংলা ছবির একটা সংলাপ দিয়ে শুরু করল ও, 'কেন তুমি একটু শান্ত হতে পারো না, গো? তোমাকে না বলেছি, সাঈদ আর যাই হোক, বোকা নয়। লোক হাসাবার মত কিছু করবে না ও।'

'তোমার কথা যদি সত্যি হত, আমি তাহলে শান্তি পেতাম, সুইট ডার্লিং।

সাঈদ বুদ্ধিমান, সেটা কি সে প্রমাণ করতে পেরেছে? বুদ্ধিমান হলে তোমার মত একটা মেয়ের সাথে এই আচরণ করত সে?'

দ্রুত, প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল শায়লা। সিলভার হাতটা ছেড়ে দিয়ে একটু চিন্তা করল ও, গম্ভীর দেখাল ওকে। তারপর শান্ত সুরে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বুঝতে হবে, সিলভা। সাঈদ আমাকে সব সময়ই অত্যন্ত ভালবেসে এসেছে। মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতা হঠাৎ করে দেখা দেয়, আর সেজন্যে মেয়েরাও কম দায়ী নয়। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে নিজের সাথে যুদ্ধও কম করতে দেখিনি ওকে।' গলার সুর আরও খাদে নামাল শায়লা, 'তোমাকে তো আমি বলেইছি, সাঈদকে আমিও অত্যন্ত ভালবাসতাম। বলেছি, আমাকে পেয়েও তুমি খুব একটা বেশি কিছু পাবে না, পেলেও অনেক দেরিতে পাবে, কারণ সাঈদকে পুরোপুরি ভুলতে সময় লাগবে আমার।'

মাথা ঝাঁকাল সিলভা, যেন বোঝাতে চাইল, এসব সে আগেই বুঝেছে।

'ও মদ খায়, অন্য মেয়েদের সাথে প্রেম করে, বাইরে রাত কাটিয়ে এসে আমাকে মিথ্যে কথা বলে, এসব আমার কাছে অসহ্য ঠেকল, আর ঠিক সেই সময় তুমি এলে, জানতাম তুমি আমাকে ভালবাসো,' ক্ষীণ একটু হাসল শায়লা। 'আমি চলে এলাম। কিন্তু তুমি না এলেও আমি চলে আসতাম। হয়তো আর কারও হাত ধরে, কিংবা একা। কিন্তু সাঈদ আমাকে সুখী করতে পারেনি বলে ওকে আমি বোকা বলতে পারি না। ওর যে সব দুর্বলতা রয়েছে, সে-সব দুর্বলতা তো অনেক গ্রেটম্যানের মধ্যেও আছে, তাই বলে কি তাদের কেউ বোকা বলবে?'

মুখের সামনে গ্লাস তুলল সিলভা। শায়লা লক্ষ করল, তার হাত একটু একটু কাঁপছে।

বড় করে একটা চুমুক দিল সিলভা। বলল, 'ভয় আমার সাঈদের কথা ভেবে নয়। সে আমার কি করতে পারে! আসলে, জীবনের প্রতি আমার ঘেন্না জন্মে গেছে, শায়লা। ভেবেছিলাম দেশের মেয়ে আমার সাথে বেঈমানী করলেও বিদেশী শায়লাকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারব। ভেবেছিলাম, আমি একটা সম্পদ পেয়ে গেছি, যা দেখে সবাই ঈর্ষায় জ্বলবে। এই দেশে যে মিশন দিয়ে এসেছি সেটা ব্যর্থ হতে পারে, এ-কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি আমি।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'ভেবেছিলাম, এখানে কিছুদিন কাটিয়ে দেশে ফিরে যাব, সাথে থাকবে আমার স্ত্রী, তুমি, মিসেস সিলভা। যতবার এ-কথা মনে হয়েছে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি আমি। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রসঙ্গটা আপাতত এড়িয়ে গেল সিলভা। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর জানতে চাইল, 'আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা ঠিক কখন, কিভাবে তুমি নিলে বলো তো, শায়লা?'

এগিয়ে গিয়ে সিলভার পাশে, একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল শায়লা। ওর দিকে তাকাল সিলভা। ছোট্ট একটা বাক্য উচ্চারণ করল সে, 'কৌতূহল, আর কিছু না।'

সলজ্জ একটু হাসি দেখা গেল শায়লার ঠোঁটে। 'আসল কৃতিত্ব চেরির। একদিন ওর সাথে গল্প করছিলাম। তোমাকে বলা হয়নি, ওকে কিন্তু আমার সাংঘাতিক ভাল লাগে। নাফিজা আমার ছোটবেলার বন্ধু কিন্তু রঁদেভোয় নাম লেখাবার পর চেরির সাথেই বেশি ঘনিষ্ঠতা হলো আমার। চেরি আমাকে এত ভালবাসে যে কি বলব। আমিও ওকে খুব ভালবাসি।'

'বেশ, তারপর?'

'আমার ব্যাপারটা নিয়েই খুব মনমরা হয়ে থাকত চেরি,' বলল শায়লা। 'সাঈদ বেশি বেশি মদ খায়, অন্য মেয়েদের সাথে আপত্তিকর ভাবে মেলামেশা করে। এসব চেরি জানতে পারে ওরই বান্ধবীদের কাছ থেকে, তারাই সাঈদকে নিয়ে মাতামাতি করছিল। চেরি এসব একদম পছন্দ করতে পারেনি।'

শায়লার হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল সিলভা, তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল।

'শুনছি।'

'সেদিন গল্প করার সময় অনেক সাহস করে কথাগুলো আমাকে জানাল চেরি,' বলল শায়লা। 'এতদিন জানায়নি তার কারণ ওর ভয় ছিল আমি হয়তো ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নেব। এরপর কিভাবে জানি, তোমার নামটা উঠল। চেরি বলল, তুমি নাকি আমার জন্যে একেবারে পাগল। শুধু আমি বিবাহিতা বলে, তা না হলে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসতে। চেরি বলল, তুমি নাকি তাকে বলেছ, আমি তোমার স্ত্রী হলে তোমাকে আমার যত সামান্যই দিতাম, তুমি নাকি তাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে।'

'একটুও বাড়িয়ে বলিনি,' হাসল সিলভা। 'তুমি আমার, এই অনুভূতিটাই আমাকে সুখী করার জন্যে যথেষ্ট, শায়লা। দেখছ না, তোমাকে শুধু ধরেই এনেছি, কিন্তু অনুমতি পাইনি বলে...'

'তুমি মহৎ, সিলভা। এমন সংযমী পুরুষ আমি জীবনে দেখিনি।'

'আচ্ছা, তারপর?'

কাঁধ ঝাঁকাল শায়লা। 'তারপর আর কি। সাঈদকে ছেড়ে কোথাও চলে যাবার কথা আগে থেকেই ভাবছিলাম। কিন্তু চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তুমি আমাকে ভালবাস জানার পর, আর কোন ইতস্তত ভাব আমার থাকল না। ভেবে দেখলাম তোমাকে হয়তো রাতারাতি আমি ভালবাসতে পারব না, কিন্তু তুমি যদি আমার অমর্যাদা না করো একদিন ঠিকই আমি আমার সব দিয়ে তোমাকে ভালবাসতে পারব। এরপর কথা হলো তোমার সাথে।' হেসে উঠল শায়লা। 'তারপর থেকে এখানে রয়েছি আমরা।'

জানালার বাইরে, অনেক দূরে তাকিয়ে আছে সিলভা। ফোঁস করে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'কথাটা কিভাবে বলব, বুঝতে পারছি না.

শায়লা। তোমাকে আমি কতটা ভালবেসেছি, বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আমার বরাতটাই এমন, প্রেম-ভালবাসা যেন সয় না।'

'এ-কথা কেন বলছ?' উদ্বিগ্ন দেখাল শায়লাকে।

নিচের ঠোঁট কামড়ে কি যেন চিন্তা করল সিলভা। তারপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'এ-দেশে আমার মিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, শায়লা। তোমাকে তো বলেছি, স্পেন সরকারের কয়েকটা বাণিজ্য প্রস্তাব নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করার জন্যে এখানে এসেছি আমি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'পরে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী এসে চুক্তিতে সই করতেন। কিন্তু তোমাদের সরকার এমন উদ্ভট সব শর্ত দিচ্ছে, কোন চুক্তিই সম্ভব নয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তোমাদের বাজার দখল করে রেখেছে, আমরা তাদের চেয়ে অনেক ভাল মানের পণ্য যোগান দিয়ে সেই বাজারের কিছুটা পেতে চাই, তোমাদের সরকার যদি সাহায্য করে তবেই তা সম্ভব হবে। কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যারা আছে, তারা সহযোগিতা করতে রাজি হচ্ছে না। আমরা কিছু সুযোগ-সুবিধে চেয়েছিলাম, কিন্তু জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তা দেয়া সম্ভব নয়। আর কোন আলোচনাতে বসতেও তারা রাজি নয়।'

'বেশ, নাহয় চুক্তি হলো না,' বলল শায়লা। 'কিন্তু তোমার-আমার ব্যাপারটার সাথে এসবের সম্পর্ক কি?'

'তোমাকে আমি এখনও পাইনি, শায়লা,' বলল সিলভা। 'পেতে হলে আরও সময়ের দরকার। সাঈদকে তুমি ডিভোর্স করবে, রাতারাতি সেটা সম্ভব নয়। ওকে তুমি ডিভোর্স করার পর না তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারব! আমার ইচ্ছে ছিল স্ত্রী হিসেবেই তোমাকে আমি স্পেনে নিয়ে যাব। এখন তা আর সম্ভব নয়।'

শায়লার হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেল। শক্ত হয়ে উঠল ওর শরীর। 'সিলভা!'

তিক্ত সুরে সিলভা বলল, 'কথাটা সত্যি, শায়লা। তোমাদের সরকার আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, তারা আর আলোচনায় বসতে রাজি নয়। বলেছে, এ-দেশে আমার আর সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। চার-পাঁচদিনের মধ্যে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাকে। এখন…বলো, কি করব আমরা?'

আতঙ্কিত দেখাল শায়লাকে। 'সিলভা…সিলভা, আমার তাহলে কি হবে?'

'সেটা ভেবেই তো দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়ছি আমি, শায়লা,' বলল সিলভা। 'আমার কথা ভাবি না। আমি শুধু তোমার কথা ভাবছি।'

'আমি কি তোমার সাথে…স্পেনে যেতে পারি না?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল শায়লা। 'আমি কি…?'

'কিভাবে!' অসহায় দেখাল সিলভাকে। 'সাঈদকে তোমার ডিভোর্স দিতে হবে না? এখনও তার স্ত্রী তুমি, আমার সাথে কি হিসেবে যাবে? কেউ এত তাড়াতাড়ি যেতেই বা দেবে কেন? তাছাড়া, তোমার তো পাসপোর্টও

নেই। ঘুষ টুস দিয়ে এই ক'দিনের মধ্যে যদি পাসপোর্ট তৈরি করা যায়ও ভিসা পাবে কোত্থেকে? ওহ্ গড, চোখে আমি অন্ধকার দেখছি।'

তীক্ষ্ণ চোখে সিলভাকে লক্ষ করল শায়লা। জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে সিলভা, চেহারায় বিষাদ। 'কোন উপায়ই কি নেই, সিলভা?' ব্যাকুল সুরে জানতে চাইল শায়লা।

'জানি না, শায়লা, আমি জানি না। টাকা—সেটা কোন সমস্যা নয়। তোমার যত লাগতে পারে তারচেয়ে অনেক বেশি টাকা তোমাকে দিয়ে যেতে পারি আমি, সত্যি, যত তুমি চাও। কিন্তু টাকা যদি সব সমস্যার সমাধান দিতে পারত তাহলে তো হতই। স্পেনে আমাকে ফিরে যেতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কারণ, মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে কাজ বুঝে নিয়ে আবার অন্য কোন দেশে মিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোই আমার পেশা, কিন্তু কোথায় যাব না যাব সেটা অন্যের ইচ্ছেয় ঠিক হয়। তাই আবার আমি কবে তোমার সাথে দেখা করতে পারব, আদৌ পারব কিনা, কিছুই বলতে পারছি না।'

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নামল। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। এক সময় সিলভার পাশ থেকে নিঃশব্দে সরে এল শায়লা, ঘরের মাঝখানে এসে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল। খানিক পর সিলভাও জানালার কাছ থেকে সরে এল। এগিয়ে এসে নিঃশব্দে শায়লার সামনাসামনি একটা সোফায় বসল সে। আরও কিছুটা সময় পেরোল। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল শায়লা,' 'শোনো, আজ রাতে আমাদের কারও মনই ভাল নেই—দু'জনেরই কি যেন হয়েছে। কাজেই আজ আর কোন আলোচনা নয়। একটা সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে, কিন্তু এখুনি বা আজ নয় সেটা। আজ চলো বরং সময়টা কোথাও গিয়ে উপভোগ করার চেষ্টা করি। কোন ভাল রেস্তোরাঁয় যাই চলো, যেখানে খাওয়াদাওয়ার পর একটু নাচা যাবে, তারপর জুয়েলারীর দোকানে যাব, তোমাকে একটা আঙটি প্রেজেন্ট করব আমি—এবং সারাক্ষণ দু'জনে ভান করব, আমরা সুখী, আমাদের কোন সমস্যা নেই। কি, আইডিয়াটা পছন্দ হয়?'

'তুমি খুব আশ্চর্য মেয়ে, শায়লা,' বলে হাসল সিলভা, সোফা থেকে নেমে কার্পেটে, শায়লার একেবারে পায়ের কাছে বসে পড়ল। 'তুমি ভাল, তুমি সুন্দর। যে-কোন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে এমন চমৎকার ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারো···সেজন্যেই জীবনে কখনও অসুখী হবে না তুমি। ঠিক আছে, তোমার কথাই থাক, চলো বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু, কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?'

'গেলে সোনারগাঁয়েই।'

'তাহলে ফোন করে একটা টেবিল রিজার্ভ করে ফেলো,' অনুরোধ করল সিলভা।

'হ্যাঁ,' বলে সোফা ছাড়ল শায়লা। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ও, ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল। বলল, 'ইচ্ছে হলে আরেকটু ককটেল বানিয়ে খেতে পারো তুমি। আমি দেখতে চাই, আমার দিকে তাকিয়ে হাসছ তুমি।

যাই ঘটুক, দুনিয়াটা শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কে জানে, এত সমস্যা আর বিপদের পরপরই হয়তো অদ্ভুত সুন্দর একটা সময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

'তোমার তুলনা হয় না, শায়লা,' বলে কার্পেট থেকে উঠল সিলভা, আলমিরার সামনে দাঁড়িয়ে আবার ককটেল বানাল।

শায়লা বলল, 'টেলিফোনের কিছু একটা হয়েছে। ডায়াল টোনই পাচ্ছি না।'

শায়লার পাশে চলে এল সিলভা। 'কই, দেখতে দাও।' শায়লার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে তুলল সে। তারপর বলল, 'ডেড।'

'কিছু এসে যায় না,' আশ্বস্ত করল শায়লা। 'নিচের তলায় ফোন আছে...'

'কিন্তু ওরা তোমাকে চেনে না,' বলল সিলভা। 'নিজের পরিচয় কি দেবে?'

'যদি বলি, আমি মিসেস সিলভা, ওরা কি তাহলে কাবিননামা দেখতে চাইবে?' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল শায়লা। হাসি থামতে বলল, 'ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি ম্যানেজ করে নেব। তুমি গ্লাসটা শেষ করো, আমি এই এলাম বলে।'

নিচের তলায় নেমে এসে ফ্রকের পকেট থেকে চাবি বের করল শায়লা। তালা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকল ও। কেউ নেই ভেতরে। টেলিফোনটা ড্রইংরুমে। রিসিভার তুলে একটা নাম্বারে ডায়াল করল ও। অপর প্রান্তে রিঙ হলো, তারপর রিসিভার তুলল কেউ।

'আমি গুলশানের সি ব্লক, তেরো বাই বারো নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে বলছি,' বলল শায়লা। 'ফ্ল্যাট নম্বর চার। এটা মি. দ্য সিলভার ফ্ল্যাট। উনি একজন কূটনীতিক, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে এসেছেন। তাঁর টেলিফোন নষ্ট হয়ে রয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা মেরামত হওয়া দরকার।'

জবাব এল, 'ঠিক আছে, ম্যাডাম। অভিযোগ এন্ট্রিবুকে লিখে রাখলাম। কাল সকালে আমাদের লোক পৌঁছে যাবে।'

রিসিভার রেখে দিল শায়লা। মেয়েলি কৌতূহল দমন করতে পারল না, ফ্ল্যাটের আর কোথাও নয়, একবার শুধু ঢুঁ মারল রান্নাঘরে। তৈজসপত্র সবই সাজানো গোছানো রয়েছে, এমনকি একটা ব্যাগের ভেতর থেকে কিছু সবুজ তরি-তরকারিও উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু রান্নাবান্না করার জন্যে নেই কেউ।

নিজের রান্নাঘরের কথা মনে পড়ে গেল শায়লার।

আবার ড্রইংরুমে ফিরে এল ও। রিসিভার তুলে ডায়াল করল হোটেলে।

রাস্তায় আলো নেই। সেটা কি বৃষ্টি হয়েছে বলে, নাকি বি. সি. আই. কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশে আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে?—ভাবল সেতু ইঞ্জিনিয়ার।

রাস্তার ওপারে সাঈদের ফ্ল্যাট বাড়ি। পাশাপাশি এরকম কয়েকটা বাড়ি রয়েছে। রাস্তার এপারেও তাই। সাঈদের ফ্ল্যাট বাড়ির নম্বর এগারো। তার ঠিক উল্টোদিকেরটা বাইশ। বাইশ নম্বরের পাশেই তেইশ নম্বর, সেটার গেটের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেতু। অন্ধকারে একা। দেয়ালে হেলান দিল সে, ইচ্ছে হলো একটা সিগারেট ধরায়। ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মেরে মাসুদ ভাইয়ের কথা ভাবতে শুরু করল সে।

ট্রেনিঙের সময় থেকে জানে সেতু, বি.সি.আই.-এর সেরা এজেন্ট বলতে মাসুদ ভাইকে বোঝায়। শুনেছে, আর সব এজেন্ট যারা আছে তারাও কেউ কারও চেয়ে কম নয়, তাদের সাথে মাসুদ ভাইয়ের গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্কও রয়েছে, কিন্তু তবু কোথায় যেন পার্থক্য রয়েছে কী একটা। একটু যেন অন্য চোখে দেখে সবাই মাসুদ রানাকে। চীফও নাকি অনেকখানি নির্ভর করেন ওঁর ওপর।

প্রথম প্রথম এর কারণটা পরিষ্কার বুঝত না সেতু। সৎ গুণ বলতে যা বোঝায় তা আর সব এজেন্টেদের মধ্যে কারও চেয়ে কোন অংশে কম নেই। যোগ্যতার প্রশ্নেও সেই একই কথা, কেউ কারও চেয়ে কম যায় না—যোগ্যতা আছে বলেই তো তারা এক একজন পুরোদস্তুর এজেন্ট হতে পেরেছে।

তারপর, সূক্ষ্ম হলেও; একটু একটু করে ব্যাপারগুলো পরিষ্কার হতে শুরু করল সেতুর কাছে। দেখল, মাসুদ ভাইয়ের রিফ্লেক্স অ্যাকশনের তুলনা শুধুমাত্র বিদ্যুতের সাথেই করা যেতে পারে। আবিষ্কার করল, মাসুদ ভাইয়ের স্মরণশক্তি কমপিউটারকেও মাঝে মধ্যে হার মানায়। তারপর ওঁর বুদ্ধির পরিচয় পেল সে। যে-কোন সমস্যার কথা একবার শুনেই সম্ভাব্য সমাধানগুলো পরিষ্কার বলে দিতে পারে। ওর চিন্তা শক্তির গতি এত বেশি, আধ ঘণ্টার ব্রেন-ওয়র্ক বারো থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে সেরে ফেলে। এরকম আরও অনেক অসাধারণ গুণ রয়েছে মাসুদ ভাইয়ের। কিন্তু এগুলোও আসল কারণ নয়।

অ্যাকশনে মাসুদ ভাইকে দেখার সুযোগ হয়নি সেতুর। তবে শুনেছে। সাহস না থাকলে এ-লাইনে কেউ আসে না, বা এলেও টিকতে পারে না। কিন্তু মাসুদ ভাইয়ের সাহস নাকি সীমা ছাড়া। সেনাবাহিনীর পুরো একটা ব্যাটেলিয়ন যেখানে সামনে এগোতে ভয় পায়, মাসুদ ভাই নাকি দিব্যি হাসতে হাসতে সে পথে এগোবার দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। সেজন্যেই অসম্ভব সব অ্যাসাইনমেন্টগুলোই শুধু মাসুদ ভাইকে দেয়া হয়। সেগুলো বেশিরভাগই এমন সব অ্যাসাইনমেন্ট, যাতে সফল হতে হলে চাই অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অসম্ভব ঝুঁকি নেয়ার সাহস। যে-সব অ্যাসাইনমেন্ট থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব, সেগুলোই নাকি মাসুদ ভাই বেশি পছন্দ করেন।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে সেতু। সেটা হলো বিনয়। নিজেকে অসাধারণ বুদ্ধিমান বা ভয়ঙ্কর সাহসী বলে কখনোই মনে করেন না মাসুদ ভাই। বলেন, এসবই চেষ্টা আর চর্চার ফল। যদি লেগে থাকো, তোমরা পারবে। কেউ যদি বেশি প্রশংসা করে, মাসুদ ভাই অসন্তুষ্ট হন। বন্ধুদের

তিনি প্রায়ই বলেন, প্রশংসা করে তোরা যদি আমাকে অতিমানব বানিয়ে দিস, তোদের দলে আমার আর ঠাঁই হবে না। সেটা আমার জন্যে একটা অভিশাপ হবে। আমি তো তোদের সাথে, তোদের একজন হয়েই থাকতে চাই। এ প্রসঙ্গ উঠলেই কবিগুরুর একটা কবিতা আবৃত্তি করেন মাসুদ ভাই।

রাস্তার মোড়ে একজন লোককে দেখা গেল। নির্জন রাস্তা, মাঝখান দিয়ে এদিকেই হেঁটে আসছে। লোকটার হাতের টর্চ জ্বলে উঠল, মাত্র দু'সেকেন্ডের জন্যে। টর্চের আলো এমন ভাবে পড়ল, লোকটার ট্রাউজার আর জুতোর খানিকটা দেখা গেল। চিনতে পারল সেতু মাসুদ ভাই।

শান্ত কিন্তু দৃঢ় পায়ে হাঁটছে রানা। কোন দিকে তাকাল না, গেট পেরিয়ে এগারো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকল।

রানা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও এগারো নম্বর বাড়ির অন্ধকার গেটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সেতু। কেউ বেরিয়ে আসবে, তারই অপেক্ষা রয়েছে সে। মাসুদ ভাই যেমন ভেবেছেন, প্রতিপক্ষ যদি সাঈদের ওপর নজর রাখে, ফ্ল্যাট বাড়ির ভেতর থেকেই রাখবে। সরাসরি সাঈদের ফ্ল্যাটের ওপর চোখ রাখবে তারা, যাতে দেখতে পায় কে গেল, কে এল। তারপর কেউ বেরিয়ে এলে তাকে অনুসরণ করবে।

তিন কি চার মিনিট পেরিয়েছে, এই সময় এগারো নম্বর বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। চেহারা দেখা গেল না, কিন্তু তারার আলোয় আকৃতিটা বোঝা গেল। মাসুদ ভাই নয়। লোকটা একটু বেঁটেই বলা চলে, মোটাসোটা।

রাস্তা পেরোচ্ছে লোকটা। সরাসরি বাইশ নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। তেইশ নম্বর বাড়ির গেটে শরীরটা লুকিয়ে রেখে একটু মাথা বের করল সেতু, উঁকি দিয়ে দেখল, বাইশ নম্বরের গেটের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। মুচকি একটু হাসি ফুটল সেতুর মুখে। বাইশ নম্বরের অন্ধকার গেটে আরও একজন লোক গা ঢাকা দিয়ে আছে।

বেঁটে, মোটাসোটা লোকটার কথা ভাবতে লাগল সেতু। সন্দেহ নেই, হেদায়েত খানের লোক ব্যাটা। যেই হও বাবা তুমি, তোমার কপালে আজ খারাবি আছে। জানো না তো কার পাল্লায় পড়েছ!

লোকটা বাইশ নম্বরের গেটে ঢোকার পর বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। দেখা গেল, এগারো নম্বরের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে রানা। ফুটপাথের কিনারায় থামল ও। একটা সিগারেট ধরাল। আসলে এটা একটা সঙ্কেত, নিজের পরিচয় জানাল ওদেরকে। তারপর ডানদিকে ঘুরল ও, হাঁটা ধরল।

উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে সেতু। দেখল, বাইশ নম্বরের গেট থেকে বেরিয়ে এল বেঁটে, মোটাসোটা ছায়ামূর্তি। বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে রানাকে অনুসরণ করছে সে।

কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। এবার ওই বাইশ নম্বরের গেট থেকেই বেরিয়ে এল আরও একজন লোক। চেহারা দেখার উপায় নেই অন্ধকারে, তবে বোঝা গেল খুবই রোগা-পাতলা, ছোটখাট আকৃতির লোক।

রানাকে মোটাসোটা, মোটাসোটাকে রোগা-পাতলা, সবশেষে রোগা-পাতলাকে অনুসরণ শুরু করল সেতু। হাসি পাচ্ছে তার, ব্যাপারটা তার কাছে মিছিলের মত লাগল।

কিভাবে পিছু নিতে হয়, মোটাসোটা তা জানে। রাস্তায় আলো না থাকায়, আরও সুবিধে হয়েছে তার। প্রথম দিকে বেশ খানিকটা পিছনে থাকলেও, পরে রানার একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে সে। তার চলায় কোন শব্দ নেই, বিড়ালও যেন হার মানবে। কিন্তু তাকে যে অনুসরণ করছে, সেই রোগা-পাতলার কাছে হার মানতে হবে তার। এই রোগা-পাতলা লোকটা এমন ভাবে হাঁটছে, যেন তার কোন অস্তিত্বই নেই।

মোটাসোটার নিজের কাজে খুব মনোযোগ। পিছনে কাউকে আশা করছে না সে, তাই সেদিকে একবার ভুলেও তাকাল না।

এভাবে পাঁচ মিনিট কেটে গেল। কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটছে রানা। এবার হাঁটার গতি একটু বাড়িয়ে দিল ও।

সামনে একটা সরু গলি।

রানার কাছ থেকে আট দশ হাত পিছনে ছিল মোটাসোটা, বাঁক নিয়ে সরু গলিতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সে। গলির অপর মাথায় একটা লাইটপোস্ট রয়েছে, একটা বালব জ্বলছে তাতে। নির্জন গলি, একটা ডাস্টবিন ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার শিকার যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ডান দিকে একটা বাড়ির গেট, খোলা, ভেতরে অন্ধকার উঠান। পকেটে হাত ভরে সেদিকে এগোতে যাবে লোকটা, পিঠে শক্ত কি যেন ঠেকল। 'নড়েচ কি মরেচ!'

পাথর হয়ে গেল লোকটা। অন্ধকার উঠান থেকে একটা টর্চ জ্বলে উঠল।

পিছন ফিরে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল লোকটা। গিলটি মিয়া দেখল, লোকটার চেহারায় এক ফোঁটা ভয়-ডর নেই, যেন কিছুই বোঝেনি। শান্ত সুরে জানতে চাইল সে, 'কি ব্যাপার? কে আপনি?'

'তোমার বাপ,' ফিসফিস করে বলল গিলটি মিয়া। 'চোদ্দ ঘাটের পানি খেয়ে এয়েচো, বুজতেই পারচি।'

'গিলটি মিয়া,' উঠানে দাঁড়িয়ে টর্চের পিছন থেকে বলল রানা, 'নিয়ে এসো ওকে।'

'হঠ হঠ,' হাতের পিস্তলটা দিয়ে লোকটার পিঠে খোঁচা মারল গিলটি মিয়া, গরু খেদাবার মত করে গেটের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে। গেট পেরিয়ে উঠানে ঢুকল ওরা। পিছনে গেট বন্ধ হবার আওয়াজ শুনল গিলটি মিয়া, কিন্তু সেদিকে তাকাল না।

উঠান থেকে বারান্দায় উঠে পড়ল রানা। দেয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ডটা পেয়ে গেল। বারান্দার আলোটা জ্বালল ও। বাড়ির পাঁচিল খুব উঁচু, বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায় না। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালা খুলল রানা। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই

কোথাও ভুল করছেন।'

বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। বলল, 'অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ভুলটা তোমাকেই ভাঙাতে হবে।'

পিঠে আবার খোঁচা খেল লোকটা। বারান্দায় উঠে এল সে। গিলটি মিয়া তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পিছু পিছু রানা। ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ও।

দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, ঘরে আর কিছু নেই। ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়েছে লোকটা। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে, মুখটা গোলগাল, চোখে একটু ঢুলু ঢুলু ভাব। শার্ট, ট্রাউজার, জুতো—সবই দামী। শার্টের ওপর একটা জ্যাকেট পরে আছে।

গিলটি মিয়ার হাত থেকে ল্যুগারটা নিল রানা। বলল, 'সাঈদের বাড়ির ওপর চোখ রাখতে হবে। আরও কাজ আছে তোমার, আমিই যোগাযোগ করব।'

'চেহারাটা দেক্‌চেন, স্যার? এক্ষুনি মার পেট থেকে পড়লো!'

হেসে উঠল রানা, বলল, 'তারমানে বলতে চাইছ, সেয়ানা লোক।'

'গায়ে হুঁকোর পানি আর বিছুটি পাতা ঘষে দিলে বাপ বাপ করে কতা বলবে, স্যার।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গিলটি মিয়া, প্রায় সাথে সাথে ভেতরে ঢুকল সেতু ইঞ্জিনিয়ার।

'এদিকটা আমি একাই সামলাতে পারব, সেতু,' বলল রানা। 'তুমি বরং তোমার কাজের জন্যে তৈরি হও।'

'ঠিক আছে। কখন, মাসুদ ভাই?'

'পনেরো মিনিট পর। তার বেশি লাগবে না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সেতু।

ল্যুগারটা রানার হাতে, তবে লোকটার দিকে তাক করে ধরা নয়। পিছু হটে দরজার কাছে চলে এল ও, দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর এগিয়ে এসে লোকটার তিন হাতের মধ্যে থামল। 'দাঁড়াও!'

'ব্যাপারটা কি, আমাকে বলবেন?' সটান উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'আমাকে আপনারা চেনেন না, আমিও আপনাদের চিনি না। ব্যাপারটা ছিনতাইয়ের ঘটনা বলেও মনে হচ্ছে না...'

এগিয়ে গিয়ে লোকটার পকেটগুলোর ওপর চাপড়াল রানা। ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা পয়েন্ট থারটি-এইট অটোমেটিক পিস্তল বের করে আনল ও। নিজের পকেটে ভরল সেটা, লোকটাকে আবার চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল।

'তোমার কিছু বুঝতে বাকি নেই, আমারও না,' বলল রানা। 'আশা করেছিলে, কোন ঝামেলা ছাড়াই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারবে, তাই না?'

কিছু বলতে গিয়েও বলল না লোকটা।

'তোমার বস্ ধরে নিয়েছিল, তালিকাটা চুরি হয়ে গেছে জানার পর কেউ একজন সাঈদের সাথে দেখা করতে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন।' লোকটার দিকে করুণার চোখে তাকাল রানা। 'কি জানো, আমার ধারণা, কেউ তোমাকে বোকা বানিয়েছে। তুমি আসলে বলির পাঁঠা।'

লোকটার চেহারায় আতঙ্ক বা হতাশা, কিছুই ফুটল না। চোখে পলক নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। হাসির একটু আভাস, ধরা যায় কি যায় না, লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। 'তারপর?' জানতে চাইল সে। 'এখন তাহলে কি হবে?'

দ্বিতীয় চেয়ারটা টেনে সামনে নিয়ে এল রানা, হাত দিয়ে খানিকটা ধুলো ঝাড়ল, তারপর বসল হাতলের ওপর। বসে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ—মাপছে, বুঝতে চেষ্টা করছে কতটা গভীর জলের মাছ। তারপর একসময় কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'দেখো, কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তুমি বোধহয় কোন তথ্য দিতে চাও না, তাই না?'

'ইউ ক্যান গো টু হেল,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল লোকটা।

'তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি জানি,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'তাই তোমার নামটা পর্যন্ত জানার ইচ্ছে নেই আমার। তবে নিজের ভবিষ্যৎ তুমি বদলাতেও পারো। ভেবে দেখো। সব কথা যদি বলো, কিছুটা ভাল হবে তোমার। টরচারের হাত থেকে রেহাই পাবে। যদিও যাবজ্জীবন এড়াতে পারবে না। এখন বলো দেখি, কার হুকুমে সাঈদের ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখছিলে? কার কাজ করছ?'

লোকটা সরাসরি তার সামনের দেয়ালে তাকিয়ে থাকল। যেন রানার কথা শুনতেই পায়নি।

'কথা বলবে না তাহলে?'

দেয়ালের দিকে সেই একই ভাবে তাকিয়ে থাকল লোকটা। রানার মনে হলো, তার মুখের ভেতর জিভটা নড়াচড়া করছে। ওপরের ঠোঁটের একটা কোণ ফুলে মত উঠল বার কয়েক।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল রানা। লোকটাকে বাধা দেয়ার কোন ইচ্ছে হলো না ওর। হাতে ল্যুগার নিয়ে নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে থাকল।

একটা ঢোক গিলল লোকটা। তারপর আরেকটা। দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার রানার দিকে তাকাল। 'আমার ভবিষ্যৎ আমার হাতে, তুমি শালা কিছুই জানো না!'

রানা কিছু বলল না।

চেয়ারে হেলান দিল লোকটা, অনেকটা হঠাৎ নেতিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে। চোখ দুটো খোলা রয়েছে, মুখে ব্যঙ্গ ভরা হাসি, যেন বলতে চাইছে, 'কেমন জব্দ, আমার সাথে পারোনি!'

রানার চেহারায় কোন ভাব নেই। শুধু তাকিয়ে থাকল ও। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল লোকটার। একটা হাত দিয়ে পেট খামচে ধরল। হাত-পা টান

টান করল একবার, মনে হলো প্রচণ্ড একটা খিঁচুনি উঠবে। কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই মাথাটা একপাশে কাত হয়ে গেল তার। স্থির হয়ে গেল শরীর।

চেয়ারের হাতল থেকে নামল রানা। এগিয়ে গিয়ে লোকটার পালস দেখল। নেই।

ল্যুগারটা পকেটে ভরল রানা। লোকটাকে চেয়ার থেকে নামিয়ে মেঝেতে শোয়াল। তার ট্রাউজারের পকেটে যা ছিল, সব বের করল ও। চাবির একটা রিঙ, ছোট একটা পেন্সিল আর মানিব্যাগ পাওয়া গেল। সব মিলিয়ে তিনশো বত্রিশ টাকা রয়েছে মানিব্যাগে, ভেতরে আর কিছু নেই। জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে বেরুল একটা এনভেলাপ।

এনভেলাপটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। গায়ে কোথাও কিছু লেখা নেই, তবে ভেতরে একটা ধবধবে সাদা নোট পেপার রয়েছে। কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলল ও। ইংরেজীতে লেখা একটি চিঠি। কিন্তু সম্বোধন করা হয়েছে স্প্যানিশ শব্দ ব্যবহার করে। সিনর অমুক বা তমুককে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে চিঠিটা, কিন্তু শুধু সিনর টুকু আছে, নামটা নেই, মুছে ফেলা হয়েছে। আলোর সামনে ধরে আরও ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। আর কোন সন্দেহ নেই। রবার দিয়ে মুছে ফেলা অস্পষ্ট একটু দাগ রয়ে গেছে। চিঠিটা পড়তে শুরু করল ও।

'ডিয়ার সিনর,

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আপনি আমার সাথে বিবেচকের মত আচরণ করছেন না। দু'জন মিলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম আমরা, কিন্তু আমাকে যে সুবিধেটুকু আপনার দেয়ার কথা ছিল তার আপনি কিছুই দিচ্ছেন না। আমার যতটুকু করার কথা ছিল তা আমি করেছি, কারণ আমি কথা দিয়ে কথা রাখি। কিন্তু এখন যখন আপনার কিছু করার পালা এসেছে, আপনি তা না করে আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন। ব্যাপারটা আমি একদম পছন্দ করতে পারছি না।

'আশা করি আপনার সাথে দেখা করার একটা উপায় বেরিয়ে আসবে, এবং তখন আমরা দু'জনেরই সুবিধে মত এই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করতে পারব। সেটা সম্ভব হবে বলেই আশা করি আমি। আর তা যদি না হয়, আমার তাহলে করার কাজ একটাই থাকবে। কিন্তু সেটা আমি করতে চাই না, কারণ আমার একটা সম্মান আছে।

'আগামী তিন কি চারদিনের মধ্যে আপনার কাছ থেকে একটা জবাব পাব বলে আশা করছি আমি। এদিকে আমি খুব কঠিন অবস্থায় আছি। ডি. এস.'

চেয়ারের হাতলে আবার বসল রানা। চিঠিটা চোখের সামনে মেলে ধরে আরেকবার পড়ল। তারপর সেটা এনভেলাপে ভরে রেখে দিল পকেটে। হাতের উল্টোপিঠে চিবুক ঠেকিয়ে মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে থাকা লাশটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও।

হঠাৎ করেই আপনমনে হাসতে শুরু করল রানা। 'তাহলে এই ব্যাপার!' স্বগতোক্তি করল ও।

নক হলো দরজায়। উঠে গিয়ে খুলে দিল রানা।

'জীপ নিয়ে এসেছি, মাসুদ ভাই,' বলল সেতু। লাশের দিকে তাকাল একবার, কিন্তু চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। 'রশি চটের বস্তা সবই আছে।'

'চলো তাহলে দু'জন মিলে গাড়িতে তুলি ওটাকে,' বলল রানা। 'কোথায় ফেলতে হবে জানো তো?'

'জানি, মাসুদ ভাই।' এগিয়ে এসে লাশের পা দুটো ধরে ওপর দিকে তুলল সে।

# আট

টেলিফোন এক্সচেঞ্জের একটা ছোট ভ্যান-গাড়ি এসে ঢুকল গুলশানের সি ব্লকে। একটা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে থামল সেটা। ভ্যানের পিছন থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল রোগা-পাতলা এক লোক। ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকল সে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল চার নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে। নক করল দরজায়।

প্রৌঢ়া এক মেয়েলোক, দেখে মনে হলো কাজের বুয়া, দরজা খুলে দিয়ে জানতে চাইল, 'কারে চান?'

'তোমাদের নাকি টেলিফোন লষ্ট হয়ে গেচে?' জানতে চাইল গিলটি মিয়া। 'এটা মিস্টার দা সিলভার ফেলাট তো রে, বাপু? নাকি চোকের মাতা খেইচি?'

'আয়েন।'

মেয়েলোকটার পিছু পিছু ড্রইংরুমে ঢুকল গিলটি মিয়া। টুল-বক্সটা এক হাত থেকে আরেক হাতে নিল সে। মেয়েলোকটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে লক্ষ করে তার দিকে ফিরে বলল, 'সং সেজে ভেঁড়িয়ে আচো কি মনে করে? যাও, সায়েবকে তলব করো।' জানে, দ্য সিলভা এই মুহূর্তে ফ্ল্যাটে নেই।

'সায়েব বাইত নাই।'

টুল-বক্সটা মেঝেতে রেখে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। ফোনের ক্রেডল আর রিসিভারটা পরীক্ষা করল সে। তারপর কর্ডটা দেখল। ফিরল মেয়েলোকটার দিকে। দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'আমাকে কি তুমি চোর-ছ্যাঁচোড় ধরে লিয়েচো, গা? তাই পাহারা দিচ্চো, না? যাও! বিবি সাহেবকে ডেকে লিয়ে এসো।'

ডাকতে হলো না, এই সময় ঘরে ঢুকল শায়লা।

একগাল হেসে গিলটি মিয়া বলল, 'টেলিফোন একচেন থেকে এয়েচি।'

'মেরামত হবে?'

'পানির মত। দু'মিলিটেরও কাজ নয়,' আশ্বস্ত করল গিলটি মিয়া। 'তারটা ধরে কেউ বোধায় টানা-হ্যাঁচড়া করেচে।'

মেয়েলোকটার দিকে ফিরল শায়লা। বলল, 'ঠিক আছে, তুমি কাজ করো গিয়ে।'

মেয়েলোকটা চলে গেল। তার জোড়া লাগাচ্ছিল গিলটি মিয়া, কাজ থামিয়ে ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে ছোট এক টুকরো কাগজ বের করল। মেঝের ওপর সেটা ফেলে একটু সরে গেল সে।

এগিয়ে এসে কাগজের টুকরোটা তুলে নিল শায়লা। মুঠোর ভেতর নিয়ে বেরিয়ে এল ড্রইংরুম থেকে। বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল সে। ভাঁজ খুলে চোখ বুলাল কাগজে। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—'বত্রিশ পাঁচ, নতুন লাইন, ফ্ল্যাট ছয়, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া—আজ রাত দশটায়।'

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল শায়লা। ছাইদানীতে কাগজটা ফেলে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আগুন ধরাল তাতে। কাগজটা ছাই না হওয়া পর্যন্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে।

মাসুদ রানার চেহারা কল্পনা করছে জ্যোতি ভাবী, আর আতঙ্কে নীল হয়ে উঠছে তার ফর্সা চেহারা। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, ছোকরা বয়েসী যুবকরা বরাবরই তার মনে আনন্দ-উত্তেজনার ঢেউ বইয়ে দিয়েছে, কিন্তু আজ ঘটছে ঠিক তার উল্টোটা।

রঁদেভো ক্লাব। বেশি রাত হয়নি, একজন দু'জন করে আসতে শুরু করেছে মাত্র, আসর জমতে দেরি আছে এখনও। ক্লাবের ডাইনিং হলে খানিক আগে ঢুকল চেরি, রোজই এই সময় পৌঁছায় সে। ওকে টেবিলে একা দেখে সে-ও এসে বসেছে। 'আজ কিন্তু আপনি আমার গেস্ট, জ্যোতি ভাবী।' বলে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়েছে সে। অর্ডার পেয়ে শ্যাম্পেন দিয়ে গেছে ওয়েটার। ডিনার আসছে।

চেরিকে আপন মনে হাসতে দেখে কোন কারণ ছাড়াই গা জ্বালা করে উঠল জ্যোতি ভাবীর। মনে মনে ভাবল, ইচ্ছে হয় ওর আমি গলা টিপে ধরি। সব সময় এত হাসি খুশি থাকে কি করে।

যদিও ভাবীর চেহারায় মনের ভাব ফুটল না। বলল, 'একটা ককটেল হলে ভাল হত, চেরি। তা, আজ এত খুশির কি ঘটল তোমার? ঢুকেই আমার জন্যে স্পেশাল ডিনারের অর্ডার দিয়ে বসলে?'

'খুশির কি ঘটবে,' হাসতে হাসতে বলল চেরি। 'মনটা কেন জানি খুব ভাল লাগছে, সেই সকাল থেকেই। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ঠিক করলাম, ক্লাবে ঢুকে আজ যাকে প্রথম দেখব তাকেই ডিনার খাওয়াব। আপনার ভাগ্যটা ভাল, জ্যোতি ভাবী। অবশ্য বরাবরই তাই।'

ভাল না ছাই! এমন ভাগ্যের মুখে লাথি মারি!—ভাবল জ্যোতি ভাবী। সাংঘাতিক আতঙ্কিত হয়ে আছে সে। বার বার চোরা চোখে মিউজিক হলের দিকে তাকাচ্ছে। একজনের অপেক্ষায় রয়েছে সে। নামটা সুন্দর, মাসুদ রানা,

কিন্তু মানুষটা ভয়ঙ্কর। আবার নিজের সম্পর্কে ভাবল সে—এই হয়, শেষ পর্যন্ত এই হয়। পাপ কখনও চাপা থাকে না। ছেলে-মেয়ে-স্বামী-সংসার সব একরকম বাদ দিয়ে নিজেকে নিয়ে ফুর্তি করছি, তাও এই বয়সে, আমার কপালে তো খারাবি থাকবেই। তারপর ভাবল, এই বিপদ থেকে ভালয় ভালয় যদি পরিত্রাণ মেলে, এবার ঘর-মুখো হবে সে। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গ পাবার জন্যে শরীর আর মন দুটোই লালায়িত হয়ে উঠবে, কিন্তু যেভাবে হোক সংযম ধরতে হবে তার, সামলাতে হবে নিজেকে। তা নাহলে এই বয়সে কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকবে না। কিন্তু নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ কি পাবে সে? বিপদ কি এত সহজে কাটবে?

আজ সকালেও মন তার ভাল ছিল। চুল বাঁধার জন্য হেয়ারড্রেসারের কাছে গিয়েছিল, বেরুতেই তার পথ আগলে দাঁড়াল সুপুরুষ ওই তরুণ। সত্যি কথা বলতে কি, পুলক লাগছিল তার। ধরেই নিয়েছিল, পরিচিত কেউ হবে, চিনতে পারছে না।

কিন্তু ছোকরা হাসছে না দেখে একটু খটকা মত লাগল তার। সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই শুনতে পেল, বলছে, 'আপনিই তো জ্যোতি ভাবী? আমি মাসুদ রানা। রাস্তার মাঝখানে এভাবে আপনাকে আটক করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু কোথাও বসে আমাদের কথা বলাটা খুব জরুরী।'

'তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব এনেছিল সে। 'কিন্তু কে আপনি? আপনাকে তো আমি চিনি না।'

'চেনেন না, কিন্তু কথা দিচ্ছি, চিনবেন,' বলে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল মাসুদ রানা। 'ইচ্ছে করলে গাড়িতে উঠে চলে যেতে পারেন আপনি। কিন্তু আপনার জন্যে সেটা ভাল হবে না। বরং আমার প্রস্তাবটা মেনে নিন, চলুন, একটা রেস্তোরাঁয় বসে আলোচনা সেরে নিই।'

'আমার কোন দায় পড়েনি,' কঠিন সুরে বলেছিল সে। 'পথ ছাড়ুন।' কিন্তু ভয়ে দুরু দুরু করছিল তার মন।

যেন খুব মজা পেয়েছে, এমনভাবে হাসতে লাগল মাসুদ রানা। বলল, 'আপনার স্বামী নামকরা একজন সরকারী কর্মচারী। তিনি জানেন, আপনি সমাজসেবা করে বেড়ান। আপনার ছেলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আপনার দুটো মেয়ে আছে, তাদের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। তারা যদি জানে, শুধু হাসান তারেককে নিয়ে নয়, তার মত আরও অনেক কম বয়েসী ছোকরাদের নিয়ে আপনি হোটেলে ওঠেন, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন, থাকেন গভীর রাত পর্যন্ত তখন কি হবে বলে আপনার ধারণা?'

মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল সে, মাসুদ রানাই তার হাত ধরে ফেলল। ভাগ্যিস ড্রাইভারকে নিয়ে বের হয়নি সে! তাহলে আর কেলেঙ্কারি ঠেকানো যেত না। এরপর আর কথা চলে না, মাসুদ রানার সাথে তাকে যেতেই হয়েছিল।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বর্তমানে ফিরে এল জ্যোতি ভাবী। শুনতে

পেল, চেরি বলছে, 'এই যে জ্যোতি ভাবী, আপনার ককটেল। আবহাওয়াবিদের লেটেস্ট সংজ্ঞা সম্পর্কে শুনেছেন? এ-ধরনের কৌতুক নিয়ে আপনি তো প্রচুর সময় কাটান।'

'কি?' মর তুই, মর! মনে মনে চেরিকে অভিশাপ দিল জ্যোতি ভাবী। তোর জিভে ঘা হোক, গলে গলে পড়ুক।

'আবহাওয়াবিদের সংজ্ঞা,' বলল চেরি। 'যে লোক মেয়েদের চোখে তাকিয়ে আবহাওয়া দেখতে পায়, তাকেই বলা হয় আবহাওয়াবিদ।'

'না, শুনিনি,' বলে মাত্র এক চুমুকে ককটেলটুকু শেষ করল জ্যোতি ভাবী। 'ভালই লাগল।'

আবার মাসুদ রানার কথা ভাবতে লাগল সে। নিস্প্রাণ, জড়পদার্থের মত গাড়িতে বসে ছিল সে, মাসুদ রানাই চালাচ্ছিল। তার মন বলছিল, এটা ব্ল্যাকমেইল ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবেই তো শুরু হয়। হায় খোদা।

তার মনের কথা যেন বুঝতে পারে মাসুদ রানা, বলে, 'ভয় পাবেন না, মিসেস জ্যোতি। কেউ আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করতে যাচ্ছে না। তবে, যা করতে বলা হবে তা না করলে আপনার বিপদ হবে, কথা দিতে পারি।'

রেস্তোরাঁয় পৌঁছুতে তিন মিনিট লেগেছিল, এই তিন মিনিটে দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছিল তার। কফি খেয়েছিল ওরা, বিলটা মাসুদ রানাই দিল। রেস্তোরাঁয় দশ মিনিট ছিল ওরা। কি করতে হবে, খুব ভাল করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

এখন রঁদেভোয় সেই মাসুদ রানার জন্যেই অপেক্ষা করছে সে। ভাবছে, এরপর কি হবে? যা করতে বলা হয়েছে তা সে করবে, যা বলতে বলা হয়েছে তা সে বলবে, কিন্তু তারপর?

'খুব দেখালেন, জ্যোতি ভাবী,' বলল চেরি। 'এর আগে আপনাকে কখনও এভাবে এক চুমুকে ককটেল খেতে দেখিনি আমি। ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'খেয়াল করিনি, চেরি,' বলল সে। 'আমি একটু দুশ্চিন্তায় আছি, বুঝলে।'

'আপনি দুশ্চিন্তায় আছেন?' আকাশ থেকে পড়ল চেরি। 'বলেন কি! আপনার জীবনে দুশ্চিন্তা করার মত কিছু আছে নাকি? দেখে তো মনে হয় না। বরং সবাইকে নিয়ে এমন আনন্দ ফুর্তিতে মেতে থাকেন, মনে হয়...'

'ব্যাপারটার সাথে তুমিও জড়িত, চেরি,' গম্ভীর দেখাল তাকে। 'আমি শায়লার কথা বলছি।'

'আমি জড়িত?' পেন্সিল দিয়ে আঁকা ভুরু কুঁচকে তাকাল চেরি। 'শায়লার ব্যাপারে? বুঝলাম না।'

'তুমি একটা অন্যায় সুযোগ নিয়েছ, চেরি,' বলল সে। 'এরকম নোংরামি আমি একদম পছন্দ করি না।' তার চোখ জোড়া রাগে জ্বলতে লাগল। 'বেচারি শায়লা একেবারে গাড্ডায় পড়ে গেছে। এর জন্যে তুমিই দায়ী। সবাই জানে, শায়লাকে আমি ছোট বোনের মত স্নেহ করি। তুমিও নাকি তার একজন বন্ধু। তোমার এই বন্ধুত্বের এক কানাকড়ি মূল্য দিই না আমি।'

রাগ করা তো দূরের কথা, চেরি এমন নিঃসংকোচে হাসতে লাগল, যেন খুব মজা লাগছে তার। 'আমার গেস্ট হয়ে আমাকেই এসব বলছেন, জ্যোতি ভাবী? দুনিয়াটা সত্যি পাল্টে গেছে। কিন্তু যা বলছেন, তার অর্থ বোঝেন?'

'বুঝব না কেন? তুমি ভেবেছ, কিছুই আমি জানি না?' গলায় যথাসম্ভব ঝাঁঝ ঢেলে বলল সে। 'তুমি যে সাঈদকে ফাঁদে ফেলেছিলে সবাই সে-কথা জানে। শায়লা ভালমানুষ, সে হয়তো না জানতে পারে, কিন্তু আর কারও জানতে বাকি নেই। বেশ চলছিল, কিন্তু তুমি বাসী হয়ে যাওয়ায় তোমার ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যায় সাঈদ। সেটাই তোমার রাগের কারণ। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তুমি এই জঘন্য কাজটা করে বসলে। শায়লা ঘর ছাড়ব ছাড়ব করছিল, এই সময় তাকে তুমি শোনালে সিলভা তাকে ভালবাসে। শুধু তাই নয়, তুমিই সাঈদ সম্পর্কে সত্যি মিথ্যে বানিয়ে যা নয় তাই শায়লার কানে তুলেছ। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়, চেরি। এই না হলে প্রতিশোধ! সাঈদ তোমার জাল কেটে বেরিয়ে গেল, তুমি তার ঘর ভেঙে দিলে। কী চমৎকার।'

'ভাবী…ভাবী গো…ভাবী…।' নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল চেরি। '…আপনি আসলে এতটাই সরল যে এর ভাল দিকটা দেখতেই পাচ্ছেন না।' অনবরত হাসছে সে। 'এতে এত দুশ্চিন্তার কি আছে বলুন তো? কেউ বলবে, সাঈদ শায়লাকে সুখে রেখেছিল? তারচেয়ে এটা কি ভাল হয়নি? সিলভা কথা দিয়েছে, শায়লাকে সে বিয়ে করে দেশে নিয়ে যাবে। আমার তো বিশ্বাস, খুবই সুখী হবে ওরা। সাঈদ দেখতে ভাল, কিন্তু সিলভাও কি কম? শায়লার সাথে তাকে মানায়নি, এ-কথা সিলভার শত্রুও বলতে পারবে না!'

'চেরি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে, 'তুমি একটা মিথ্যেবাদী।'

'তাই?' মুচকি হাসি লেগে রয়েছে চেরির ঠোঁটে।

'যদি না জানো তো শোনো,' বলল সে। 'সিলভা যে মিশন নিয়ে এসেছিল, সেটা ব্যর্থ হয়েছে। আর দু'তিন দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। এই অবস্থায় শায়লাকে তার বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

'দূর, এ আমি বিশ্বাস করি না!' কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল চেরি।

'শায়লা আবার বিয়ে করতে চাইলে প্রথমে তাকে সাঈদের কাছ থেকে ডিভোর্স পেতে হবে, এ-কথা ঠিক তো?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আর, সঙ্গত কারণেই, শায়লা যাতে তাড়াতাড়ি ডিভোর্স না পায়, নানা রকম টালবাহানা করবে সাঈদ।'

এখন আর হাসছে না চেরি। জানতে চাইল, 'এসব সত্যি, জ্যোতি ভাবী? সত্যি হলে তো খুবই চিন্তার কথা। সিলভা বিয়ে না করেই ফিরে যাচ্ছে? কিন্তু আমি যতটুকু জানি, কথা তো সেরকম ছিল না। আমাকে বলা হয়েছে, বিয়ে করেই দেশে যাবে সে, তারপর বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে আবার সে ফিরেও আসবে।'

'ওসব বাজে কথা। সিলভা জানিয়ে দিয়েছে, তাকে তার পেশা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শায়লার সাথে তার আর কখনও দেখা হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেহারাটা কাতর করে তুলল সে। 'এই হলো

পরিস্থিতি, বুঝলে। সব কিছুর জন্যে তুমিই দায়ী। সাঈদের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শায়লার মত সরল একটা মেয়ের জীবনটা নষ্ট করে দিলে। বেচারী এখন যায় কোথায়? সাঈদের কাছে ফেরার পথ বন্ধ, সিলভাও তাকে সাথে নেবে না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'তোমার ভাল হবে না, চেরি। এভাবে কারও ঘর ভাঙলে আল্লা সেটা সহ্য করেন না…'

অভিশাপ ইত্যাদি গায়ে মাখল না চেরি। ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল সে, 'আপনি এতসব কথা জানলেন কিভাবে, জ্যোতি ভাবী?'

অবলীলায় মিথ্যে বলে গেল সে, 'আজ সকালে শায়লা আমাকে ফোন করেছিল। সেই সব বলল।'

'আর সাঈদের সাথে আমাকে জড়িয়ে যেটা বললেন? এই কথাটাও কি শায়লার মুখ থেকে শুনলেন আপনি?'

মাথা নাড়ল সে। 'না, ওটা শুনলাম সাঈদের কাছ থেকে। শায়লার সাথে কথা বলার পর সাঈদকে ফোন করেছিলাম আমি। কিভাবে কি ঘটেছে, সব বুঝতে পেরেছে সাঈদ। তোমার ওপর আগুন হয়ে আছে সে। থাকারই তো কথা। এমন সর্বনাশ কেউ কারও করে।'

'আপনি, ভাবী, আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন,' হাসিমুখেই বলল চেরি। 'প্রতিশোধ বলছেন, ওটা আসলে বাজে কথা। আমি সত্যি সত্যি শায়লার ভাল চেয়েছিলাম। এখন যাই ঘটুক না কেন, সাঈদের অত্যাচার থেকে তো শায়লা বাঁচল। এটাই বা কম কিসে? সর্বনাশ সর্বনাশ করে চেঁচাচ্ছেন, তার কারণ বাড়িয়ে বলা, বড় করে দেখা আপনার পুরানো স্বভাব। শায়লা আমার বান্ধবী, আমি ওর ভাল চেয়েছি, কাজেই আমার ভেতর কোন অপরাধবোধ নেই।' মুখে হাসিটা আরও উজ্জ্বল হলো। 'কেউ যখন অন্যের সমালোচনা করে, নিজের কীর্তিগুলো ভেবে দেখে না, এটাই দুঃখ। সে যাকগে। আপনি বরং আরেকটা ককটেল নিন, ভাবী, মন থেকে ওসব মুছে ফেলে একটু শান্ত হবার চেষ্টা করুন।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' মিনমিন করে বলল সে। 'তাছাড়া এখুনি সবাই এসে পড়বে, লোকজনের সামনে আমি তোমার সাথে ঝগড়া করতে চাই না।'

শব্দ করে হেসে উঠল চেরি, 'চান না বুঝি? কথাগুলো যদি গায়ে মাখতাম, শুধু কি ঝগড়া, চুলোচুলি হয়ে যেত না?' হাসতে হাসতে হাত নেড়ে ওয়েটারকে ডাকল সে। আবার ককটেল দিতে বলল।

দরজার দিকে তাকাল জ্যোতি ভাবী। তাকাতেই দেখতে পেল রানাকে। ভাবল, ওই, এসে গেছে। যা করতে বলেছিল, করেছি। এখন কি আমি নিরাপদ, বিপদ কেটে গেছে আমার?

অবাক বিস্ময় ও আনন্দের ভাব ফুটে উঠল রানার চেহারায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে ওদের টেবিলের কাছে চলে এল ও। 'মাই গড! জ্যোতি ভাবী না? কি সৌভাগ্য আমার, এত বছর পর সত্যি তাহলে আপনার সাথে আবার আমার দেখা হলো? মাই গড! আপনি দেখছি সেই আগের মতই আছেন, একটুও বদলাননি!'

মুখ তুলে তাকাল জ্যোতি ভাবী। কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে, যেন রানাকে চিনতে চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা, যেন চিনতে পেরেছে। 'আরে, আরে, মাসুদ না? কি আশ্চর্য, কত্তো বড় হয়ে গেছ তুমি!' যেন হঠাৎ তার খেয়াল হলো, টেবিলে চেরি রয়েছে। তার দিকে তাকাল সে। 'চেরি, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার দূর-সম্পর্কের দেবর।' তারপর চেরির কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'গোঁফ মাত্র গজিয়েছে, তখন থেকে আমার পিছনে লেগেছিল।' সিধে হলো সে, রানার দিকে তাকাল। 'রঁদেভোর একটা বিরাট আকর্ষণ, চেরি—শাহানা ফেরদৌস চেরি। তা রানা, এদ্দিন কোথায় ছিলে তুমি?'

চেরির চোখে একবার চোখ রেখে মৃদু হাসল রানা, তারপর জ্যোতি ভাবীর দিকে তাকাল। 'জানেনই তো, মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সে আছি। একটা কাজ নিয়ে আমেরিকায় ছিলাম।'

'মেয়েগুলো শান্তিতে ছিল,' ঠোঁট টিপে হাসল জ্যোতি ভাবী।

'কি যে বলেন,' লাজুক একটু হাসি দেখা গেল রানার মুখে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল ও। 'তা, আমার বন্ধুদের খবর-টবর কিছু জানেন নাকি? সাঈদ কেমন আছে? এখানে আসে তো ওরা? সাঈদ আর শায়লা?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল জ্যোতি ভাবীর। 'হ্যাঁ…মানে,' কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে, '…সাঈদ এখন মিনিস্ট্রি অভ ওয়ার্কসে কাজ করছে।'

'কেমন আছে ও?'

'উম-ম, ভালই আছে,' বলল জ্যোতি ভাবী। 'ওর সাথে দেখা করছ তো?'

'অবশ্যই। তবে তার আগে পুরানো কয়েকটা আড্ডায় একবার করে ঢুঁ মারতে চাই। অনেকদিন পর ফিরলাম তো, ঘুরেফিরে প্রিয় ঢাকার সাথে পরিচয়টা একবার ঝালিয়ে নিতে চাই। তারপর সবার সাথে যোগাযোগ করব।'

টেবিলের সামনে একজন ওয়েটার এসে দাঁড়াল। বলল, 'ম্যাডাম, আপনার টেলিফোন!'

'বিরক্তিকর!' রাগের সাথে বলল জ্যোতি ভাবী। 'একটা মুহূর্ত যদি শান্তিতে থাকতে দেয়।' চলে গেল সে।

'আপনি বসবেন না, মি. রানা?' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল চেরি।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। ভাবল, সাঈদের বর্ণনায় মারাত্মক ভুল ছিল, মেয়েটা আশ্চর্য সুন্দরী! আসলে সবাই সব জিনিস দেখতে পায় না। এই মেয়ের চোখে যে মায়াভরা বিষণ্ণতা রয়েছে, সেটাই একলাখ মেয়ের মাঝখান থেকে ওকে আলাদা করে চেনার জন্যে যথেষ্ট। আবার যতদিন না আমেরিকায় যাচ্ছি, এই মেয়ে বোধহয় আমাকে সোহানার কথা ভুলিয়ে দিতে পারবে।

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। ওয়েটারকে ডেকে বলল, 'আমার জন্যে একটা ডাবল মার্টিনি।' ওয়েটার পিছন ফিরতেই চোখে খোলাখুলি প্রশংসা

নিয়ে চেরির দিকে তাকাল ও।

'সাঈদ তাহলে আপনার একজন বন্ধু?' জানতে চাইল চেরি।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অনেক দিনের পুরানো। একটু অস্থির প্রকৃতির, কিন্তু মনটা ওর খুব ভাল। ওকে আমার ভাল লাগে। ওদের আপনি চেনেন?'

'খুব ভাল করে চিনি,' বলল চেরি। 'নিজেদের মধ্যে একটু ঝামেলায় আছে ওরা।'

'তাই? শুনে খুব দুঃখ পেলাম।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। কাঁধ ঝাঁকাল। 'যুগটাই যেন কি রকম। আজকাল সবই সম্ভব। পশ্চিমের হাওয়া এদিকেও লাগছে। আমেরিকায় তো দাম্পত্য কলহ কোন ব্যাপারই না। আর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া তো ডালভাত। ওদের ব্যাপারটা কি সিরিয়াস ধরনের?'

চেরির আর উত্তর দেয়া হলো না, হাইহিলের খটাখট আওয়াজ তুলে ফিরে এল জ্যোতি ভাবী। তার চেহারায় ব্যস্ততা। 'আজ কপালটাই খারাপ, বুঝলে। কর্তা ফোন করে বললেন, হঠাৎ সিদ্ধান্ত হয়েছে আজই তাকে ঢাকার বাইরে যেতে হবে। খানিক পরই তার ফ্লাইট। কাজেই বাড়িতে আমাকে ফিরতেই হচ্ছে।'

'সে কি! ডিনারটাও সেরে যেতে পারবেন না, জ্যোতি ভাবী?'

'মাথা খারাপ! আমার কর্তাকে তো চেনো না! দরকারের সময় কাছে না পেলে একদম ফায়ার হয়ে যান।' রানার দিকে তাকাল সে। 'এই ছেলে, আমার একটা কথা রাখতে হবে তোমাকে। আজ আমি চেরির গেস্ট ছিলাম। বুঝতেই পারছ, আমি থাকতে পারছি না। আমার হয়ে প্রক্সি দেবে, প্লীজ? তা না হলে বেচারী একা হয়ে যাবে।'

রানা কিছু বলার আগেই মিষ্টি হেসে চেরি বলল, 'তাহলে তো ভালই হয়। কিন্তু ওঁর কি সময় হবে!'

চেরির দিকে তাকাল রানা। ওর চোখে প্রশংসার ভাবটুকু গোপন থাকল না। মৃদু হেসে বলল ও, 'কি জানেন, আমি বরাবরই ভাগ্যবান। ফেরার পর ঢাকায় আজ আমার প্রথম রাত, আর প্রথম রাতেই কেউ আমাকে ডিনার খাওয়াচ্ছে।'

'কিন্তু আমার সঙ্গ আপনার কি ভাল লাগবে?' এটা চেরির একটা কৌতুক। জ্যোতি ভাবী প্রস্তাবটা যদি নাও দিত, ডিনারের সময় রানাকে থাকার জন্যে সে-ই অনুরোধ করত। মনে মনে আগেই জেনেছে, একবার বললেই রাজি হবে রানা।

'গোলাপের সঙ্গ কার না ভাল লাগে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'বিশ্বাস করুন, এ-ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার জীবনে প্রায়ই ঘটে।' খুব জোরে শ্বাস টানল ও। চেহারায় আনন্দ আর তৃপ্তি। 'এইজন্যেই তো জীবনটাকে এত ভাল লাগে।' জ্যোতি ভাবীর দিকে ফিরল ও। 'আনিস ভাই আপনাকে ফোন করায় আমি খুশি। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

হেসে উঠল জ্যোতি ভাবী। 'একেই বলে কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। চলি, ভাই। চেরি, মাসুদের যেন কোন অযত্ন না হয়। আর মাসুদ,

সময় করে একদিন বাড়িতে এসো কিন্তু।'

দরজার দিকে এগোল সে। মনে মনে ভাবছে, যা যা করতে বলেছিল করেছি, এবার হয়তো আমাকে রেহাই দেবে। কিন্তু মনটা পুরোপুরি শান্ত হতে পারছে না। মাসুদ রানাকে তার সাংঘাতিক ভয়। তার প্ল্যান, তার ভুয়া টেলিফোন কল, তার হুমকি, তার হাসি—সবই কেমন যেন অশুভ। তার মনে হলো, মাসুদ রানা একটা খারাপ বাতাস, সবার সর্বনাশ করার জন্যে হঠাৎ করে কাছে চলে এসেছে।

ক্লাবের দারোয়ান বিকল্পর একটা ট্যাক্সি ডেকে দিল। তাতে চড়ে বাড়ি ফিরল সে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম বাড়ি ফিরতে পেরে খুশি হলো সে।

মালিবাগ চৌধুরী পাড়ার মোড়ে রিকশা থেকে নামল শায়লা। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। রাস্তার দু'ধারে আলো ঝলমল দোকান পাট, চোখের সামনে রিস্টওয়াচ তুলে দেখল দশটা বাজতে এখনও মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। ফ্ল্যাট বাড়িটা খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে, হাঁটার গতি একটু বাড়িয়ে দিল ও। সারি সারি দোকান, কয়েকটা দোকানের পর একটা করে বাড়ির গেট, নাম্বার দেখে দেখে এগোতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

সাঈদের কথা ভেবে মন ভাল নেই শায়লার। না জানি কি করবে বেচারা! নিশ্চয়ই ওকে খুব খারাপ, ডুবে ডুবে জল খাওয়া মেয়ে, বেঈমান ইত্যাদি ভাবছে। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

বিপদ যে চারপাশ থেকে একটু একটু করে এগিয়ে এসে ওকে ঘিরে ফেলছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না শায়লার। উপলব্ধি করতে পারছে, সমস্ত ঘটনা দ্রুত একটা ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগোচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। নিজের অজান্তেই ওর হাঁটার গতি আরও একটু বেড়ে গেল, বিস্ফোরণ ঘটলে তার ফলাফল কি হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা জানতে চায় ও।

দু'বার বাঁক ঘুরে একটা গলিতে ঢুকল শায়লা। নম্বর মিলিয়ে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে থামল ও। হাতঘড়িতে দশটা বাজতে এক মিনিট বাকি। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দেখতে পেল ও। পিছন ফিরে একবার তাকাল। না, কেউ ওর পিছু নেয়নি। দরকার করে না, তবু পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ও।

তিনতলায় উঠে ছয় নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল শায়লা। হাঁপিয়ে গেছে, দরজায় নক করার আগে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর নক করল।

সাথে সাথে নয়, প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড পর খুলে গেল দরজা। সেই প্রবীণ ভদ্রলোককে দেখল শায়লা, ইনিই সেদিন রাতে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, ওকে এই অভিনয়টুকু করতে রাজি করিয়েছিলেন। ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, রাহাত খান। ভদ্রলোক দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাঁর

অনুরোধকে মনে হয় নির্দেশ, যা বোধহয় কারও পক্ষেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। সাঈদ্র ওঁরই গড়া একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে শুনে খুশি হয়েছিল ও।

শায়লা লক্ষ করল, ভদ্রলোকের হাতে আজও একটা চুরুট রয়েছে। মিষ্টি তামাকের গন্ধটা আজও তার ভাল লাগল। কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া আজ কুঁচকে নেই দেখে মনে মনে পরম স্বস্তি বোধ করল ও।

রাহাত খানের মুখে স্নেহমাখা হাসি। পথ ছেড়ে এক পাশে সরে গেলেন তিনি, নরম সুরে বললেন, 'এসো, এসো মা।'

ভেতরে ঢুকল শায়লা। প্যাসেজ ধরে কয়েক পা এগিয়ে থামল। রাহাত খান নিজের হাতে বন্ধ করলেন দরজা। তারপর ফিরলেন। ইঙ্গিতে পর্দা টাঙানো একটা দরজা দেখিয়ে বললেন, 'ঘরে ঢোকো।' অনুরোধ, কিন্তু শোনাল নির্দেশের মত।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল শায়লা। সুন্দর করে সাজানো একটা ড্রইংরুম। দেয়াল ঢাকা স্ক্রীন, সোফা, কার্পেট সব একরঙা—হালকা বাদামী। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

পর্দা সরিয়ে রাহাত খান ঢুকলেন। 'বসো, শায়লা। তোমাকে কিন্তু আমি চা খাওয়াতে পারব না।'

'রাতে আমি চা খাই না,' মৃদু কণ্ঠে কথাটা বলে একটা সোফায় জড়োসড়ো হয়ে বসল ও।

দশ হাত দূরে, আরেকটা সোফায় বসলেন রাহাত খান। হাতে ধরা চুরুটে টান দিলেন কয়েকটা। তারপর শায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।'

'না···মানে,' রিস্টওয়াচ দেখল শায়লা। 'সময় বেশি নেই, স্যার। সোয়া এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরবে সিলভা। ফিরে যদি আমাকে দেখতে না পায়, কিছু একটা সন্দেহ করতে পারে।'

'রাইট। তাহলে কথাবার্তা আমাদের তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার। বলো।'

'বলার তেমন কিছু নেই, স্যার,' শুরু করল শায়লা। 'সিলভা সাংঘাতিক সাবধানী লোক। কিন্তু কি কারণে জানি না, খুব ভয়ে ভয়ে আছে সে। আমাকে বলল, দু'একদিনের মধ্যে তাকে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ তার মিশন নাকি ব্যর্থ হয়েছে। বাণিজ্য প্রস্তাবগুলো দেখার পর আমাদের মন্ত্রণালয় নাকি মন্তব্য করেছে, এসব প্রস্তাবে একতরফা সুযোগ-সুবিধে দাবি করেছে স্পেন সরকার। বলল, এই পরিস্থিতিতে আমাকে সে স্পেনে নিয়ে যেতে পারবে না। সেজন্যে মরমে মরে যাচ্ছে, এইরকম একটা ভাবও দেখাল।'

রাহাত খান শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মিথ্যে কথা বলছে। তবে এ ছাড়া তার উপায়ও নেই। লোকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এরপর তার আত্মাকে খাঁচা ছাড়া করা হবে।' তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্য ভরা একটু হাসি দেখা গেল।

'আমি স্যার, সাঈদ সম্পর্কে···সাঈদ কেমন আছে, স্যার?' জড়োসড়ো

ভাবটা কাটিয়ে উঠে সোফার ওপর সিধে হয়ে বসল শায়লা। 'ওর জন্যে আমি খুব চিন্তায় আছি। ও...'

'তা তো থাকবেই,' আবার সেই স্নেহমাখা হাসি দেখা গেল রাহাত খানের মুখে। 'কিন্তু আমরা যখন ওকে চোখে চোখে রেখেছি, তোমার চিন্তার কোন কারণই নেই, মা। শুধু একটা কথা মনে রেখো, সময় মত যদি কিছু একটা করা না হত, সাঈদকে এতদিনে খুঁজে পাওয়া যেত না। শুধু সাঈদ সম্পর্কেই নিশ্চিত ভাবে জানত ওরা। জানত, হেদায়েতকে সে-ই সরিয়েছে। যা জানতে চেয়েছিল, এই ঘটনা থেকেই ওরা তা জেনে ফেলে।'

'ও কি এখন নিরাপদ, স্যার?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল শায়লা।

'এই পেশায় আমরা যতটুকু নিরাপদ, সাঈদও ততটুকু নিরাপদ। বরং ও একটু বেশি নিরাপদ, কারণ আমরা ওর ওপর নজর রাখছি।' রাহাত খান মৃদু হাসলেন। 'মাসুদ রানা, আমার সবচেয়ে যোগ্য এজেন্টদের একজন, সাঈদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে। আশা করছি, ওর কাছ থেকে খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট পাব। তখন বুঝতে পারব, কি করছি আমি।'

শায়লার মনে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ করায় কোনটাই উচ্চারণ করতে পারল না।

'সব কথা যখন জানবে সাঈদ, ভারি অবাক হবে, তাই না?' মিটি মিটি হাসলেন রাহাত খান। 'ভাল কথা, সিলভার পাসপোর্ট দেখার সুযোগ হয়েছে তোমার? ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট, তাই না?'

'জী। আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন, জেনেছেন, স্যার? জানেন কে...'

'না, এখনও জানি না,' রাহাত খান বললেন। 'রানাকে আরও সময় দেয়া উচিত। ও ঠিকই জানতে পারবে। ওর কাজের ধারাই এমন, কাজ শেষ হয়ে আসে, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্ত ছাড়া সেটা বোঝা যায় না।'

কে এই মাসুদ রানা? সাঈদকে সে রক্ষা করতে পারবে তো? রাহাত খান যার ওপর এতটা ভরসা করছেন, নিশ্চয়ই যোগ্য লোক সে। মনে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল শায়লা।

'নিয়ম নেই, কিন্তু তবু সব কথা তোমাকে বলা উচিত, শায়লা,' রাহাত খান বললেন। 'জানার তোমার অধিকার আছে। আমরা প্ল্যানটা এভাবে করেছি, তার কারণ এই নয় সে সাঈদকে আমরা পছন্দ করি না বা তাকে আমরা অবিশ্বাস করি। এক সময় চমৎকার সার্ভিস দিয়েছে ও। কিন্তু যে-কোন লোক একটা সময়ে একটু দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, বিশেষ করে তার যদি সাঈদের মত টেমপারামেন্ট থাকে। তোমাকে জানালে ক্ষতি নেই, প্ল্যানটা আমার নয়। সাঈদ কাজে ভুল করে বসতে পারে এটা আন্দাজ করতে পেরেছিল রানা, সেটার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের অন্য একটা সমস্যা সমাধান করার ছক তৈরি করেছিল ও। সেজন্যেই এর মধ্যে তোমাকে আনতে হলো।

'সাঈদ কি ভাববে তা নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। তার ভালর জন্যেই এতসব করা হয়েছে, এটা সে বুঝবে। তার মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তাই তাকে

আমরা হারাতে চাইনি, আর হারাতে চাইনি বলে তাকে আমরা রক্ষা করছি।'

এরপর প্রথম থেকে সব বলতে শুরু করলেন রাহাত খান। বললেন, তেল আবিবে বি.সি.আই.-এর দলটা ধরা পড়ে গেল, সেজন্যে দায়ী ছিল হেদায়েত খান। এই ঘটনার পর বি.সি.আই. যে হেদায়েতকে দায়ী করবে, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স সেটা জানত। সীমান্ত পেরিয়ে কোলকাতায় পালাবার জন্যে হেদায়েতের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল, গত কয়েক বছরে ওখানে সে অনেকবারই গেছে। আরেকবার যাওয়া তার জন্যে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু তেল আবিবের নির্দেশ ছাড়া ঢাকা ছাড়তে পারছিল না সে। ওদিকে, হেদায়েত বুড়ো হয়েছিল বলেই হোক, কিংবা তাকে বলি দিয়ে বিরাট একটা সুবিধে পারার আশাতেই হোক, তেল আবিব তার মায়া ত্যাগ করে তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর রাহাত খান বললেন, বছর কয়েক আগে হেদায়েত একটা মেয়েকে দিয়ে কিছু কাজ করাত। বি.সি.আই.-এর ছোটখাটো কাজ করত এক লোক, তার নাম চৌধুরী, এই চৌধুরী সেই মেয়েটার প্রেমে পড়ে এবং তাকে বিয়ে করে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ভেবেছিল চৌধুরী বি.সি.আই.-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট। কিন্তু মেয়েটার ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। কাজেই কয়েক হপ্তা পর চৌধুরীকে ছেড়ে চলে যায় সে।

এরপর বি.সি.আই. চৌধুরীকেই হেদায়েতের ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠায়। চৌধুরী যে হেদায়েতের ওপর নজর রাখছে, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স সেটা জানত। এতে করে তারা চৌধুরীর ওপর পাল্টা নজর রাখার সুবিধেটুকু পেল। হেদায়েতকে নিয়ে কি করে বি.সি.আই. তারা এটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল। চৌধুরীর ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। তারা দেখতে চাইছিল, হেদায়েতকে সরাবার জন্যে বি.সি.আই. গভীর জলের কোন মাছকে পাঠায় কিনা। তারা যা চাইছিল, বি.সি.আই. তাই তাদেরকে দিল। হেদায়েতকে সরাবার জন্যে গভীর জলের একটা মাছকেই পাঠানো হলো। সাঈদকে। এরপর মোটর কার অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা পড়ল হেদায়েত।

কিন্তু এই ঘটনারও আগে সাঈদকে সন্দেহ করতে পেরেছিল কেউ। সাঈদ বি.সি.আই.-এর হয়ে কাজ করে, এটা সে আন্দাজ করতে পারে। তবে নিশ্চিত ভাবে তখনও জানত না। সাঈদ যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করছে, তাদের একজন হবে সে। যে রাতে কাজের জন্যে রঁদেভোয় ফোন করে সাঈদের সাথে কথা বলা হলো, তখনই তারা অনুমান করতে পারে সাঈদ হেদায়েতের একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। ওদিকে, সাভারে, চৌধুরীর ওপর নজর রাখছিল একজন লোক—ধারণা করা যায়। রঁদেভো থেকে কেউ তাকে টেলিফোন করে জানায়, সাঈদ সাভারে যাচ্ছে। সম্ভবত সাঈদকে চৌধুরীর ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখে সে। তারপর, সাঈদ কাজ সেরে ঢাকায় ফিরে এলে, একটা গাড়ি নিয়ে কেউ ওকে অনুসরণ করে। গাড়িটা সম্ভবত দ্য সিলভারই। এরপর সারাক্ষণ তারা সাঈদকে চোখে চোখে রাখে। ইতোমধ্যে

তারা জেনে ফেলেছে, এই লোককেই তারা খুঁজছিল। এতদিনে তারা নিশ্চিত হলো।

সাঈদ সম্পর্কে কিছুই জানতে বাকি ছিল না রানার। বিশেষ করে ইদানীং তার মধ্যে যে সব দুর্বলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল ওর। হেদায়েতের ব্যবস্থা করার পর সে যে মদ খাবে, রানা আন্দাজ করতে পেরেছিল। আর তাই, রানার পরামর্শ ছিল, সাঈদকে নকল একটা তালিকা দিয়ে সেটা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে বলা হোক—যদিও ব্যাপারটা ছিল আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মত।

কিন্তু ঢিলটা ঠিকমত গিয়েই লাগল। সাঈদকে অনুসরণ করছিল সুন্দরী একটা মেয়ে, কৌশলে তালিকাটা ওর কাছ থেকে চুরি করল সে। চুরি করল বটে, কিন্তু সাঈদ মেয়েটাকে চিনে রাখল। পরে সাঈদ মেয়েটাকে দেখলে চিনতে পারবে। কাজেই সাঈদের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তাদের, এবং খুব তাড়াতাড়ি।

এটুকু শুনে সোফা ছেড়ে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল শায়লা। তার চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। 'সাঈদকে ওরা খুন করবে!' হাঁপাতে লাগল সে। 'তার মানে সাঈদকে ওরা...'

'শান্ত হও, শায়লা,' রাহাত খান বললেন। তাঁর গলায় এমন একটা কিছু রয়েছে, ধপ করে আবার বসে পড়ল শায়লা। রাহাত খান অভয় দিয়ে হাসলেন। 'তোমাকে তো বলেছি, সাঈদের ওপর একটা চোখ রেখেছে রানা। কখনও যদি আমাকে পাহারা দেয়ার দরকার হয়, আমি রানাকে চাইব। হি ইজ এ ভেরি এফিশিয়েন্ট ইয়াংম্যান।'

'আপনি আমার সর্বনাশ করবেন এ আমার বিশ্বাস হয় না,' মনের কথাটাই বলল শায়লা। 'আমি জানি সাঈদকে আপনি দেখবেন...'

মুচকি একটু হাসি খেলে গেল রাহাত খানের ঠোঁটে। 'তুমি যে সাঈদকে এত ভালবাস, সেজন্যে আমি খুশি, শায়লা। ওর সাথে যখন আমার দেখা হবে, ওর এই সৌভাগ্যের কথা ওকে আমি স্মরণ করিয়ে দেব।' রিস্টওয়াচ দেখলেন তিনি। 'রাস্তার মোড়ে একটা বেবী ট্যাক্সি পাবে তুমি, শায়লা। ড্রাইভার আমাদের লোক। সে তোমাকে সিলভার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে। সোজা ওখানে ফিরবে তুমি, অন্য কোথাও যাবে না। আর, সিলভার ওপর নজর রেখো।'

'তার ব্যাপারে এখন কি করব আমি?' জানতে চাইল শায়লা।

'তার আচরণে তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ, এটা তাকে বোঝাতে হবে তোমার। বলবে, তুমি এখন তার ফ্ল্যাটেও থাকতে পারো না, আবার সাঈদের কাছেও ফিরে যেতে পারো না। বরং একটা সীন-ক্রিয়েট করে বেরিয়ে এসো ওখান থেকে। আর কোথাও নয়, বড় কোন হোটেলে উঠবে। আমি একটা ফোন নাম্বার দিচ্ছি, হোটেলে ওঠার পর ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবে। রিসিভার তুলবে একটা মেয়ে, তুমি তাকে হোটেলের নাম আর রূম নাম্বার জানাবে।' রাহাত খান সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কাগজে খসখস করে লিখলেন নাম্বারটা।

শায়লাও উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, স্যার, তাই করব আমি।' রাহাত খানের বাড়ানো হাত থেকে কাগজটা নিল ও।

দরজা পর্যন্ত শায়লাকে পৌঁছে দিলেন রাহাত খান। শেষ বেলায় বললেন, 'ইউ আর ডুয়িং এ গ্রেট জব, শায়লা। তোমার এই সাহায্য আমার মনে থাকবে। গুডনাইট, মাই ডিয়ার।'

## নয়

রাত প্রায় এগারোটা। রঁদেভোর হলরুমে সামনাসামনি দুটো সোফায় বসে রয়েছে চেরি আর রানা। মিউজিক রুমে ভিড়, তাই ডাইনিং হল থেকে সরাসরি এখানে রানাকে এনে বসিয়েছে চেরি। নিরিবিলিতে কথা বলছে ওরা, কেউ ওদেরকে বিরক্ত করছে না।

কথা বলছে রানা। চোখের কোণ দিয়ে ওকে লক্ষ করছে চেরি। ওর কথাই ভাবছে সে।—অনেক দিন দেশের বাইরে ছিল। ফিরে আসার আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে। দেখতে খুবই সুন্দর, স্বাস্থ্যটা চমৎকার অথচ গায়ে একফোঁটা চর্বি নেই, এই না হলে পুরুষমানুষ! সম্ভবত ততটা চালাক-চতুর নয়। অন্তত সাত ঘাটের পানি খাওয়া লোক তো নয়ই। মেজাজটাও বেশ শান্ত। একে নিয়ে একটু কি খেলা যেতে পারে? সময়টা বোধহয় ভালই কাটবে এর সাথে।

'আমার কিন্তু ধারণাই ছিল,' বলে চলেছে রানা, 'শায়লার সাথে সাঈদের একটা গোলমাল বাধবে। তাই ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার কথা শুনে একটুও অবাক হইনি আমি। আসলে, এ ধরনের বিয়ে কখনও টেকে না।'

সোডা মেশানো হুইস্কির গ্লাসে ছোট্ট করে চুমুক দিল চেরি। গ্লাসের কিনারা দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। সে জানে, তাকে খুব সুন্দরী লাগছে। 'কেন আপনি অবাক হননি?' জানতে চাইল সে। 'কেন বলছেন এ ধরনের বিয়ে টেকে না?'

চওড়া কাঁধ দুটো ঝাঁকাল রানা। 'সাঈদের ব্যাপারটা হলো, কোন বাঁধনে জড়াতে চায় না ও। ওর প্রকৃতিটাও অস্থির। তার ওপর, নিজেকে নিয়ে ওর একটা গর্ব আছে। কিন্তু শায়লার মত সুন্দরী মেয়েকে যে বিয়ে করে, তার উচিত অহমিকার রাশ টেনে ধরা। যে মেয়ে সুন্দরী, সে তার রূপ সম্পর্কে সচেতনও। স্বামীর নিজেকে নিয়ে গর্ব তার সহ্য হবে কেন! আমার ধারণা, শায়লার কাছে সাঈদ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল।'

'হয়তো,' বলল চেরি। কিন্তু আমার মনে হয়, শুধু একঘেয়েমি নয়, তারচেয়ে খারাপ কিছু এর জন্যে দায়ী। মাসুদ সাহেব, আপনি জানেন কিনা জানি না, সাঈদ কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে সাংঘাতিক দুর্বল। লোকমুখে শুনি, জ্যোতি ভাবীর সাথেও নাকি তার একটা সম্পর্ক ছিল। কে জানে, শায়লা

হয়তো ব্যাপারটা জেনে ফেলে।'

'অসম্ভব কি,' হাসতে শুরু করল রানা। 'কেউ হয়তো শায়লাকে লাগিয়েছে।'

চেরির মিষ্টি হাসি রানার হাসির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল। চেরির মুক্তোর মত সাদা, নিখুঁত দাঁত দেখতে পেল রানা, ওর চোখে মুগ্ধ একটা ভাব ফুটে উঠল। 'জ্যোতি ভাবী কিন্তু ঠিক উল্টো একটা অভিযোগ করে গেলেন, আপনি আসার এই একটু আগে। আমাকে আর সাঈদকে জড়িয়ে কার কাছ থেকে কি যেন শুনেছেন। শায়লা সাঈদকে ছেড়ে চলে গেছে, সেজন্যে উনি আমাকেই দায়ী করলেন। জ্যোতি ভাবীর ধারণা, সাঈদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আমিই নাকি শায়লাকে সিলভার দিকে ঠেলে দিয়েছি।'

'জ্যোতি ভাবীর কথা কে বিশ্বাস করে!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল রানা। 'উনি নিজে কি!'

'ও, তাহলে আপনিও জানেন।' ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল চেরি।

'জ্যোতি ভাবীর স্বভাবের কথা বলছেন? জানে না কে তাই বলুন। তা, এরকম একটা বাজে অভিযোগ করল, আপনি প্রতিবাদ করলেন না?'

তোমাকে আমার মনে ধরছে, রানা।—মনে মনে বলল চেরি। তোমাকে ইচ্ছেমত নাচানো যাবে। বুঝতে পারছি, আমাকে দেখেই তুমি মজে গেছ। বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনিই বা কিভাবে ধরে নিচ্ছেন, এই কাজ আমার দ্বারা হয়নি? জ্যোতি ভাবীর অভিযোগ সত্যিও তো হতে পারে।'

'দূর, এ আমি বিশ্বাস করি না!' প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল রানা। 'মানুষের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। আপনার দ্বারা এধরনের একটা কাজ সম্ভব নয়।'

'আমার চেহারা···আমি বুঝি দেখতে খুব সুন্দর?' প্রশ্নটা করেই খিলখিল করে হেসে উঠল চেরি।

'সুন্দর কিনা, আমি কেন বলব? আপনি নিজেই তো জানেন।'

রানার দিকে আড়চোখে তাকাল চেরি। 'ও বাবা, কথা বলায় আপনি ভারি ওস্তাদ, আপনার সাথে আমি পারব না।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা,' বলল রানা। চিন্তিত দেখাল ওকে।

'জানতে পারি, কি কথা?' কৌতূহল প্রকাশ করল চেরি।

'এ ধরনের অভিযোগ করা উচিত হয়নি জ্যোতি ভাবীর,' বলল রানা। 'শায়লা যদি শোনে, ফলটা কি হবে ভেবে দেখেছেন? জ্যোতি ভাবীকে বিশ্বাস নেই, তিনি নিজেই হয়তো কথাটা শায়লার কানে তুলবেন।'

হাসিটা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল চেরির মুখে। একটু যেন আড়ষ্ট, বোধহয় কৃত্রিম বলেই। 'বলে বলুকগে। ওসব আমি কেয়ার করি না। তবে বলবে বলে মনে হয় না। জ্যোতি ভাবী অত সাহস পাবেন কোথায়, শুনি? সাঈদের সাথে তার কিছু ঘটেনি বলতে চান? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঘটেছে। আর, ছেলে-ছোকরা দেখলে তার মাথা ঘুরে যায়, এ-কথা কে না জানে। আনিস সাহেব, তার স্বামী, এসব যদি শোনেন, নির্ঘাত হার্টফেল করবেন। আনিস সাহেবের

কানে তার কীর্তির কথা কেউ তুলতে পারে, এই ভয় জ্যোতি ভাবীর না থেকেই পারে না।'

'আপনি তো দেখছি ভয়ঙ্কর মেয়ে! না বাবা,' হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল রানা, 'মাফ চাই, আপনার শত্রু হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

'যাকে পেতে চাই তাকে বন্ধু হিসেবে যদি না পাই, তাহলে শত্রু হিসেবে পেতেও আপত্তি নেই,' বলল চেরি। 'কথাটা আমার নয়, কার ঠিক মনে নেই। আমার ব্যাপারটা হলো, মানুষের কয়েকটা জিনিস বিচার করি আমি। সেগুলো যদি মন মত হয়, তাকে আমি বন্ধু বলেই নিই।'

'কয়েকটা জিনিস। যেমন?'

'একটা হলো, নাম,' বলল চেরি। 'নাম বাজে হলে আমার ভয়ানক খারাপ লাগে।'

'অপছন্দের কথা বলছেন, পছন্দের কথা বলুন। তার আগে আরেকবার অর্ডার দিলে হত না, সোডা আর হুইস্কি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিল চেরি। ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেল। 'ডাক নামটা হওয়া চাই দু অক্ষরের। নামের শব্দগুলোয় যুক্তাক্ষর না থাকলে খুব ভাল। লম্বা নাম নয়, ছোট, দুই শব্দের নাম আমার সবচেয়ে পছন্দ।'

'দশের মধ্যে কত পেয়েছি, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দশে দশ,' ঠোঁট টিপে হাসল চেরি।

'তারপর?'

'আরেকটা হলো, চেহারা,' বলল চেরি। 'মোটাসোটা, বেঁটে, কিংবা দৈত্যের মত প্রকাণ্ড চেহারা আমার একদম সহ্য হয় না। পুরুষমানুষ হবে একহারা গড়নের, গায়ে জোর থাকবে, কিন্তু চর্বি থাকবে না। সবচেয়ে অপছন্দ ভুঁড়ি।'

'নম্বর?'

'দশে দশ।'

হাততালি দিল রানা। 'এভাবে নম্বর পেতে থাকলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে যাব। তারপর?'

ওয়েটার সোডা আর হুইস্কি দিয়ে গেল।

'তারপর বিচার করি, চোখ,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল চেরি। 'গভীর মায়াভরা, রঙিন স্বপ্নভরা, একটু সড় সাইজের চোখ আমার পছন্দ।'

হাত তুলে থামার অনুরোধ করল রানা। 'থাক, আর বলবেন না। জানি, এতেও দশে দশ পেয়েছি। সবগুলোতেই ফুল মার্ক পাব। এখন বলুন দেখি, আসল কথাটা কি?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল চেরি। 'সবগুলোয় দশে দশ পাবেন এ আপনার ভুল ধারণা। যেমন, পুরুষমানুষ সিগারেট না খেলে আমার ভাল লাগে না। আপনাকে আমি একটা সিগারেটও খেতে দেখিনি। এতে আপনি দশের মধ্যে পেয়েছেন শন্য। পুরুষদের মধ্যে আরেকটা জিনিস খুঁজি আমি। যারা প্রচুর মদ

খায়, অথচ মাতাল হতে জানে না, এদেরকে আমি দারুণ পছন্দ করি। আপনি মাত্র দু'পেগ খেয়েছেন। কাজেই দশে পেলেন মাত্র দুই।'

'কতটা মদ খেতে পারি, দেখতে চান?'

'নাম ধরলে ক্ষতি কি?' হাসল চেরি। 'আর তুমি বললে? বোঝাই তো যাচ্ছে, আবার আমাদের দেখা হবে, আবার আমরা এই রকম গল্প করব, তুমি হয়তো আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে, তারপর আমি হয়তো তোমাকে একদিন দাওয়াত করে খাওয়াব…'

'আর আমি হয়তো তোমাকে নিয়ে একদিন বেড়াতে বেরুব…'

'লোকে বলবে, ওরা খুব মজায় আছে…'

'তারপর তুমি একদিন বলবে, চলো, আসল কাজটা এবার সেরে ফেলি…'

ভুরু কুঁচকে তাকাল চেরি। 'মানে? আসল কাজটা সেরে ফেলি মানে?'

'বিয়েটা।'

'ছি ছি, তুমি একটা কি!' মুখের চেহারা লালচে হয়ে উঠল চেরির। 'সুযোগ পেয়ে খুব অসভ্যতা করছ, না?'

'সরি,' বলল রানা। 'একটু বোধহয় বাড়াবাড়িই হয়ে গেল।'

কৃত্রিম রাগের সাথে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল চেরি। 'একটু? বোধহয়?'

'না, মানে, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলে স্বাভাবিক পরিণতি যা হয় সেটা ভেবেই বললাম কথাটা। তুমি যদি নিজের ভেতর কারও অস্তিত্ব অনুভব করো, এবং সে জন্যে যদি আমি দায়ী হই, তুমি আমাকে বিয়ের জন্যে চাপ দেবে না?'

'কি!' চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল চেরির।

এদিক ওদিক তাকাল রানা, যেন পালাবার পথ খুঁজছে, ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, 'আবার কোন অন্যায় করে ফেললাম নাকি?'

এরপর, দু'জনেই একসাথে গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

হাসি থামতে চেরি বলল, 'দেখে কিন্তু মনেই হয় না মানুষটা তুমি এতখানি অসভ্য। এই, রাত কিন্তু অনেক হয়েছে, আমি একা ফিরতে পারব না। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে আমাকে।'

'জো হুকুম। কিন্তু তার আগে আরেকবার অর্ডার দেবে না?'

'ও, বুঝেছি, এই সাবজেক্টেও তুমি দশে দশ পেতে চাও, তাই না? ওয়েটার!'

বাড়িতে ফিরে হাতঘড়ি দেখল রানা। রাত একটা বেজে কয়েক মিনিট। কাপড়চোপড় না ছেড়েই ডিভানের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ও। চোখ বুজে খানিকক্ষণ চিন্তা করল, তারপর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে পড়ল, পরপর দু'বার। ডেথ-পিল খেয়ে যে লোকটা সেফ হাউসে মারা গেল, তার জ্যাকেটের পকেট থেকে পাওয়া চিঠি এটা। শেষবার পড়ার পর, আবার ওর

মুখে রহস্যময় একটু হাসি ফুটল। ডিভান থেকে উঠল ও, এগিয়ে গিয়ে টেবিলের কোণায় বসল। ফোনের রিসিভার তুলে একটা নাম্বারে ডায়াল করল ও।

একবার রিঙ হবার পরই অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল সোহেল। রানা জানতে চাইল, 'কথা বলতে পারি, সোহেল?'

'দাঁড়া এক মিনিট পর,' বলল সোহেল। 'রিসিভার নামিয়ে রাখ্ তুই, আমি রিঙ করব।'

দু'মিনিট পর রিঙ হলো। আবার রিসিভার তুলল রানা।

সোহেল বলল, 'বল।'

'ফাঁদটা আমরা সাঈদের ফ্ল্যাটের কাছে পেতেছিলাম,' বলল রানা। 'ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখছিল ওরা। যা হয় আর কি।'

'বলে যা।'

'ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে লোকটার। নরম্যাল টাইপ—টাফ। আমার পিছু নেয় সে, গিলটি মিয়া আর সেতু ঠিক তার পিছনে ছিল। সেই পুরানো নিয়ম—ফলো মাই লীডার।'

'শেষ পর্যন্ত কি হলো?'

'যা হয়েছে বলে ভাবছিস, তাই,' বলল রানা। 'তোর দেয়া ঠিকানায় নিয়ে গেলাম ওকে। কাপুরুষের মত নিজেই কেটে পড়ল, আমি বাধা দিইনি। বোধহয় সায়ানাইড।'

দু'সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'তোকে খুব খুশি লাগছে। কোথাও পৌছুলি?'

'না,' বলল রানা। 'তবে খুব তাড়াতাড়ি পারব বলে মনে হচ্ছে।' তারপর জানতে চাইল, 'ভায়া সিলভা সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারলি তোরা?'

'তার পাসপোর্টটা আসলেই ডিপ্লোম্যাটিক,' বলল সোহেল। 'স্পেন সরকারই তাকে পাঠিয়েছে, খবর নিয়ে জেনেছি। সত্যি সত্যি কয়েকটা বাণিজ্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সে, তবে চুক্তি সই করার কোন দায়িত্ব বা অধিকার তাকে দেয়া হয়নি। প্রস্তাবগুলো আমাদের সরকার বিবেচনা করতে রাজি হয়নি। সে বলে বেড়াচ্ছে, আমাদের সরকার তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। মিথ্যে কথা। আসলে, স্পেন সরকারই ডেকে পাঠিয়েছে তাকে।'

'স্পেন বা অন্য কোথাও থেকে ডোশিয়ার আনাবার ব্যবস্থা করিসনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডোশিয়ার এসে না পৌছুলেও,' বলল সোহেল, 'মাদ্রিদ থেকে আমাদের লোক টেলিফোনে জানিয়েছে, এই লোকের জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তেল আবিব আর জেরুজালেমে প্রায় নাকি যায় সে। ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্স থেকে জানানো হয়েছে, তারাও সিলভাকে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের চর বলে সন্দেহ করে। তবে, স্পেন সরকার এসব কিছুই জানে না।'

'সিলভা তাহলে পালাচ্ছে? খুব মজার ব্যাপার দেখছি।'

'কেন? এর মধ্যে মজার কি দেখলি?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'গ্রেট মাইন্ডস থিঙ্ক অ্যালাইক,' বলল রানা। 'মিসেস জ্যোতির সাথে একটু অভিনয় করতে হয়েছে আমাকে। একটা মিথ্যে কথা বলি তাকে, বলি, সিলভা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কথাটা যে সত্যি, শুনে ভালই লাগছে আমার। ব্যাপারটা আমার জন্যে আরও সহজ হয়ে গেল।'

'বসের সাথে আজ রাতেই কথা হয়েছে আমার,' বলল সোহেল। 'তিনি জানতে চাইছিলেন, কতদূর এগোলি তুই।'

'যত তাড়াতাড়ি তিনি আশা করেন, তার আগেই সব মিটে যাবে—জানিয়ে দিবি,' বলল রানা। 'ভাল কথা—আচ্ছা, বল দেখি, শায়লা এটা একটা কাজ করল? সাঈদকে ছেড়ে সিলভার কাছে চলে যেতে আর সময় পেল না সে? কেমন মেয়ে রে? তাছাড়া ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না?'

'তোর কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে,' বলল সোহেল। 'কারণ সব কথা জানিস না তুই। শোন, শায়লা আমাদের হয়ে কাজ করছে, বুঝলি? সিলভার কাছে আমরাই ওকে পাঠিয়েছি। তোকে বলিনি, বসের প্ল্যানে চমকের কোন কমতি নেই?'

'আচ্ছা!' হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খাওয়ার মত অবস্থা হলো রানার। 'শায়লা তাহলে আমাদের হয়ে কাজ করছে? সত্যি, একখানা প্ল্যান বটে। শালা!'

'কি বললি?'

'এক কথা দু'বার বলি না,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'তুই সবকথা জানিস না তো, তাই ঠিক মত শুনতে পেলেও অর্থ বুঝবি না।'

'রাত দুপুরে হেঁয়ালি না করলেই কি নয়?'

'বাদ দে,' বলল রানা। কাজের কথায় ফিরল আবার। 'আচ্ছা, বুঝতে পারছিস তো, সাঈদ খুব বিপদের মধ্যে আছে? সাঈদের একটা ব্যবস্থা ওদেরকে করতেই হবে। কারণ তালিকাটা যে চুরি করেছে, সেই মেয়েটাকে দেখলে চিনতে পারবে সাঈদ। ওদের জন্যে এটা একটা মস্ত ঝুঁকি। ঢাকা খুব ছোট শহর, যে-কোনদিন মেয়েটাকে দেখে ফেলতে পারে সাঈদ। কিন্তু সাঈদের ব্যবস্থা কাকে দিয়ে করাবে, সেটাই হলো প্রশ্ন। সায়ানাইড দলত্যাগ করার পর ওদের হাতে এ-ধরনের কাজ করাবার মত লোক আর আছে? তোর কি মনে হয়, সোহেল?'

'থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে,' বলল সোহেল। 'জোর করে কিছু বলা যায় না।'

'সিলভা চলে যেতে চাইছে, শায়লা এখন কি করবে? নিশ্চয়ই তার গলা ধরে ঝুলে থাকবে না?'

'একটা সীন-ক্রিয়েট করে সিলভার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসছে শায়লা,' বলল সোহেল। 'হোটেলে উঠবে।'

'সিলভার ব্যাপারে আমাকে কি করতে হবে, বস্ কিছু বলেছেন?'

জানতে চাইল রানা। 'মানে, যখন সময় আসবে…?'

'ভাবছিলাম প্রশ্নটা কখন করবি,' বলল সোহেল। 'হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন বস্। ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট বা ওই ধরনের কিছু হতে হবে—কি বলতে চাইছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস? ওর পাসপোর্টটা ডিপ্লোম্যাটিক। কাজেই, বুঝেশুনে কাজ করবি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'সোহেল, কয়েকজনের হাতের ছাপ দরকার আমার, খুব তাড়াতাড়ি পারবি না?'

'কার কার, নাম বল।'

'মিসেস নাফিজা বেগম আর মিসেস নাসরিন খান,' বলল রানা। 'রঁদেভোর মেম্বার ওরা।'

'ঠিক আছে, পারব,' বলল সোহেল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু মিসেস জ্যোতি আর মিস চেরির ফিঙ্গারপ্রিন্ট চাইলি না যে? ওদেরগুলো দরকার নেই?'

'ওদের দু'জনকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই,' বলল রানা। 'নাসরিন খান আর নাফিজা বেগমেরটা হলেই চলবে।'

'ঠিক আছে। সকালেই একজন লোককে এই কাজের পেছনে লাগিয়ে দেব। সন্ধে নাগাদ পেয়ে যাবি।'

'গিলটি মিয়া ডেলিভারি নেবে,' বলল রানা। 'সন্ধে ছ'টায় দু'নম্বর সেফ হাউস থেকে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল সোহেল। 'খুব খাটতে হচ্ছে, নারে?'

'কিসের খাটনি?' হেসে উঠল রানা। 'সবটাই ফান। বিশ্বাস কর, অনেকদিন হলো সময়টা এভাবে উপভোগ করিনি। কি বলব, আজ সারাদিন একটিবারও সোহান্নার কথা মনে পড়েনি আমার। বুঝতে পারছিস, কি মজায় আছি?'

'শালা!'

'ঈর্ষা হচ্ছে বুঝি?' হাসল রানা। 'ভাল কথা, আমি তো বলেইছি, তুইও একবার সাঈদকে বলে দিবি, কোনমতেই যেন ফ্ল্যাট থেকে বের না হয়। ফ্ল্যাটের ভেতর যতক্ষণ থাকবে, ওকে স্পর্শ করতে পারবে না কেউ। ওখানে আমার লোক আছে। কিন্তু যদি বেরিয়ে আসে, ওর নিরাপত্তার গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না।'

'ঠিক আছে, বলে দেব ওকে। ফান হোক আর যাই হোক, সাবধানে থাকবি, কেমন, রানা?'

'শালা!'

অলস ভঙ্গিতে আস্তে ধীরে পা ফেলে হাঁটছে রানা, সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরছে। ঠিক সাতটায় বাড়িতে ঢুকল ও। বারান্দায় দেখা হলো গিলটি মিয়ার সাথে, ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে সে। তার হাত খালি দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা।

কারণটা বুঝতে পেরে একগাল হাসল গিলটি মিয়া। 'লিয়ে এয়েচি,' রানাকে আশ্বস্ত করল সে। 'রেকে দিয়েচি আপনার বসার ঘরের টেবিলে।'

'মানে?' চট করে ড্রইংরুমের দরজার দিকে একবার তাকাল রানা। দরজা বন্ধ, তালা দেয়া। 'ঢুকলে কিভাবে?'

'হে হে,' গিলটি মিয়ার গলায় কৌতুকের হাসি। 'আপনি, স্যার ভুলে গেচেন।'

'কি ভুলে গেছি?' এবার ধমক লাগাল রানা।

ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা মাথার পিছনটা চুলকাল গিলটি মিয়া। সরল দু'চোখে সলজ্জ একটা ভাব। আমতা আমতা করে বলল, 'মানে, আপনি ভুলে গেচেন, কুনো এক সোমায় ইসব কাজে পাকা ছিলুম আমি।' দরজার দিকে একবার তাকাল সে, 'ইসব তালা…এনি টাইম…' কথা শেষ না করে চেহারায় তাচ্ছিল্যের একটা ভাব আনল সে। পকেট থেকে সরু একটা তার বের করে রানাকে দেখাল। 'এটা দিয়ে খুলে ফেললুম।'

'প্যাকেটটা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেই পারতে,' একটু নরম হলো রানা। পকেট থেকে চাবি বের করে কী হোলে ঢোকাল ও। কবাট খুলে ড্রইংরুমে পা রাখল।

পিছু পিছু ঢুকল গিলটি মিয়া। 'মোড়কটার ভেতর মেটাই আচে না মণ্ডা, সাপ আছে না ব্যাঙ, আমি জানি? ভাবলুম তালার ভেতর রাকলে কুনো ব্যাটা চোরের ওপর বাটপারি কোত্তে পারবে না।'

টেবিলের ওপর প্যাকেটটা দেখল রানা। ফিরল গিলটি মিয়ার দিকে। জানতে চাইল, 'ওদিকের খবর কি?' জানে, গিলটি মিয়া বা তার লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে একটা পিঁপড়েও সাঈদের ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারবে না।

সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবড়োখেবড়ো চেহারা। বলল, 'বিশ্বেস না হয় আপনি নিজে একবার চেষ্টা করে দেকতে পারেন, স্যার। আমি তিন তিন বার চেষ্টা করে দেখেচি। একবার কানা ফকির সেজে, একবার মেয়েলোক সেজে, আরেকবার দাড়িওয়ালা মোলবী সেজে। ফেলাটের দোরেও পৌঁচুতে পারিনি, সিঁড়ির গোড়া থেকে দূর দূর করে তেড়িয়ে দিয়েচে।' শিষ্যদের পরীক্ষা করতে গিয়ে দু'চার ঘা-ও যে খেয়েছে গিলটি মিয়া, সেটা সে চেপে গেল।

'তোমাকে না হলেও ওদের তাহলে চলে?'

'আর কুনো ধান্দা পেলে খুশিই হতুম, স্যার।'

'সেতু ইঞ্জিনিয়ার একটা কাজের জন্যে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে,' বলল রানা। 'কথাটা কেন বললে? এই কাজটা তোমার ভাল লাগছে না?'

মাথার পিছনটা চুলকে খানিক ইতস্তত করল গিলটি মিয়া, তারপর বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিগেস করব, স্যার?'

রানা অপেক্ষা করছে।

'সাঈদ সাহেব বোদায় কেউকেটা গোচের কেউ লয়, না স্যার?'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা।

'না···মানে, এত ঢাকঢোল পিটিয়ে, এত তোড়জোড় করে পাহারা বসালুম,' বলল গিলটি মিয়া, 'কিন্তু কোতায়, কেউ তো সায়েবকে খুন কোত্তে এলোনি।' বেশ একটু হুতাশই মনে হলো তাকে।

হেসে উঠল রানা। তারপর বলল, 'তোমার ধারণা ঠিক নয়। এমনও তো হতে পারে, যারা খুন করতে আসবে তারা তোমাদের ভয়ে দূরে সরে আছে।'

ধারণাটা ভারি পছন্দ হলো গিলটি মিয়ার। 'অসম্ভব লয়, কিচুই অসম্ভব লয়,' বলল সে, মাথা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল রানা। প্যাকেটটা খুলল। ছবিগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে মন দিল রিপোর্টে। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। যা যা আন্দাজ করেছিল, সব মিলে যাচ্ছে। প্যাকেটটা কিচেনে নিয়ে এল ও। দু'একটা জিনিস দরকার হবে, সেগুলো রেখে দিয়ে বাকি সব পুড়িয়ে ফেলল।

হাতে ধূমায়িত এক কাপ চা নিয়ে ড্রইংরুমে ফিরে এল রানা। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে অন করল কালার টিভি। একটা মেয়ে গান গাইছে। সোহানার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ভাবল, এই মুহূর্তে কি করছে সে? তারপর, সোহানার কথা ভাবতে ভাবতে, কখন থেকে যে চেরির কথা ভাবতে শুরু করেছে, নিজেও বলতে পারবে না।

চায়ের কাপে চুমুক দিল রানা। চেরির কথা ভাবছিল, কিন্তু মনের আরও গভীর থেকে অন্য একটা কথা মাথাচাড়া দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখার সময় উঠে এল কথাটা। হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ···ইতিহাস নিজেকেই পুনরাবৃত্তি করে। আপনমনে হাসতে লাগল রানা। কথাটা মনে জেগে ওঠার সাথে সাথে পরবর্তী কাজের একটা খসড়া ছক তৈরি করে ফেলল ও। ভাবল, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করলে তার অনেক ঝামেলা কমে যায়।

এরপর হেদায়েত খানকে নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল রানা। লোকটার জীবন, কাজ আর মৃত্যু, সব মিলিয়ে একটা প্যাটার্ন পাওয়া যায়। কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, সব খাপে খাপে মিলে যায়। টাকা আর ভোগ-বিলাসের লোভ লোকটাকে এই পথে নিয়ে এসেছিল। টাকার লোভে এমন এক প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছিল, যে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তার নিয়তি নির্ধারণের একক ক্ষমতার অধিকারী। কর্মকর্তারা তাকে ধারণা দেয়, তুমি সবই জানো, কিন্তু আসল কথাটাই তাকে জানতে দেয়া হয়নি।

আসল কথাটা ছিল হেদায়েতের জীবন মৃত্যু। কখন মরতে হবে হেদায়েতকে, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স জানত। কিন্তু হেদায়েত জানত না।

বাংলাদেশে একটা স্পাই রিঙ তৈরি করার জন্যে যা যা করা দরকার, সব করার অধিকার ছিল হেদায়েতের। নিজের ইচ্ছেমত কাজ করার স্বাধীনতা ছিল তার, যত ইচ্ছে টাকা খরচ করতেও তাকে বাধা দেয়া হয়নি। সবই তার ছিল, ছিল না শুধু ইচ্ছেমত বেঁচে থাকবার অধিকার। আগ্নেয়গিরির মুখে

বসবাস ছিল তার, যেখানে সামান্যতম ভুলের মাসুল হচ্ছে মৃত্যু। এটা খুব ভাল করেই বুঝত হেদায়েত, তার সম্ভবত এ-কথাও জানা ছিল যে কর্মকর্তাদের কাছে তার প্রাণের কোন মূল্য নেই। তার আন্ডারে যেসব অপারেটররা কাজ করত, তার কাছে তাদেরও প্রাণের ঠিক যেমন কোন মূল্য ছিল না। ইহুদি গুপ্তচরবৃত্তির এই-ই হলো ধারা।

আবার সোহানার কথা মনে পড়ল। তার কাছে ফিরে যেতে হবে ওর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তারমানে, সময় হয়েছে, হাতের কাজটা শেষ করা দরকার। সব এলোমেলো হয়ে আছে, গোছগাছ করে দিতে হবে। পরস্পরের সাথে জোড়া দিতে হবে প্রান্তগুলো। এসব সেরে, সোহানার কথা ভাববে ও। ফিরে যাবে তার কাছে। আরেকটু গভীর করে জানবে তাকে।

হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল রানা। ডায়াল করল।

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিল সেতু ইঞ্জিনিয়ার, 'ইয়েস?'

'তোমার একটা কাজ আছে, সেতু,' বলল রানা।

উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করল সেতু, 'কি কাজ, মাসুদ ভাই?'

'সিলভার ওপর চোখ রাখবে তুমি,' বলল রানা। 'একেবারে ছায়ার মত লেগে থাকতে হবে।'

'সাথে লোক চাই।'

'হ্যাঁ, একার কাজ নয়। তুমি গিলটি মিয়ার সাথে যোগাযোগ করো। এখন থেকেই কাজটা শুরু করছ তোমরা। সিলভা যদি বেরোয়, খোঁজ রাখো কোথায় যায় সে। কখন ফেরে সেটাও লক্ষ রাখবে। পালাবার তালে আছে সে, কাজেই কেনাকাটা ইত্যাদি কাজে ছুটোছুটির মধ্যে থাকবে। আর শোনো, সোহেলের সাথেও যোগাযোগ রাখবে তুমি। ও জানবে আমি কোথায় থাকব না থাকব। সব বুঝেছ?'

'বুঝেছি, মাসুদ ভাই,' বলল সেতু। 'আর কিছু?'

'আপাতত এই,' বলল রানা। 'গুডনাইট, সেতু।' রিসিভার রেখে দিল।

ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করল রানা। কিভাবে কি করবে, ভেবে ঠিক করে নিচ্ছে। পুরো দশ মিনিট লাগল। প্ল্যানটা মন্দ নয়, ভাবল ও, কিন্তু সাফল্য নির্ভর করবে সুযোগের ওপর। ওর যখন আমেরিকায় ফিরে যাবার তাড়া রয়েছে, দু'একটা চান্স নিয়ে দেখলে ক্ষতি কি!

আবার ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা। সোহেল নয়, তার প্রাইভেট সেক্রেটারি পারভিন সাড়া দিল। রানার গলা পেয়ে হাসল সে, বলল, 'এত করে বললাম, কই, একদিন তো আমাদের বাড়িতে এলেন না!'

'সোহেল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। পারভিনের চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। গোলগাল জাপানী পুতুল একটা।

'সাততলায়,' বলল পারভিন। 'কি, আমার অভিযোগের জবাব দিলেন না যে?'

পারভিনের চেহারায় রাগ রাগ ভাব কল্পনা করতে পারল রানা।

'তোমাকে তো বলেইছি, পারভিন, তুমি আমাকে পছন্দ করলে কি হবে, তোমার শিল্পপতি বাবা জামাই হিসেবে আমাকে…'

'ছি ছি' তীব্র প্রতিবাদ জানাল পারভিন। 'বাড়িতে ডেকেছি, আর তার বুঝি এই অর্থ করেছেন আপনি?' তারপর, হঠাৎ করেই রসিকতাটা ধরতে পারল সে। 'আমাকে বলেছেন? ওহ্ মাসুদ ভাই, আপনি যে একটা কি!'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'ভুল করে ফেলেছি। তোমাকে নয়, রুমানা বা ইলোরা কিংবা আর কাউকে হয়তো কোনদিন বলেছিলাম কথাটা।'

খিল খিল করে হেসে উঠল এবার পারভিন। হঠাৎ হাসিটা থেমে গেল, পরিবর্তে একটা পুরুষ কণ্ঠ বিস্ফোরিত হলো রানার কানে, 'শালা বেয়াদপ! ভাদুরে কুকুর! সুযোগ পেলেই যার তার সাথে প্রেমালাপ! তোর জ্বালায় ভদ্রঘরের মেয়েরা দেখছি আর অফিসে চাকরি করতে পারবে না!'

'বারে, আমার কি দোষ!' সাধু সাজল রানা। 'পারভিনকেই জিজ্ঞেস করে দেখ্ না…'

'চোপ!' গর্জে উঠল সোহেল। 'এই জঘন্য বিষয়ে তোর সাথে আমি আর একটা কথাও বলতে চাই না।'

'ছবিগুলো পাঠিয়েছিস বলে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'বোঝা যায়, আমি অফিসে না থাকলেও, তোরা আজকাল কাজটাজ করছিস।'

'ওদের আঙুলের ছাপ চাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ ছিল তোর,' বলল সোহেল। 'নিশ্চয়ই কাউকে সন্দেহ করছিলি। ছবিগুলো দেখে কি বুঝলি, তোর সন্দেহই ঠিক?'

'অনেকটা,' বলল রানা। 'হাতে কিছু প্রমাণ এসেছে, এখন আমি অ্যাকশনে যাব।' দু'সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল ও, 'একটা কথা, অফিসে সোহানার কোন মেসেজ এসেছে কিনা জানিস?'

'হ্যাঁ, এসেছে,' বলল সোহেল। 'সোহানা জানিয়েছে, কয়েকটা সমস্যা দেখা দেয়ায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে ওকে। তুই না পৌঁছুলে কাজ এগোবে না।'

'তোর কি ধারণা? সত্যিই কি তাই? নাকি আমাকে কাছে পাওয়ার মতলব?'

'কি মনে করিস নিজেকে তুই? ভেবেছিস, দুনিয়ায় যেখানে যত মেয়ে আছে সবাই তোর পথ চেয়ে বসে আছে? শালাকে নিয়ে আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল দেখছি।' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল সোহেল, 'কাজের কথা আর কিছু বলবি?'

'রঁদেভোয় আজ ডিনার খাব,' বলল রানা। 'সেতুকে বলেছি, সিলভার ওপর নজর রাখছে সে। সিলভা খুব তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করবে বলে আশা করছি আমি। যদি কিছু ঘটে, সেতু তোর সাথে যোগাযোগ করবে। তোর কাজ হলো, সাড়ে ন'টার পর, তার আগে নয়, রঁদেভোয় আমাকে ফোন করা। কারও পাল্লায় পড়ে ওখানে সময়টা নষ্ট করতে চাই না। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি,' বলল সোহেল। 'কিন্তু আসল কথাটা বল্ তো। ঠিক কি

করতে যাচ্ছিস?'

'যা ঘটবে দেখতেই তো পাবি, একটু ধৈর্য ধর।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। এক মিনিট পর আবার সেটা তুলল। ডায়াল করল চেরির নাম্বারে।

একটু দেরি করে রিসিভার তুলল চেরি। মার্জিত সুরে জানতে চাইল, 'হ্যালো?'

'আমি রানা।'

'জ্বী?' যেন ঠিকমত শুনতে পায়নি। 'জোরে বলুন।'

'মাসুদ রানা,' বলল ও।

'সরি, রঙ নাম্বার...'

কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল রানার চোখে। 'রঙ নাম্বারই দরকার আমার! কেমন আছ?'

'কি যেন নাম বললেন?'

'মাসুদ রানা।'

'এ নামের কাউকে আমি চিনি না,' বলল চেরি।

'সত্যি তাই, আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'কোথাও এসো না, পরিচয় হবে। কেন যেন তোমার জন্যে মনটা উতলা হয়ে আছে। আমার ঠোঁটে কিছু মধু জমেছে, তোমার কানে বর্ষণ করার ইচ্ছে রাখি। ডিনার খাওয়াব।'

খিল খিল করে হেসে উঠল চেরি। হাসতে হাসতেই বলল, 'আর পারলাম না। কিন্তু রানা, আমার যে একটা এনগেজমেন্ট আছে!' দু'সেকেন্ড চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'ঠিক আছে, ওটা বাদ। তুমি জানতে ওটা আমি বাতিল করব তাই একেবার শেষ মুহূর্তে চাইছ আমাকে, তাই না।'

'আমি ডাকলে কোন মেয়ে না এসে পারবে না, এটুকু আত্মবিশ্বাস তো আছেই,' বলল রানা। 'লোকটা কে জানি না, তার চেয়ে আমাকে বেশি গুরুত্ব দিলে বলে ধন্যবাদ, চেরি।'

'লোক নয়, মেয়েলোক,' বলল চেরি। 'রাগ করবে, সে অধিকার তার নেই। কোথায় আমরা ডিনার খাব, রানা?'

'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক না কেন? যেখানে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সেই রঁদেভোয়? ওখানে তুমি আমার সাথে ন'টায় দেখা করো।'

'কিন্তু তুমি তো রঁদেভোর সদস্য নও। সেদিন অনধিকার প্রবেশ করেছিলে। আজ?'

'তোমার গেস্ট বলে চালিয়ে দিয়ো।'

'জো হুকুম, জাহাঁপনা,' সহাস্যে বলল চেরি। 'আমি আমার সবচেয়ে ভাল কাতানটা পরে আসব।'

'এ থেকে আমি কি ধরে নেব,' জানতে চাইল রানা, 'তুমি আমার চোখে সুন্দর হয়ে ধরা দিতে চাও।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল চেরি। তারপর বলল, 'তুমি কেমন মানুষ,

এখনও আমি ঠিক ধরতে পারিনি, রানা। মেয়েদের খুশি করতে পারা, এই গুণটা তোমার আছে। তোমার হাত সুন্দর, তোমার চোখ সুন্দর, মেজাজটাও নরম—কিন্তু তবু কেন যেন মনে হয় তুমি মানুষটা বেশ একটু অদ্ভুত।'

'শুনতে মজাই লাগছে,' হেসে উঠল রানা। 'আর কি মনে হয়?'

'যাকে অদ্ভুত মনে হয়, তাকে নিয়ে বেশি কিছু চিন্তা করা যায় না—স্বপ্ন দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। নিজের ওপর আস্থা থাকা ভাল, সেটা তোমার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে—যা বোকাদেরও থাকে। এই, তুমি আবার ভেবে বোসো না, আমি তোমাকে বোকা বলছি।'

'বললেও আমি কিছু মনে করব না, কারণ মেয়েদের ব্যাপারে সত্যি আমি বোকা—ওদের আমি বুঝি না।'

'সেটা দেবতারাও বোঝেননি,' হেসে উঠে বলল চেরি।

'তোমার ব্যাপারে এবার আমি একটা মন্তব্য করি?' অনুমতি চাইল রানা।

'গো অ্যাহেড!'

'তুমি সত্যি সুন্দর।'

'ওহ্ থ্যাঙ্ক ইউ, মি লর্ড,' বলল চেরি। 'ইউ আর অফুলি কাইন্ড।'

'ওটাই আমার মস্ত দুর্বলতা,' বলল রানা। 'মেয়েদের কষ্ট সইতে পারি না। ওদের ব্যাপারে একটু বেশি নরম।'

'লাইক হেল ইউ আর,' বলল চেরি। 'ন'টায় দেখা হচ্ছে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। পায়চারি শুরু করল ও। খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে আসছে।

সোফার কিনারায় শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে দ্য সিলভা, এক হাতে ককটেল আরেক হাতে সিগারেট। এখন যেহেতু একা, সদাহাস্যময় চেহারাটা বদলে গেছে, কয়েকটা রেখা ফুটে উঠে কঠোর দেখাচ্ছে মুখ। সিগারেট ধরা আঙুল দুটো মাঝে মধ্যে কাঁপছে।

শেষ চুমুক দিয়ে হাতের গ্লাসটা তেপয়ের ওপর নামিয়ে রাখল সে, সোফা ছেড়ে কার্পেটের ওপর পায়চারি শুরু করল। নিজের কাজের কথা ভেবেই তার মনে হলো, মানুষের করারও একটা সীমা আছে। সাধ্যের অতিরিক্ত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

মানুষকে আকৃষ্ট করার একটা ক্ষমতা আছে তার, বিশেষ করে মেয়েদের, আর স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে চক্রান্ত করতে তার ভাল লাগে। প্রথম দিকে এগুলোকে সে ব্যক্তিস্বার্থে কাজে লাগাত। পরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বড় পদে উঠে আসায় তার সাথে বিদেশী কূটনীতিকদের পরিচয় হয়। তাদেরই একজন তাকে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেয়। অল্পদিনে ধনী হবার এর চেয়ে সহজ রাস্তা আর নাকি হয় না। মানুষের কাছে রহস্যময় হয়ে থাকার প্রবণতা, ঝুঁকি নেয়ার সাহস, বিপদ আর উত্তেজনার মধ্যে বসবাস করার নেশা, তার ওপর বিলাসবহুল জীবনের প্রতি লোভ তাকে এই পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করে। সেই যে জড়িয়ে পড়ল, তারপর আর জাল কেটে বেরুবার

সুযোগ হলো না। এই গোপন কাজটা করে এখনও সে আনন্দ পায়। কিন্তু সুইস ব্যাংকে প্রচুর টাকা জমেছে বলে এখন আর অসম্ভব সব ঝুঁকি নিতে মন চায় না। যদি ধরা পড়ে জেল খাটতে হয়, যদি হঠাৎ করে মরে যেতে হয়, এই টাকা কার ভোগে লাগবে?

যদিও ধরা পড়ার ভয় তার নেই বললেই চলে। তার ধারণা, সে যে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করছে এ-কথা কাকপক্ষীও জানে না। আর, কখনও যদি কোন অসুবিধে দেখা দেয়, তার ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট তাকে রক্ষা করবে।

ঢাকার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পেশায় যে বিপদ আছে, সেটা জানত সিলভা, কিন্তু এই প্রথম বিপদের ধরনটা আঁচ করতে পারছে সে।

আপনমনে একটু হাসল সিলভা। একজনের পুরোপুরি সহযোগিতা না পাওয়ায় এখানে একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে। কিন্তু তাতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। এই বিপদ থেকে নিজেকে সে রক্ষা করতে পারবে। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকলে এরচেয়ে জটিল অবস্থা থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়া যায়।

শায়লার কথা মনে পড়ল তার। তার মনের গভীরে একটা খটকা আছে, একটু সন্দেহ—শায়লার ব্যাপারটা ঠিক যেন বোধগম্য নয়। মেয়েটা সত্যিই কি···কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিল সে। এখন আর কিছু এসে যায় না। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে তার। নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে সে। ফিরে যাবে স্পেনে। তবে, শায়লার সাথে যদি ব্যাপারটা সম্ভব হত, মন্দ হত না—মেয়েটা সরল, অর্থাৎ বোকা, কিন্তু শরীরটা দারুণ, মাস কয়েক খুব মজা করা যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

মোটামুটি তার কাজ ভালভাবেই শেষ করেছে সে। প্রতিভার স্বাক্ষর হয়তো রাখতে পারেনি, কিন্তু তার ভূমিকায় উতরে যাবার মত অভিনয় করেছে সে।

পায়চারি থামিয়ে হাতঘড়ি দেখল সিলভা। সাড়ে আটটা। শায়লা শপিং করতে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। আর দেরি করার কোন মানে হয় না। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শায়লাকে লিখতে শুরু করল।

বাইরে কোথাও গভীর অন্ধকার, কোথাও আলোছায়া। সন্ধে থেকেই বাতাস দিচ্ছে, বৃষ্টি হতেও পারে নাও পারে। রাস্তার উল্টোদিকের একটা বাড়ির বাগানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে ওরা—সেতু ইঞ্জিনিয়ার আর গিলটি মিয়া। দু'জনেই তাকিয়ে আছে ওপারের ফ্ল্যাট বাড়ির গেটের দিকে।

ফিসফিস করে কথা বলছে গিলটি মিয়া। সিলভার ওপর মহা খাপ্পা সে। 'লোকটা বুজি বিদেশী গুণ্ডা? দেশী গুণ্ডা ভাত পায় না, বিদেশী গুণ্ডা কি মনে করে এয়েচে বলুন দিকি! ঠিক আচে, বেরোক রাস্তায় যা কামিয়েছে পকেট

মেরে সব উঠিয়ে নিয়ে আসবোখন। ইচ্ছে যায় ব্যাটার পোঁদে আগুন ধরিয়ে দিই, রাস্তার মাজখানে নাচানাচি করুক…'

'চুপ!' সাবধান করল সেতু।

উল্টোদিকের ফ্ল্যাট বাড়ির গেট থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল প্রৌঢ়া এক মেয়েলোক। হাতে দুটো সুটকেস। গাড়ি বা রিকশার খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল সে।

'সিলভার কাজ করে, চাকরানী,' বলল সেতু। 'সিলভা বোধহয় কেটে পড়ার মতলবে আছে।'

এবার গেট থেকে বেরিয়ে এল সিলভা, হাতে একটা সুটকেস। মেয়েলোকটার সাথে কথা বলল সে। রাস্তার দু'দিকটাই অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, রিকশা বা গাড়ি কিছুই নেই।

'বাচাধোনকে হাঁটতে হবে,' বলল গিলটি মিয়া।

মাথা ঝাঁকাল সেতু। 'গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছে না, কারণ ওটা রেন্ট-এ-কার কোম্পানীর। এখানে ডেলিভারি দিয়েছে, এখান থেকেই ফেরত নিয়ে যাবে।'

মেয়েলোকটাকে আবার কিছু বলল সিলভা। সুটকেস দুটো নিয়ে গেটের ভেতর ঢুকল প্রৌঢ়া, অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওগুলো পরে কেউ পৌছে দেবে, বা সিলভা নিজেই এসে নিয়ে যাবে,' বলল সেতু।

হাতের সুটকেসটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করল সিলভা।

'তুমি এখানেই থাকো,' গিলটি মিয়াকে বলল সেতু। 'ফ্ল্যাটে কেউ যদি আসে, নিচের তলা থেকে ফোন করবে আমাকে।'

'ঠিক আচে,' বলল গিলটি মিয়া।

বাগান থেকে নিচু পাঁচিল টপকে রাস্তায় নামল সেতু। সিলভার পিছু নিল। নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টাই করল না সে। তার পায়ের আওয়াজ শুনতে দিল সিলভাকে।

দু'একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সিলভা।

সিলভার ফ্ল্যাটে ফিরতে বেশ অনেকটা রাত হয়ে গেল শায়লার। ড্রইংরুমে ঢুকে প্রথমেই তার চোখ পড়ল ড্রেসিং টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখা এনভেলাপটার ওপর। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এসে এনভেলাপটা নিল সে। ভেতর থেকে কাগজটা বের করে পড়তে শুরু করল।

সিলভা লিখেছে—

'প্রিয়তমা শায়লা,

'আমি চলে যাচ্ছি। আর দেখা হবে বলে মনে হয় না। আমাকে দেখতে পাবার আশা নিয়ে তুমি ফিরে আসবে, আমি জানি! জানি, তুমি আশা করছ, এখনও তোমাকে কিছু বলার আছে আমার। তোমার ম্লান করুণ চেহারা দেখতে চাই না, তাই এখুনি আমি চলে যাচ্ছি। কারণ আমি

জানি, যে সমস্যাটা আমাদের দু'জনকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তার কোন সমাধান নেই।

'আরও কিছুদিন যাতে এই দেশে থাকতে পারি, তারজন্যে গত কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি আমি। আমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি আর এ দেশে থাকতে পারি না। কাক ভোরের ফ্লাইটেই ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে। ফ্ল্যাটে আমার দু'একটা জিনিস রয়ে গেল, ওগুলো আমি রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে এসে নিয়ে যাব। ইতোমধ্যে, আমি জানি, তুমি চলে যাবে। চলে যাবার জন্যে সব তুমি গোছগাছ করে রেখেছ, সেটা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

'শব্দ আর বাক্য দিয়ে আমার প্রেমের গভীরতা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, শায়লা। আমার অন্তরে কোথায় তোমার স্থান, আমি আর অন্তর্যামী ছাড়া কেউ তা জানবে না। যে পরিস্থিতি আমাদের দু'জনকে এক হতে দিল না, সেটা মানুষেরই সৃষ্টি। তাই, মানুষকে আমি ঘৃণা করি। তোমাকে আমার চিরকাল মনে থাকবে। তোমার রূপ-লাবণ্যের একটা ছবি আমার মনে সব সময় আঁকা থাকবে। শুভেচ্ছা রইল। দুর্ভাগা,

দ্য সিলভা।'

চিঠিটা আরেকবার পড়ল শায়লা। তারপর এনভেলাপের সাথে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। ভেবে অবাক হলো শায়লা, যে লোক বিশ্বাস করাবার মত করে মিথ্যে বলতে শেখেনি, তাকে ভিন দেশে গুপ্তচর করে পাঠানো হয় কি করে?

আপন মনে মিটি মিটি হাসল শায়লা। যাক বাবা, আপদ বিদায় হয়েছে। এবার তাকে কর্তার মান ভাঙাবার সাধনায় বসতে হবে।

টেলিফোনের সামনে এসে দাঁড়াল শায়লা। রিসিভার তুলে ডায়াল করল। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল একটা মেয়ে। সোহেলকে বলার জন্যে একটা মেসেজ দিল ও।

## দশ

রঁদেভোয় ঢুকে মিউজিক রুমে উঁকি দিল রানা। চেরিকে কোথাও দেখল না। নতুন মুখ দেখে অনেকেই ওর দিকে তাকিয়ে থাকল, তাদের মধ্যে দু'জনকে চিনতে পারল ও। নাফিজা আর নাসরিন। এদের ফটো দেখেছে রানা।

প্যাসেজ ধরে হলঘরের দিকে এগোল ও। এয়ারকুলার নেই বলে ওখানে কেউ বাধ্য না হলে বসে না। দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই চেরিকে দেখতে পেল রানা। গোটা হলঘর প্রায় অন্ধকারে ঢাকা, শুধু এক কোণে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। একটা চেয়ারে ল্যাম্পের প্রায় সবটুকু আলো গায়ে মেখে পটে

আঁকা ছবির মত বসে আছে চেরি। রানার অপেক্ষায় দরজার দিকেই তাকিয়ে ছিল, চোখাচোখি হতে ঝিক করে উঠল মুক্তোর মত সাদা দাঁত, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মনোলোভা চেহারা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সব ভুলে চেরির রূপে মুগ্ধ হয়ে থাকল ও। ধূসর রঙের একটা কাতান পরেছে চেরি। মায়াভরা, বিষাদমাখা চোখ দুটোর সাথে শাড়ির রঙটা মানিয়ে গেছে। চুল বাঁধেনি সে, এলো চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। নাকে মুক্তো বসানো ছোট্ট একটা নাকফুল পরেছে। গলায় বাবুই পাখির বাসা আকৃতির একটা লকেট সহ সরু চেইন।

'আমার আগেই পৌঁছে গেছ দেখছি!' বলল রানা।

'তাই বলে ভেব না তোমার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে গেছি আমি,' হাসতে হাসতে বলল চেরি।

হেসে উঠল রানা। 'আমাকে ভাবতে হবে কেন, আসল কথাটা তোমার চেহারাই তো বলে দিচ্ছে।'

'আমার চেহারা?' বিস্ময়ভরা চোখ তুলে তাকাল চেরি, একটা হাত আলতো করে মুখে ছোঁয়াল।

'অনেক সময় নিয়ে সেজেছ, দারুণ সুন্দর লাগছে তোমাকে, চেরি। দেখেই ইচ্ছে হলো...'

'কি ইচ্ছে হলো?' বাধা দিয়ে দ্রুত, সাগ্রহে জানতে চাইল চেরি।

চেরির পাশের একটা চেয়ারে বসল রানা। 'না, থাক। তুমি আবার কি না কি মনে করবে।'

'কিছুই মনে করব না, তুমি বলো।' অনুরোধ করল চেরি।

'নাহ্, থাক।'

'কিচ্ছু মনে করব না,' আদুরে গলায় বলল চেরি। 'প্লীজ, বলো।'

'বলব?'

'প্লীজ!'

'লজ্জা পাবে না তো?'

মুখের চেহারা একটু লাল হলো চেরির। 'ন্‌না।'

'ইচ্ছে হচ্ছিল,' বলে পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল রানা, প্রায় কাছে চলে এসেছিল একজন ওয়েটার, হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিল, '...ইচ্ছে হচ্ছিল, দু'আঙুলে তোমার নাকের ডগাটা চেপে ধরি...'

রেগে বোম হয়ে গেল চেরি। 'এই তোমার ইচ্ছে! এটা কি একটা ইচ্ছে হলো?'

'আহা, চটো কেন,' বলল রানা। 'এখানেই তো শেষ নয়।'

রানার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল চেরি। 'শেষ করো তাহলে।'

'তারপর, মানে আঙুল দিয়ে তোমার নাকের ডগাটা চেপে ধরার পর, তোমার ওই কমলালেবুর কোয়ার মত ঠোঁটে,' গলা একেবারে খাদে নামিয়ে আনল রানা, '...খুব জোরে, আর অনেকক্ষণ ধরে, বুঝলে,' চেরির চোখে চোখ রেখে বলছে ও, 'একটা চুমো খাই।'

সাথে সাথে কিল তুলল চেরি, চাপা গলায় চিৎকার করে বলল, 'ওরে অসভ্য! আমারও ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে আচ্ছামত কিলাই!'

'ওয়েটার!' হাঁক ছাড়ল রানা।

তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে নিজেকে সামলে নিল চেরি।

ওয়েটার আসতে প্রথমে ড্রিঙ্ক, তারপর ডিনারের অর্ডার দিল রানা। বলল, 'এক কোণের একটা টেবিল চাই আমাদের।'

ওয়েটার চলে যেতে চেরি বলল, 'ব্যাপারটা কি বলো তো? বাতাসে কিসের যেন আভাস পাচ্ছি। তোমার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠছে চাপা একটা উত্তেজনা। কি একটা ঘটেছে। আমাকে বলবে না?'

গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। চুপ করে থাকল।

'কি হলো?' কনুই দিয়ে রানার পাঁজরে খোঁচা দিল চেরি। 'চেহারা অমন হাঁড়ি করে ফেললে কেন?'

'না…মানে, তোমাকে কতটা বিশ্বাস করা যায় বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। চেরির চোখে চোখ রেখে যেন তার মনের গভীরে দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করল ও। 'ভাবছি, তোমাকে কিছু বলা উচিত হবে কিনা। তোমার সম্পর্কে তেমন কিছুই আমি জানি না। কিভাবে তোমাকে বিশ্বাস করি, বলো?'

'তা তো বটেই,' অভিমানে ম্লান হয়ে উঠল চেরির মুখ। 'কিইবা জানো আমার সম্পর্কে। কেন-ই বা বিশ্বাস করবে আমাকে! শুনে খুব খুশি হলাম!'

'সত্যি কথাটা বললাম, পছন্দ করো বা না করো,' বলল রানা। তারপর কি মনে করে আপনমনে হাসতে লাগল ও।

'কেন হাসছ সেটাও কি বিশ্বাস করে বলতে পারো না আমাকে?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে চেরির, মনে হলো যে কোন মুহূর্তে টেবিল ছেড়ে চলে যেতে পারে সে।

'সেদিন সাঈদ আর শায়লার কথা আলাপ করছিলাম না? ওদের সম্পর্কে এমন মজার কথা জানি আমি, শুনলে তুমি আকাশ থেকে পড়বে,' বলল রানা। 'সেদিনই তো বুঝতে পেরেছ, সাঈদ সম্পর্কে মনটা আমার খুঁত খুঁত করছিল। কোন ব্যাপারে কৌতূহল হলে, আমি এমন এক মানুষ, সেটার খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপার জেনে তবে ছাড়ি।'

'আমাকে যখন বিশ্বাসই করো না, এসব কথা শোনাচ্ছ কেন?' ঝাঁঝের সাথে বলল চেরি।

'বিশ্বাস করি না, তা কিন্তু একবারও বলিনি, বলেছি, বিশ্বাস করব কিনা বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। তারপর চেরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভুলেও কাউকে বলবে না তো?'

চুপ করে থাকল চেরি।

'কি হলো?'

'বলব না, বলব না, বলব না—হয়েছে?' এতক্ষণে আবার হাসল চেরি। 'সাঈদ সম্পর্কে তোমার সমস্ত কৌতূহল তাহলে মিটেছে? ওর সম্পর্কে সবাই তো সব কিছু জানে, নতুন কি আর জানার আছে, শুনি?'

'বলব, সবই বলব,' জানাল রানা, 'কিন্তু এখন নয়। তার আগে ডিনার খাব আমরা।'

'তুমি একটা আজব লোক,' অসন্তুষ্ট দেখাল চেরিকে। 'তোমার সব কিছুতে শুধু রহস্য।'

'কি বলছ? কক্ষনো না! দুনিয়ার সবচেয়ে সরল আর সাদা মনের মানুষ আমি।'

'এক একবার তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আরও অনেক ব্যাপার আছে, যেগুলো মেলাতে পারি না,' বলল চেরি।

'যেমন?'

'লক্ষ্য করেছি, দুনিয়ার সব ভাল জিনিসের দিকে টান তোমার, ভাব দেখে মনে হয়, ওগুলো তুমি পেয়েও অভ্যস্ত। ভাল খাবার, ভাল কাপড়, দামী মদ, সুন্দরী মেয়ে—সবই যেন তোমার দরকার। কিন্তু মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সে একটা চাকরি করে এসব ম্যানেজ করো কিভাবে?'

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে,' সহাস্যে বলল রানা। 'সব একসাথে যদি বলি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

ওয়েটার এসে সোডা আর হুইস্কি দিয়ে চলে গেল।

'মেয়েরা মদ খেলে তোমার কেমন লাগে?' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল চেরি।

'যে মেয়ে শুধু মদ খায় তাকে আমার তেমন ভাল লাগে না, যে মেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হতে জানে, তাকে আমার দারুণ লাগে।'

'আচ্ছা,' হঠাৎ জানতে চাইল চেরি। 'একটা কথা সত্যি করে বলবে? কোন মেয়েকে সত্যিকার ভাবে কখনও ভালবেসেছ?'

'তোমার কি মনে হয়?'

'প্রশ্নটা আমি করেছি।'

'কি জানো, কোন বাঁধনই আমাকে জড়াতে পারে না,' বলল রানা। 'বেরিয়ে আসতে পারব না এমন ফাঁদে আমি কখনোই পা দিই না।'

'ভালর সবটুকু নেবে, কিন্তু খারাপের আঁচটুকুও সইবে না, তারমানে এই তো?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল চেরি। 'স্বার্থপর আর বলে কাকে! এক মিনিট পরই হয়তো আমাকে শুনতে হবে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্কই হয়নি।'

বাঁকা চোখে তাকাল রানা। 'বলতেও পারি, নির্ভর করে সম্পর্ক বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ।' দেঁতো হাসি দেখা গেল ওর মুখে। 'এ-কথা তো সত্যি, এমন সম্পর্ক তোমার সাথে আমার হয়নি যে সেটা ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারব না।'

'নাহ, তুমি সত্যি অসম্ভব লোক, রানা!' হতাশার ছায়া পড়ল চেরির মেকআপ করা মুখে।

চেরির কানের দিকে একটু ঝুঁকল রানা। 'চিরকাল তোমার পাশে থাকব, নিশ্চয়ই এ-ধরনের কিছু ভাবছ না? ছ'মাস পর নির্ঘাত আমাকে তোমার অসহ্য

মনে হবে।'

'শুধু যদি অন্য কোন মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ো তুমি,' বলল চেরি। 'সেক্ষেত্রে মেশিনগানধারী গার্ড রাখব আমি, মেয়েগুলোকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে ওরা।'

'মেয়েরা আমাকে চায়, এ ধারণা তোমার হলো কেন?'

'ধারণা নয়, রানা—আমি জানি। আমার অনেক বাছ বিচার, সহজে আমার কাছে পাত্তা পায় না কেউ। আমার চোখে পড়তে হলে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু তুমি···এলে আর জয় করলে। এটা যে সম্ভব, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত আমার ধারণার মধ্যেই ছিল না। মেয়েরা তোমার জন্যে কি রকম পাগল হতে পারে, নিজের অবস্থা দেখেই সেটা বুঝতে পারছি।'

'বুঝলাম, আমাকে দেখে ধপাস করে পড়ে গেছ,' বলল রানা। 'বুদ্ধি করে আবার উঠে দাঁড়িয়ো, তা নাহলে ভুগতে হতে পারে।' এক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'একটা কথার জবাব দাও দেখি···'

'জবাব যদি জানা থাকে,' বলল চেরি। পরপর দুটো চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করে ফেলল সে। 'তার আগে আরেকটা মার্টিনি।'

ওয়েটারকে ডেকে আবার অর্ডার দিল রানা। তারপর বলল, 'ডিনারের সময় যে মজার কাহিনীটি তোমাকে শোনাব, প্রশ্নটা সেই কাহিনীর একটা চরিত্র সম্পর্কে। আচ্ছা, দ্য সিলভাকে কি তুমি অনেকদিন থেকে চেনো? যে লোকটা শায়লাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে···কেমন লোক সে, তার সম্পর্কে কতটুকু কি জানো তুমি?'

'সিলভা সম্পর্কে খুব বেশি জানি না আমি,' বলল চেরি। 'তবে যতটুকু জানি, ভালই লাগে। আব্বার রেখে যাওয়া ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্যে প্রায়ই আমাকে কুয়েতে যেতে হয়, বছর পাঁচেক আগে ওখানেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল ওর সাথে।'

'ওখানে ও কি করছিল?'

'স্পেন সরকার একটা শুভেচ্ছা মিশন পাঠিয়েছিল কুয়েতে, সেই মিশনের সদস্য ছিল সিলভা,' বলল চেরি। 'সিলভার ব্যক্তিত্ব মানুষকে টানে, বিশেষ করে মেয়েদের সাথে ও খুবই ভদ্র।' একটু সিরিয়াস দেখাল চেরিকে। 'ভেব না সিলভার সাথে আমার কোন অ্যাফেয়ার ছিল। ওকে আমার ভাল লাগে, কিন্তু কাছাকাছি যাবার মত ভাল কোনদিনই লাগেনি। তুমি যদি এ-ধরনের কিছু ভেবে বসো, আমার খারাপ লাগবে। আমি যে ধরনের মানুষ পছন্দ করি, সিলভা সেরকম নয় তাছাড়া, কেন যেন, ওকে আমার একটু বোকা বোকা লাগে।'

'আশ্চর্য তো,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, প্রায় বছর পাঁচেকই তো হলো, ওই সময় আমিও কুয়েতে ছিলাম। কে জানে,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমরা হয়তো একই হোটেলে উঠেছিলাম। হয়তো পরস্পরকে দেখেওছিলাম আমরা।'

'দূর! অসম্ভব! তোমাকে আমি এর আগে কোথাও দেখিনি।'

'কি করে জানলে?'

চেরির লম্বা ঠোঁটে দুষ্টামি ভরা হাসি খেলে গেল। 'তোমাকে যদি দেখতাম, তা সে যখনই হোক, ফাঁদে ফেলে ঠিকই আটকাবার চেষ্টা করতাম।'

ডাইনিংরূমে চলে এল ওরা। রিজার্ভ করা কোণের টেবিলে সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বসল। টেবিলে তাজা ফুল রয়েছে, সামনে ঝুঁকে গন্ধ নিল চেরি। ককটেলের অর্ডার দিল রানা।

'ডিনার তো আসছে,' বলল চেরি। 'তোমার মজার গল্পটা এবার শুরু করতে পারো না?'

রানা অন্যমনস্ক।

'এই, কি বলছি!' চেরির দিকে তাকাল রানা। 'সেই থেকে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে আছি, বুঝলে। গল্প শোনার জন্যে অনেক কিছু হারাতে রাজি আমি, বিশেষ করে তা যদি সত্যি হয়। ইস্, আর কত দেরি করবে! নাও, শুরু করো। প্লীজ।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ভেবেছ লক্ষ করিনি? ওখানে তুমি স্থির হয়ে বসতেই পারছিলে না, কৌতূহলে একেবারে ছটফট করছিলে।'

'তাহলে বলো...।'

ডাইনিংরূমের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'শোনো, কেউ যেন জানতে না পারে। মজার...আবার এক অর্থে, যখন ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবে, তখন আর মজার বলে মনে হবে না। তোমাকে তো বলেইছি, ব্যাপারটা সাঈদ সম্পর্কে...'

চেরি বলল, 'প্রথম থেকেই লক্ষ করছি, সাঈদের ব্যাপারে তোমার খুব আগ্রহ। কেন? কি করেছে সে?'

'ধরো,' গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল রানা, 'যদি বলি, সাঈদের মিনিস্ট্রি অভ ওয়ার্কসে চাকরি করার কথাটা ডাঁহা মিথ্যে? ধরো, যদি বলি, বন্ধুবর সাঈদ মাহমুদ আসলে একজন সিক্রেট এজেন্ট? তাহলে কি বলবে তুমি?'

ওয়েটার আসছে দেখে কিছু বলল না চেরি। ওয়েটার চলে যাবার পর ককটেলের গ্লাসে চুমুক দিল সে, বলল, 'খুব যে একটা অবাক হব, তা নয়। আবার, একটা কথা ভেবে হতেও পারি। সিক্রেট এজেন্ট, মানে স্পাই—কিন্তু সাঈদ কি এ-ধরনের কাজের জন্যে উপযুক্ত? তার মধ্যে কি অতটা দায়িত্ববোধ আছে যে...?'

'বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছ,' বলল রানা। 'কিন্তু তবু, বিশ্বাস করো আর নাই করো, ও তাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল চেরি। 'আসলে, কোন কিছুতেই আমি অবাক হই না। না হয় তাই হলো, স্পাই। তো কি হয়েছে?'

একজন ওয়েটার এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। বলল, 'মি.

মাসুদ রানা, স্যার? আপনার ফোন।'

'ধেত্তেরি ছাই!' চটে উঠল চেরি। 'গল্পটা শোনার জন্যে পাগল হয়ে আছি, শুরু হতে না হতেই বাধা!'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'এখুনি আসছি,' বলল ও। 'এসেই আবার শুরু করব।' ওয়েটারের পিছু পিছু বেরিয়ে এল ও।

হলঘরে ঢুকে কাউকে দেখল না রানা। টেলিফোনটা এক কোণে। টেবিল থেকে রিসিভার তুলল ও।

সোহেল বলল, 'শোন্, রানা…? হ্যাঁ। ইঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট করেছে। ভায়া দ, কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছিস, কেটে পড়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। খানিক আগে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেছে সে। সে বেরিয়ে যাবার একটু পর ফেরে শায়লা। দ-র লেখা একটা চিঠি পেয়েছে সে, ফেয়ারওয়েল নোট। ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে শায়লা। ফ্ল্যাটের একটা চাবি এখন আমার কাছে।'

'আচ্ছা,' বলল রানা। 'আর দ?'

'ফ্ল্যাটে আবার ফিরবে সে,' বলল সোহেল। 'দুটো সুটকেস, টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস ওখান থেকে নিতে হবে তার। চাকরানীর সাথে কথা বলেছে গিলটি মিয়া। মেয়েলোকটা সারাদিন কাজ করে, রাতের বেলা নিজের ডেরায় ফিরে যায়। দ তাকে বলে গেছে, রাত সাড়ে দশটার দিকে ফিরবে সে। ফ্ল্যাট এখন খালি, তবে এখনও চোখ রেখেছে গিলটি মিয়া। আর ইঞ্জিনিয়ার গেছে দ-র সাথে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। দশটা বাজতে চলেছে। আপনমনে হাসল ও। তার সুবিধে মত সময়েই সবকিছু ঘটছে, এটা কম কথা নয়। বলল, 'ঠিক আছে, সোহেল। দ-র সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। আমি গিয়ে গিলটি মিয়াকে ছুটি দেব। তার সাথেও দেখা করছি। রাখি।' রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রেখে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল ও।

ডাইনিংরুমে ঢুকে দেখল, ওদের টেবিলে ডিনার পরিবেশন শুরু হয়েছে।

'এমন কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছ,' বলল চেরি, 'ফিরতে আরেকটু দেরি করলে দম আটকে মারা যেতাম। খেতে খেতে শুরু করো, কেমন?'

বসল না রানা। চেরির চেয়ারের ওপর হাত দুটো রেখে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। চেহারায় রাজ্যের দুঃখ। 'কিভাবে যে বলব!'- অসহায় দেখাল ওকে। 'লক্ষ্মী, রাগ কোরো না। এতে আমার কোন হাত নেই।'

'তার মানে?' বিবর্ণ হয়ে গেল চেরির চেহারা। 'কি বলছ তুমি?'

'আমাকে যেতে হবে,' ম্লান গলায় বলল রানা। 'বস্ ফোন করেছেন। ডিফেন্সের জরুরী একটা কাজ পড়েছে, কাল সকালে কোলকাতার প্রথম ফ্লাইটটা ধরতে হবে আমাকে। কিন্তু আমি যেতে চাই না। ঢাকায় আমি আরেকটু সময় থাকতে চাই।' ম্লান একটু হাসল ও। 'তাই এখুনি গিয়ে বসকে বোঝাবার চেষ্টা করব, দরকার হলে মিথ্যে একটা অজুহাত খাড়া করে বলব, আমার পক্ষে কাল যাওয়া সম্ভব নয়।'

হতভম্ব দেখাল চেরিকে। কয়েক সেকেন্ড কথাই বলতে পারল না। প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হয়েছে। বলল, 'কিন্তু রানা…ডিনারের কি হবে? আ-আমার, আমারই বা কি হবে?'

'ডিনার চুলোয় যাক,' বলল রানা। 'তোমার কথাই ভাবছি আমি। কিন্তু এখুনি না গিয়েও উপায় নেই আমার, চেরি। ব্যাপারটা এখনও চূড়ান্ত হয়ে যায়নি, যুক্তি দিয়ে বসকে হয়তো বোঝাতে পারব। কোলকাতায় এখন কেন যেতে চাইছি না, বুঝতে পারছ তো? একটাই কারণ—তুমি।'

'কতক্ষণ লাগবে তোমার?' জানতে চাইল চেরি। 'আধ ঘণ্টা? এক ঘণ্টা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো দশ মিনিটে কাজ হয়ে যাবে, আবার দু'ঘণ্টাও লাগতে পারে। কিছুই বলা যায় না, চেরি।'

হঠাৎ চেহারা একটু উজ্জ্বল হলো চেরির। 'আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত যদি কোলকাতায় তোমাকে যেতেই হয়,' রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সে, 'ইচ্ছে করলে আমাকেও সাথে নিতে পারো। কি, আইডিয়াটা কেমন? চমৎকার হয় না? শোনো, কাজের ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়া দরকার…যেতেই যদি হয়, তবে আর দেরি কোরো না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও, তোমার বসের সাথে কথা বলে আমার সাথে আবার দেখা করবে তুমি। আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো, তোমার জন্যে আমি জেগে বসে থাকব। তোমাকে একটা খবর দিই, গোটা বাংলাদেশে ওমলেট বানাতে আমার জুড়ি নেই। খেয়ে ভুলতে পারবে না।' চোখ নামিয়ে নিল চেরি। 'চাকর-চাকরানী সবাইকে বিদায় করে দিয়েছি, আজ রাতে ফ্ল্যাটে শুধু আমি একা থাকছি।'

একটা ঢোক গিলল রানা। 'কথা দিলাম, যদি বেঁচে থাকি, যত রাতই হোক, তোমার কাছে ফিরব একবার। ঠিক আছে, তাহলে সেই কথাই রইল। ডিনারের বিল দিয়ে যাচ্ছি আমি। খেতে বসে আমার কথা ভেবে নিজেকে ঠকিয়ো না কিন্তু।' সিধে হলো রানা। তারপর জানতে চাইল, 'কোলকাতার ব্যাপারটা…সত্যি কি তুমি যেতে চাও, না এমনি বললে?'

'দূর বোকা, এমনি বলব কেন! তোমার যদি কোন অসুবিধা না থাকে, একশোবার যেতে চাই। অবশ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে যদি ভিসা জোগাড় করতে পারো।'

আবার একটা ঢোক গিলল রানা। লোভে চকচক করছে ওর চোখ। 'আমার এত আনন্দ লাগছে যে কি বলব। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। সত্যি যাবে তো? শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেলে আমি কিন্তু সাংঘাতিক…'

'পাগল! বললাম তো, যাব!'

ঝুঁকে পড়ে চুমো খেতে যাচ্ছিল রানা, আবার ওয়েটার এসে পড়ায় তা আর সম্ভব হলো না। 'আমার অবস্থা কেরোসিন, বুঝলে,' ফিসফিস করে বলল ও। 'আসছি। তোমার ফ্ল্যাটে আসছি। গেলাম, চেরি।'

'আমি কিন্তু তোমার পথ চেয়ে থাকব।'

ঠোঁট কুঁচকে চুমু খাওয়ার একটা ভঙ্গি করে ডাইনিংরূম থেকে বেরিয়ে

এল রানা।

নতুন কেনা সুতী, প্রিন্টের একটা শাড়ি পরেছে শায়লা। মুখে কোন মেকআপ নেই। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাল ও, তারপর স্যুটকেসটা ঝুলিয়ে ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকল।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় দু'জন লোককে দেখল শায়লা, দেয়াল চুনকাম করছে। শায়লাকে উঠতে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল তারা। তিন তালায় উঠে এসে সুটকেসটা একপাশে নামাল ও। হাতের ব্যাগ থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খুলল।

কবাট সরিয়ে প্যাসেজে তাকাল শায়লা। আলো জ্বলছে। কিন্তু কেউ নেই। খানিক ইতস্তত করার পর দরজা পেরিয়ে প্যাসেজে চলে এল ও, দরজা বন্ধ করে তালা লাগাল। বাঁ পাশের জানালাটা খোলা দেখল ও, ভেতরে আলো জ্বলছে। ওটা ড্রইংরুম, সাঈদ বোধহয় জেগেই আছে।

জানালায় পর্দা ঝুলছে। শায়লার ইচ্ছে হলো, পর্দা একটু সরিয়ে ভিতরে তাকায়। কিন্তু সুটকেস নামিয়ে রেখে হাত বাড়াতে গিয়েও শেষ মুহূর্তের জড়তা আর সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারল না ও। নিচের ঠোঁট কামড়ে ওখানেই ঝাড়া দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর সুটকেসটা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল শায়লা। এবার থামল ড্রইংরুমের দরজার সামনে। সুটকেসটা আবার নামাল ও। চাবি হাতেই ছিল, এবার কী-হোলে ঢোকাতে গেল।

ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এল। বোধহয় কাশল সাঈদ। আওয়াজটা শুনেই চাবি ধরা হাতটা টেনে নিল শায়লা। তার বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। জিভ শুকিয়ে কাঠ।

তার চলে যাওয়া, তারপর আবার আজ ফিরে আসা, গোটা ব্যাপারটাকে সাঈদ কিভাবে নেবে, অনেক চেষ্টা করেও আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে শায়লা। একবার মনে হয়েছে, সাঈদ হয়তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে তাকে। কিংবা ওকে দেখে নিজেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাবে ফ্ল্যাট ছেড়ে। বলা যায় না, সাঈদ কেঁদেও ফেলতে পারে—তবে সে সম্ভাবনা কম। সাধারণত ভাবাবেগে বিচলিত হয় না সাঈদ। এমনও হতে পারে, সাঈদ কোন কথাই বলবে না। শুধু শোবার সময় বেডরুমে একা ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবে দরজা। এগুলোর যে-কোন একটা ঘটতে পারে, এবং ঘটলে শায়লা তা সহ্য করতে পারবে না।

নিচের ঠোঁট কামড়ে প্রায় রক্ত বের করে ফেলল শায়লা। মনটাকে শক্ত করল সে। কী-হোলে চাবি ঢোকাল খুব সাবধানে, চাবি ঘুরিয়ে খুলেও ফেলল তালা। তারপর চাপ দিয়ে খুলতে শুরু করল কবাট দুটো।

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ঢুকল শায়লা। ভেতরে ঢুকে সুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রাখল। সিধে হলো, কিন্তু ডেস্কের দিকে না তাকিয়ে সরাসরি চেয়ে থাকল সামনের সাদা দেয়ালের দিকে। হাত দুটো পিছন দিয়ে

নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল ও। তারপর বন্ধ দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে চোখ বুজল।

কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, বলতে পারবে না শায়লা। বিশ সেকেন্ড হতে পারে, এক মিনিটও হতে পারে। ঘরে কোন শব্দ নেই। শুধু মাথার ওপর ফ্যানটা শোঁ শোঁ করে ঘুরছে।

শায়লা অনুভব করল, বুকের ধুকপুকানিটুকু আগের চেয়ে কমেছে। তার মনে হলো, এত ভয় পাবার বা সঙ্কোচ বোধ করবার কোন কারণ নেই। এটা তার সংসার। স্বামী বিপথে চলে যাচ্ছিল বলে তাকে একটু শিক্ষা দেয়ার জন্যে এই অভিনয়টুকু তাকে করতে হয়েছে। স্বামীর ভালর জন্যেই নিজের প্রাণের ওপর এতবড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিল সে, এটা স্বামী দেবতাকে বুঝতে হবে। বুঝতে না চাইলে তার সাথে ঝগড়া করতে হবে।

চোখ খুলল শায়লা। সরাসরি তাকাল ডেস্কের দিকে। দেখল, ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সাঈদ।

কারও চোখে পলক নেই। কেউ কথা বলল না বা এগোল না। এভাবে প্রায় দশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ দু'জন একসাথে হাসতে শুরু করল ওরা।

হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠছে শায়লার পিঠ। সাঈদের দিকে এগোল সে, কিন্তু সরাসরি নয়—মাতালের মত তাল হারাচ্ছে সে, একবার ডান দিকে ঢলে পড়তে চাইছে, একবার বাঁ দিকে।

আর হাসি থামাতে না পেরে শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেছে সাঈদের। সে-ও শায়লার দিকে এগোল, কিন্তু দু'পা এগোয় তো এক পা পিছোয়, ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে আসতেই তার অনেক সময় লেগে গেল।

ঘরের মাঝখানে পরস্পরকে ধরল ওরা।

'কি মনে করব?' হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে সাঈদের, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের কোণ মুছল সে। 'সত্যি তুমি ফিরে এসেছ?'

'গেলাম কোথায় যে ফিরে আসার কথা জিজ্ঞেস করছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল শায়লা। 'আমার সংসার, আমার স্বামী, এসব ছেড়ে কোথায় যাব? যাইনি কোথাও, শুধু একটু দূরে সরে ছিলাম। তা, ঢিলে স্ক্রু টাইট হয়েছে তো, নাকি ভবিষ্যতে আবার টাইট দিতে হবে?'

দু'হাত দিয়ে নিজের দুটো কান চেপে ধরল সাঈদ। 'জন্মের মত শিক্ষা হয়ে গেছে, শায়লা—আর নয়। কেন, কি ঘটেছে, সব আমি জানি। আমার মত একটা ইডিয়েটের যদি শিক্ষা হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে নির্ঘাত হয়েছে।'

সাঈদের ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকাল শায়লা। 'আমি জানি। এখন থেকে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল, তাই না? আর তোমাকে ভান করতে হবে না।'

'না, আর ভান করতে হবে না,' বলল সাঈদ। 'মেজর জেনারেল রাহাত খান আজ সন্ধেয় আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। কি কি ট্রিক্স ব্যবহার করা হয়েছে, সব তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন। সবশেষে কি বললেন, জানো? বললেন, চেষ্টা করলে এখনও তুমি একজন ভাল এজেন্ট হতে পারবে,

সাঈদ—কিন্তু শায়লা যদি এ লাইনে আসত তোমাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যেত ও। একেবারে কাঁচা, তবু যা দেখিয়েছে, তুলনা হয় না।'

'সত্যি? ভদ্রলোক এত কথা বলেছেন আমার সম্পর্কে?' আগ্রহের আতিশয্যে চোখ দুটো চিক চিক করে উঠল শায়লার।

'আমার আরও একটা দুর্ভাগ্যের কথা শুনবে?' জানতে চাইল সাঈদ। 'আমাদের মত সদ্য ট্রেনিং পাওয়া এজেন্টদের একটা স্বপ্ন, মেজর জেনারেলকে সামনে থেকে দেখা। শেষ পর্যন্ত অনেকেই এই সুযোগটা পায় না। আমিও পাব কি না জানি না। কিন্তু তুমি এজেন্ট না হয়েও সেই দুর্লভ সুযোগটা পেয়ে গেছ।'

'তাও মাত্র একবার নয়,' ঠোঁট টিপে হাসল শায়লা। 'খুব বুঝি হিংসা হচ্ছে!'

'তাও জানি,' বলল সাঈদ। 'মনে আছে, আমার সাথে যেদিন রঁদেভোয় যেতে চাইলে তুমি? আটটার দিকে বাইরে থেকে ফিরলাম, কাপড় বদলে ক্লাবে যাব বলে। ঘরে ঢুকেই কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পেলাম। জিজ্ঞেস করতে তুমি বললে, কই, আমি তো পাচ্ছি না। আসলে আমি ফেরার একটু আগেই মেজর জেনারেল চলে গিয়েছিলেন, তাই না? ওটা তাঁর চুরুটের গন্ধ ছিল। ঠিক বলিনি?'

হাসছে, তাই কথা বলতে পারল না শায়লা। শুধু মাথা দোলাল।

'যাক বাবা, সব যে ভালয় ভালয় মিটে গেছে, এতেই আমি সন্তুষ্ট,' বলল সাঈদ। 'কাজ দেখাবার আরও একটা সুযোগ আমাকে দেয়া হবে, আমার লক্ষ্মী-সোনা বউটাকে ফিরে পেয়েছি। আর কিছু চাওয়ার নেই আমার।'

'সত্যি?' আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকাল শায়লা। 'সন্ধে হলেই গা ম্যাজম্যাজ করবে না তো? কিংবা নাসরিন, চেরি, জ্যোতি ভাবী বা আর যারা আছে, ওদের কথা ভেবে মনটা ছটফট করবে না? ঠিক জানো?'

শায়লাকে ছেড়ে দিয়ে হাত জোড় করল সাঈদ। 'মাফ চাই। ওসব কথা তুলে আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। যা হবার হয়েছে। এখন থেকে আমি নকল জিনিস ছেড়ে আসল জিনিস নিয়ে মেতে থাকব।'

'আসল জিনিস?' ভুরু কুঁচকে তাকাল শায়লা।

'হ্যাঁ। ঘরের লক্ষ্মী, যাকে বলে খাঁটি সোনা।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল শায়লার। 'এই দু'দিনে তুমি এত রোগা হয়ে গেলে কি করে? একদম বুঝি খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলে?'

ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাঈদ। 'আমার অবস্থায় পড়োনি তো, পড়লে বুঝতে কষ্ট কাকে বলে! এমন একটা বউ, সাত জন্ম সাধনা করলেও যা পাওয়া যায় না, সে যদি বিনা নোটিশে চলে যায়...'

সাঈদের মুখে হাত চাপা দিল শায়লা। 'থাক, এত দাম দিতে হবে না। ফ্রিজে কি আছে চলো দেখি, এখুনি আমি রাঁধতে বসব। তোমাকে নিজের হাতে খাওয়াতে না পারলে আমার ঘুম আসবে না।'

দশ মিনিট পর।

আয়োজন করে রাঁধতে বসেছে শায়লা। তার পাশেই একটা মোড়া নিয়ে বসে রয়েছে সাঈদ। হঠাৎ হাত দুটো স্থির হয়ে গেল শায়লার, মুখ তুলে সাঈদের দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, তোমার চাকরি নিয়ে সত্যিই কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'এখুনি জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না,' বলল সাঈদ। 'তবে আমাকে আরও একটা সুযোগ দেয়া হবে বলেই মনে হয়। মাসুদ ভাইয়ের কথা তুমি বোধহয় কিছু শোনোনি। এই গোটা প্ল্যানটাই তাঁর। উনিই আমাকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন।'

'কি বলেন তিনি? তোমার সাথে তাঁর দেখা হয়েছে?'

'তিনিই তো বললেন, আরও একটা সুযোগ দেয়া হবে আমাকে,' বলল সাঈদ। 'তবে নতুন কাজ কবে পাব, বলা মুশকিল। এই মুহূর্তে তিনি সাংঘাতিক ব্যস্ত। সব এলোমেলো হয়ে আছে, মাসুদ ভাইয়ের দায়িত্ব আবার সব গোছগাছ করে দেয়া। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন লোককেও এ-দেশে স্বাধীন ভাবে থাকতে দেয়া হবে না। একমাত্র ওপরওয়ালাই বলতে পারে, কিভাবে কি করার কথা ভেবেছেন তিনি। পরিস্থিতি খুবই জটিল, শায়লা। কিন্তু দায়িত্বটা যেহেতু মাসুদ ভাইয়ের ওপর পড়েছে, সবাই আশা করছে, তিনি সবকিছুরই সুরাহা করবেন। মাসুদ ভাই কাজে কোন খুঁত রাখেন না।'

'তাহলে তো ভদ্রলোকের জন্যে কিছু একটা করা দরকার আমাদের,' বলল শায়লা।

'মাসুদ ভাইয়ের জন্যে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সাঈদ।

'হ্যাঁ।'

'আমাদের কি করার আছে? কি করতে চাও তুমি?'

'না, তেমন আর কি করার আছে,' বলল শায়লা। 'কিন্তু একটা কাজ তো পারি, তাঁর জন্যে একটু দোয়া করতে অসুবিধে কোথায়?'

সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরাল দ্য সিলভা। বেশ ক'দিন পর আজ তার নিজেকে শান্ত আর সন্তুষ্ট লাগছে। অবশেষে তার চলার পথটা সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। এই ক'দিন ভয় আর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল, কিন্তু এখন আর মনে ওসবের কোন বালাই নেই। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর এ-দেশে ছেড়ে চলে যাবে সে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট দেখালেই সসম্মানে চলে যেতে দেয়া হবে তাকে।

মনে মনে নিজের প্রশংসা না করে পারল না সিলভা। মাঝে মধ্যে একটু কঠিন আচরণ করতে হয়েছে তাকে, তাতে কাজও হয়েছে? বিশেষ কারও সাহায্য না পেয়ে একা যা করেছে, কম নয় সেটা। এসব করতে গিয়ে অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে, বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। এই কাজের দায়িত্ব যার কাছ থেকে পেয়েছিল সে, তিনি হয়তো তার আচরণে একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিছু এসে যায় না। তিনি তাকে কোণঠাসা করতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু সময় মত একটু হুমকি দেয়ায়, আর বুদ্ধির জোরে এ-যাত্রা কোন ক্ষতি স্বীকার না করেই স্বদেশে ফিরে যেতে পারছে সে।

সিগারেটে কষে একটা টান দিল সিলভা। সোফা ছেড়ে আলমিরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বোতলে এখনও খানিকটা হুইস্কি রয়েছে। সেটুকু একটা গ্লাসে ঢেলে নিয়ে সোফায় ফিরে এল সে।

রাস্তায় তেমন আলো নেই। ফ্ল্যাট বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকল রানা। সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হয়ে গেল গিলটি মিয়ার সাথে। ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ থাকতে নির্দেশ দিল রানা। ফিসফিস করে বলল, 'তোমার আগের কাজে ফিরে যাও।' রানাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল গিলটি মিয়া।

দোতলায় উঠে এল রানা। সিলভার ফ্ল্যাটের তালা খুলল।

প্যাসেজটা অন্ধকার। ড্রইংরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। ঘরের ভেতর থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাল ও। ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো—খুলে গেল তালা। সিলভা কি জেগে আছে? শব্দটা কি তার কানে গেল?

আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। ভেতর থেকে কোন আওয়াজ পেল না। হোলস্টার থেকে ল্যুগার পিস্তলটা বের করে হাতে নিল ও। তারপর হঠাৎ দড়াম করে কবাট খুলে ঢুকে পড়ল ড্রইংরুমে।

হাতে হুইস্কির গ্লাস, আপন মনে হাসছিল সিলভা। আওয়াজ শুনেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

'অস্থির হয়ো না, সিলভা,' শান্ত গলায় বলল রানা। এক হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে কবাট বন্ধ করে দিল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও সিলভার ওপর থেকে চোখ সরাল না। 'আমি তোমার বন্ধু।'

'বুঝলাম না!'

'বুঝবে। বসো। তোমার সাথে আমার কথা আছে।' মুখে মৃদু হাসি লেগে রয়েছে রানার।

'কে তুমি?' দাঁড়িয়ে থেকেই প্রশ্ন করল সিলভা। 'পুলিসের লোক? কোন্ অধিকারে ঢুকেছ আমার ফ্ল্যাটে? তুমি জানো, আমার পাসপোর্ট ডিপ্লোম্যাটিক?'

ইঙ্গিতে হাতের পিস্তলটা সিলভাকে দেখাল রানা। 'এটার কাছে তোমার ওই ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের কোন দাম নেই, বুঝলে? বাহাদুরি কোরো না, যা বলছি শোনো। বসে পড়ো।'

কথা আর না বাড়িয়ে সোফার কিনারায় বসল সিলভা, অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রানা। বলল, 'ব্যাপারটা মেনে নিতে তোমার কষ্ট হবে, সিলভা। কারণ, তোমার ধারণা, তোমার কাজে কোথাও কোন খুঁত রাখোনি তুমি। সকাল হতে যা দেরি, এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠবে বলে সব ঠিক করে রেখেছ, এই সময় যদি কেউ তোমাকে গ্রেফতার

করতে আসে, মাথায় বাজ পড়ার চেয়ে কম কি সেটা।'

'কে তুমি?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল সিলভা। ঝট করে উঠে দাঁড়াল আবার।

'মাসুদ রানা,' বলল ও। 'যাদের বারোটা বাজাবার জন্যে এ-দেশে এসেছ, তাদেরই একজন।'

কিছু বলতে গেল সিলভা, কিন্তু বলতে পারল না। মুখ খুলতে না পারার কারণটা নিজের কাছেও বোধগম্য হলো না তার। দরজার কাছ থেকে রানা ঘরের মাঝখানে সরে আসছে দেখে, মুখ বন্ধ করে ফেলল সে। গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না, তার কারণ হয়তো রানার চোখে কিছু একটা দেখতে পেয়েছে।

'আমার চোখে, সিলভা, তুমি একটা বাতাস ভরা বেলুন ছাড়া আর কিছুই নও,' বলল রানা। 'এই দেশে যাদের হয়ে কাজ করছ তুমি, তারা তোমাকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তোমার মাথার ভেতর শুধু গোবর আছে, মগজ বলতে কিছু নেই, তাই সেটা তুমি টের পাওনি। আমি বলতে চাইছি, তোমার মত একটা রামগাধাকে আমিও কোন কাজে ব্যবহার করতে পারি না।'

বিস্ময় আর ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে সিলভা। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ব্যাপারটা কি নিয়ে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি চোরের মত ঢুকলে। তোমার কাছে একটা পিস্তল রয়েছে। আমাকে ভয় দেখাচ্ছ।' আবার একবার কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে, ধরো, তুমি আমাকে খুন করলে, তাতে কিছু লাভ হবে তোমার? আমি স্পেনের নাগরিক, স্পেনের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমার সরকার আশা করছে, আমি দেশে ফিরব। যদি না ফিরি যদি তোমার হাতে খুন হয়ে যাই, দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ?' আরও কথা ছিল সিলভার, কিন্তু রানা হঠাৎ হাসতে শুরু করেছে দেখে থেমে গেল সে।

পিস্তলটা পকেটে রেখে দিল রানা। বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আর ভয় দেখাব না। ভয় দেখিয়ে যতটুকু কাজ হবে, তারচেয়ে বেশি কাজ আদায়ের উপায় জানা আছে আমার। বসো। তারপর কি বলি শোনো।'

সিলভা বলল, 'কিছু যদি বলার থাকে, বলো, আমি তো শুনতে আপত্তি করছি না। আমি একটা যুক্তি ছাড়া মানুষ, এ-কথা কেউ বলবে না।' চিন্তা করছে সে। ব্যাপারটা কি? কোথায় ভুল করলাম? মাসুদ রানা…নামটা আগে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সত্যিই কি বি.সি.আই.-এর লোক? কিন্তু ভুলটা আমি কোথায় করলাম?

'যুক্তিসঙ্গত হলে আমি তোমার কথা শুনতে বা মানতে রাজি আছি,' আবার বলল সে। এটা একটা আপোস প্রস্তাব, এর চেয়ে পরিষ্কার করে বলা সম্ভব নয়। আসলে ঘটনার কোন ব্যাখ্যা না পেয়ে সময় পাবার চেষ্টা করছে সিলভা।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, তুমি সেটার উত্তর দেবে,' বলল রানা।

'এইটুকুই আমার চাওয়া। তোমার ভাগ্যে কি ঘটবে, আমার এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে সেটা।'

ধীরে ধীরে আবার সোফায় বসল সিলভা। কেন এসেছে, কি চায়, কিভাবে আসতে পারল, এসব জানা নেই বলেই আগন্তুককে ভয় লাগছে তার।

'দিন কয়েক আগে,' বলল রানা, 'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট, হেদায়েত খান, সাভারে এক মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। ওই অ্যাক্সিডেন্টের সাথে জড়িত ছিল এক যুবক, তার নাম সাঈদ, যার স্ত্রীকে তুমি চেনো। সেই রাতেই সাঈদ ঢাকায় ফিরে আসে। ঢাকায় ফিরে এলে, কেউ তার পিছু নেয়। অত রাতে শহরে একটা গাড়ি ঘোরাঘুরি করলে টহল পুলিসের মনে সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু গাড়ি যে চালাচ্ছে তার কাছে যদি একটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকে, পুলিস উল্টে তাকে স্যালুট ঠুকবে। তাই ধরে নেয়া যায়, সে রাতে সাঈদকে যে ফলো করছিল তার কাছে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট ছিল।'

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে আছে সিলভা। গভীর মনোযোগের সাথে রানার কথা শুনছে।

'সহকারীদের নিয়ে সাঈদের পিছনে লেগে থাকো তুমি। তারপর ভাগ্য তোমাদের খুলে যায়। পরদিন তেল আবিবে বি.সি.আই. এজেন্টদের একটা তালিকা দেয়া হয় সাঈদকে। সেদিন সন্ধের দিকে সোয়ান ফেঙ-এ একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয় তার। মেয়েটার সাথে তার ফ্ল্যাটের যায় সাঈদ। ভোর রাতের দিকে সাঈদের মানিব্যাগ থেকে তালিকাটা নিয়ে পালায় মেয়েটা।' এক সেকেন্ড থামল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'আমার কোথাও ভুল হয়নি তো?'

'ইংরেজীতে বলছ, কাজেই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না,' বলল সিলভা। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কিন্তু এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক আমি তা বুঝতে অক্ষম। তোমার বন্ধু সাঈদের ব্যাপারে আমি কোন্ দুঃখে ইন্টারেস্টেড হতে যাব! হ্যাঁ, এ-কথা সত্যিই যে তার স্ত্রীর সাথে আমার একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু সে-সব চুকে বুকে গেছে। সাঈদ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমি…'

'মেয়েটা কোথায়, সিলভা? সাঈদকে নাম বলেছিল শম্পা। তার আসল পরিচয় আর ঠিকানা জানতে চাই আমি।'

সাথে সাথে কিছু বলল না সিলভা। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি…'

'কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই,' বলল রানা। 'মেয়েটার পরিচয় আর ঠিকানা তুমি আমাকে দেবে। তোমাকে দিতে হবে। কেন, শুনতে চাও?'

'সিনর রানা, আপনার কোন কথা শুনতেই আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি যা বলছেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি…'

'শোনো তাহলে,' বলল রানা। 'তালিকাটা হাতে পেয়ে তুমি ভেবেছিলে,

কেল্লা ফতে করে দিয়েছ। আসলে ওটা ছিল তোমাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্যে একটা টোপ।'

চোখ পিট পিট করতে লাগল সিলভা।

মৃদু হাসল রানা। 'তালিকাটা ছিল নকল। বুঝতে পারছ, যতটা ভেবেছিলে ততটা বোকা আসলে নই আমরা।' সিলভা কিছু বলতে যাচ্ছিল, রানা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'থামো। আমার কথা শেষ হয়নি। তালিকা তো পেলে তোমরা। কিন্তু কাজটার মধ্যে একটা খুঁত থেকে গেল। খুঁতটা হলো, পরে কখনও যদি কোথাও দেখে, মেয়েটাকে সাঈদ চিনতে পারবে। কাজেই ঠিক হলো, সাঈদকে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

পায়চারি শুরু করল রানা। 'কাজটা তেমন কঠিন মনে করার কারণ ছিল না। সংস্থার তরফ থেকে একজন মোটাসোটা লোককে পাঠানো হলো, সাঈদের ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব দিয়ে। তার প্রথম কাজ ছিল, সাঈদকে সরানো। এই সময় বুদ্ধি করে মিসেস সাঈদকে নিজের কাছে সরিয়ে আনলে তুমি।'

শো-কেসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। 'এই ঘটনার কিছু আগে থেকেই এ-দেশে তোমার যে ডিরেক্টর, এ-লাইনে যে তোমাকে নিয়ে এসেছে, তার সাথে খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপার নিয়ে তোমার গোলমাল বাধে। তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটা চিঠি লেখো। তোমার ভয় হয়, ডিরেক্টর বোধহয় তোমাকে বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করার মতলব করেছে। তোমার এরকম ভয় পাবার দুটো কারণ ছিল। এক, ডিরেক্টর তোমার সাথে ঠিকমত সহযোগিতা করছিল না। দুই, মাত্র ক'দিন আগে বলির পাঁঠা হিসেবে একজনকে ব্যবহার করা হয়েছে, এই দৃষ্টান্ত তোমার জানা ছিল। ভয় পেয়ে তুমি ঠিক করলে, পালাবে। কিন্তু এটা ঠিক করার আগেই বোকার মত একটা মারাত্মক ভুল করলে তুমি চিঠিটা লিখে। চিঠিটা লিখলে তুমি সিনর অমুক বা তমুককে উদ্দেশ্য করে। চিঠিটা জায়গামত, প্রাপকের হাতেই পৌঁছুল। এই প্রাপকই হলো তোমার ডিরেক্টর।'

'আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?' জানতে চাইল সিলভা।

টেবিলের দিকে তাকাল রানা। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

টেবিল থেকে প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিয়ে সিগারেট ধরাল সিলভা। রানা লক্ষ করল, তার হাত কাঁপছে।

'তোমার লেখা চিঠিতে পরিষ্কার হুমকি ছিল,' আবার শুরু করল রানা। 'সেটাই তোমার জন্যে কাল হলো। তোমার মাথায় শুধু গোবর না থেকে যদি মগজের ছিটে ফোঁটাও থাকত, তাহলে বুঝতে পারতে, তোমার এই বাড় সহ্য করার মানসিকতা তোমার ডিরেক্টরের নেই, থাকতে পারে না। এ-দেশে তোমাকে ব্যবহার করতে পেরে খুশিই ছিল তোমার ডিরেক্টর, কারণ ডিপ্লোম্যাটিক কিছু সুবিধে ছিল তোমার। তোমাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিতে পারলে ডিরেক্টরকে তার নিজের পরিচয় প্রকাশ করার ঝুঁকি নিতে হয় না, এটা কম কথা নয়। কিন্তু তাই বলে তোমার বেয়াড়াপনা সহ্য করতে রাজি

ছিল না সে। তার ধাতই সেরকম নয়। ওই চিঠি থেকেই জানতে পারে সে, তুমি বড় বাড় বেড়েছ। কাজেই, সে তার স্বভাবসুলভ সিদ্ধান্ত নিল, তোমাকে শিক্ষা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, তোমাকে শিক্ষা দেয়ার একটা প্ল্যান তৈরি করা হলো। সেটা কি রকম প্ল্যান, শুনতে চাও?'

সিলভা চুপ করে থাকল। সিগারেট ধরিয়ে একবার মাত্র টান দিয়েছে সে। আঙুলের ফাঁকে ধরা রয়েছে সেটা। চোখে তার পলক নেই, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'তোমাকে ফাঁসাবার জন্যে তোমার লেখা চিঠিটাই ব্যবহার করল সে,' বলল রানা। 'যার নামে চিঠিটা লিখেছিলে, সে তার নাম মুছে ফেলল, ফলে চিঠির শুরুটা হলো এই রকম—ডিয়ার সিনর।' মুচকি একটু হাসল রানা। 'তোমার ডিরেক্টরের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। এরপর চিঠিটা একটা এনভেলাপে ভরে একজন লোকের জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রেখে দেয়া হয়। এই লোকটাই, এই মোটাসোটা লোকটাই, সাঈদের ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখছিল। চিঠিটা তার পকেটে কেন রাখা হয়েছিল, বুঝতে পারছ, সিলভা?'

নিচু গলায় সিলভা বিড় বিড় করতে লাগল, 'না···না···'

'বলছি, শোনো। হাঁদারাম বুঝতে পারছ না, তোমার ডিরেক্টর পরিষ্কার জানত সাঈদের ফ্ল্যাটের ওপর নজর আমরাও রাখব। জানত, মোটাসোটা লোকটাকে আমরা পাকড়াও করব। আর, সে ধরা পড়লে, চিঠিটা তার পকেটে পাব আমরা। চিঠিতে তোমার সই আছে, তোমার নিজের হাতে লেখা চিঠি—তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে চমৎকার একটা প্রমাণ। এই সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না?'

দরদর করে ঘামছে সিলভা।

'লোকটা যদি গ্রেফতার হত তাহলে হয়তো এতটা বিপদে তোমাকে পড়তে হত না,' আবার বলল রানা। 'তুমি হয়তো বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা দিয়ে পার পেয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারতে। কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য, গ্রেফতার এড়িয়ে যেতে পেরেছে সে। কি ঘটেছে জানো?'

ঘন ঘন মাথা দোলাল সিলভা। মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না।

'খালি একটা বাড়িতে তার লাশ পাওয়া গেছে,' বলল রানা। 'তাকে খুন করা হয়েছে। লাশের পকেট থেকে পাওয়া গেছে তোমার সেই চিঠিটা। যে চিঠিতে তুমি অভিযোগ করেছ, চিঠির প্রাপক কথা দিয়ে কথা রাখছে না। তারপর হুমকি দিয়ে লিখেছ, এর একটা বিহিত না হলে তোমার যা করার তুমি তা করবে।' নিঃশব্দে হাসতে লাগল রানা। 'দেখতেই পাচ্ছ, সিলভা, হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। গল্পটা হলো, মোটাসোটা লোকটাকে খুন করেছ তুমি। খুন করেছ, কারণ তোমার সাথে তার বনিবনা হয়নি। ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল? ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট তোমাকে হয়তো এসপিওনাজের অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে পারে, কিন্তু একটা খুনের অভিযোগ থেকে তুমি রেহাই পেতে পারো না। অন্তত, সে রেওয়াজ আজকাল আর নেই। লোকটাকে

তুমি খুন করেছ, কারণ লোকটা তোমার সম্পর্কে অনেক বেশি কিছু জেনে ফেলেছিল। খুন করেছ, কারণ কথা দিয়ে সে তার কথা রাখেনি।'

আশ্চর্য কর্কশ শোনাল সিলভার গলা, 'না! মিথ্যেকথা। আমি কখনও কাউকে খুন করিনি...!'

'তা করোনি, আমি বিশ্বাস করি,' বলল রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি জানি। কাউকে খুন করার সাহস তোমার নেই। ও-কাজটি করতে হলে লোক দিয়ে করাবে তুমি। হ্যাঁ, অভিযোগটা মিথ্যে। কিন্তু এটা একটা চমৎকার মিথ্যে। এই মিথ্যে অভিযোগটার জন্যে এ-দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না তোমার। তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এবং, কোন সন্দেহ নেই, বিচারে তোমার ফাঁসিও হবে।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল রানা। 'এখন কেমন বোধ করছ, সিনর সিলভা?'

'এটা একটা চালাকি,' ভারী গলায় বলল সিলভা। '...একটা নোংরা চালাকি। এটা একটা ফাঁদ...'

মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলল রানা। 'আমিও তো ঠিক সেই কথাটাই বোঝাতে চাইছি তোমাকে, রামছাগল। তুমি যার কাজ করো, হেদায়েত খান যার কাজ করত, ফাঁদটা তারই পাতা। টেকনিকটা একই রকম, লক্ষ করেছ? হেদায়েত জান-জীবন দিয়ে তার দায়িত্ব পালন করেছে, তাকে শেষ পর্যন্ত বলি দেওয়া হলো। তুমিও তোমার কাজ শেষ করলে, তোমাকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হলো। মোটাসোটা লোকটার বেলায়ও সেই একই কথা। ময়লা পরিষ্কার করার ভাল একটা প্রতিষ্ঠান, তাই না?'

'কে খুন হয়েছে না হয়েছে আমি কিছু জানি না,' বলল সিলভা। 'কিভাবে বুঝব তুমি ব্লাফ দিচ্ছ না? লোকটা যে মারা গেছে তারই বা প্রমাণ কোথায়? তোমার মুখে শুনে আমি বিশ্বাস করব কেন?'

'বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার,' বলল রানা। 'কিন্তু লোকটা বেঁচে নেই। আমারই তো জানার কথা! আমার সামনে মারা গেছে সে। তাকে খুন করা হয়নি, সে বিষ খেয়েছে। কিন্তু কথা সেটা নয়, কথা হলো, তোমার বিরুদ্ধে চমৎকার একটা কেস দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ, লাশের পকেটে তোমার ওই চিঠিটা ছিল। তাতে লেখা আছে, তোমার সাথে তার বনিবনা হচ্ছিল না।'

হঠাৎ হাসতে শুরু করল রানা। তারপর আবার বলল, 'স্বভাবতই, তুমি বলবে, চিঠিটা ওই লোককে তুমি লেখোনি। লিখেছিলে অন্য কাউকে। এই যদি তোমার যুক্তি হয়, তাহলেও কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে তোমাকে। ওকে যদি না লিখে থাকো তাহলে কাকে লিখেছিলে, বলো আমাকে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। ধড়ে প্রাণ থাকতে তার পরিচয় তুমি প্রকাশ করতে পারবে না। অত সাহস তোমার নেই।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সিলভা।

'কাজেই সরকারী উকিলের বক্তব্য হবে,' বলল রানা, 'তোমার সাথে

লোকটার একটা সম্পর্ক ছিল, যার ওপর দায়িত্ব ছিল সাঈদের ওপর নজর রাখার—তাকে খুন করার। লোকটা যে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হয়ে এ-দেশে কাজ করত, আমরা তা জানি। তোমার সাথে তার ঝগড়া বাধে। তুমি তাকে ওই চিঠিটা লেখো। কিন্তু সে তোমার দাবি মানতে অস্বীকার করায় তুমি তাকে খুন করো। তুমিই বলো, এই কেসের কোথাও কোন ফুটো আছে?'

সিলভা কিছু বলল না। রানাও চুপ করে থাকল। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল সিলভা। নিচু গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে আমি কঠিন একটা বিপদে পড়ে গেছি। কিন্তু আমার একটা সম্মান আছে...'

'হাসিয়ো না। তুমি একটা আস্ত ছাগল, তোমার আবার সম্মান থাকে কি করে? প্যাচাল না পেড়ে বরং আমার কথা শোনো। ভোরের ফ্লাইটে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ তুমি, তাই না? তোমার পাসপোর্ট ঠিক আছে। প্লেনের টিকেট কাটা হয়ে গেছে।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বলতে চাইছি, ইচ্ছে করলেই যেতে পারো তুমি। যাবেও। যাবে, কারণ, আমি তোমাকে যেতে দেব। আমি চাই তুমি চলে যাও। তুমি এখানে মারা গেলে, আমাদের মাটি অপবিত্র হবে, সেটা আমি হতে দিতে চাই না। কিন্তু যেতে হলে, সিলভা, আমার একটা নির্দেশ তোমাকে মানতে হবে। সোয়াঙ ফেঙ-এ যে মেয়েটার সঙ্গে সাঈদের পরিচয় হয়েছিল, তার নাম ঠিকানা জানতে চাই আমি। এই শেষবার আমি তোমাকে হুকুম করছি, বলো।'

উঠে দাঁড়াল সিলভা। তার পা কাঁপছে। 'তর্কের খাতিরে ধরা যাক, মেয়েটাকে আমি চিনি, তথ্যগুলো আমি তোমাকে দিতে পারব...কিন্তু বিনিময়ে তুমি আমাকে কথা দিতে পারো, আমাকে নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হবে?'

'বি.সি.আই. অকারণ খুন-খারাবিতে বিশ্বাস করে না,' বলল রানা। 'তোমাকে খুন করে বা জেলে পচিয়ে আমাদের কোন লাভ নেই। তাই বলে তোমাকে নিরাপদে যেতে দিতে পারবই, এগ্যারান্টি আমরা দিতে পারি না। আমরা হয়তো তোমাকে আটকাব না। কিন্তু আর কে কি করবে না করবে, আমরা জানি? তাছাড়া, তুমি একটা ঝুঁকি নিচ্ছ, না নিয়ে তোমার উপায় নেই বলে। কথা আদায় করা না করা কি সমান নয়?'

সিলভা চুপ করে থাকল।

'কি ঠিক করলে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নাও।'

'আমার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে,' বলল সিলভা। 'ওরা আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে। ওরা আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়নি। মেয়েটার পরিচয় তোমাকে আমি জানাব। তার ঠিকানাটা আমি লিখে দিচ্ছি।' এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে। কাঁপা হাতে মেয়েটার নাম আর ঠিকানা লিখল কাগজে। তারপর রানার হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিল।

কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলাল রানা। ভাঁজ করে রেখে দিল পকেটে। দরজার কাছে পৌঁছে বলল, 'এতদিনে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করলে তুমি, সিলভা। বিদায়।'

প্যাসেজে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা।

সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল সিলভা। বিড়বিড় করে বলল, 'এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। সিলভা, মাই ডিয়ার, এখনও তোমার পালাবার রাস্তা বন্ধ হয়নি।'

নিচতলা থেকে সোহেলকে ফোন করল রানা। 'রাতটা সন্ধে থেকে এখন পর্যন্ত ভালই কাটল, বুঝলি,' বলল ও। 'ডিনারে বাধা পড়েছিল, কিন্তু বাকি সব চমৎকার ভাবেই ঘটেছে। ভাল কথা, সেই শম্পার কথা মনে আছে তোর? ওটা কিন্তু ওর আসল নাম নয়। আসল নাম, টিনা রায়। ঠিকানাটা দিচ্ছি, লিখে নে।'

লিখে নিল সোহেল। বলল, 'কংগ্রাচুলেশন্স, দোস্ত! এত তাড়াতাড়ি...'

'শোন ব্যাটা,' ধমক লাগাল রানা। '...মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, বুঝলি...আবার আমি তোকে ফোন না করা পর্যন্ত মেয়েটার ব্যাপারে কিছু করবি না। মনে থাকবে?'

'থাকবে, দোস্ত।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাতঘড়ি দেখল রানা। তারপর প্রায় অন্ধকার ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। গাড়ি পেতে হলে মোড় পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে।

## এগারো

ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই চেরি দেখল, দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। একটু একটু টলছে। সাথে সাথে তার ধারণা হলো, হতাশায় ভুগছে রানা। ওর বস্ বোধহয় ওর কথায় কান দেননি, বলে দিয়েছেন, কাল ওকে কোলকাতায় যেতেই হবে। তাই কোন বার থেকে বেশ খানিকটা মদ খেয়ে এসেছে ও।

চৌকাঠ পেরিয়ে হলঘরে ঢুকল রানা। চেরির দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ভারী গলায় বলল, 'ইউ লুক গুড এনাফ টু ঈট, ডার্লিং। অ্যান্ড আই কুড ঈট ইউ।' তারপর আরও একটু ঝুঁকে চেরিকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল ও, মনে হলো চুমো খেতে চায়।

একপাশে দ্রুত সরে গেল চেরি, কিন্তু রানার একটা হাত ধরে ফেলল। 'সে-সব পরে দেখা যাবে 'খন,' নিচু গলায় বলল সে। 'তার আগে চলো, টেবিলে বসবে চলো, তোমার জন্যে আমি ওমলেট বানিয়ে রেখেছি।' রানার হাত ছেড়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করল সে।

'আমি কিন্তু আরও মদ খাব,' আবদারের সুরে বলল রানা। 'এখানে সম্ভব, চেরি?'

'সবই সম্ভব,' বলে আবার রানার হাত ধরল চেরি, 'এসো।' রানাকে নিয়ে ডাইনিংরূমের দিকে এগোল সে। 'ভাল কথা, কি বললেন তোমার বস্?

কোলকাতায় কি কাল যেতেই হবে তোমাকে?'

'যেতে হবে, যাব,' বলল রানা। 'নটায়···অত সকালে প্লেন ধরতে একটু খারাপ লাগবে, কিন্তু তা বললে আর কি হবে। চাকরি যখন করি···' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল ও।

রানাকে নিয়ে ডাইনিংরুমে ঢুকল চেরি। 'তারপর? আর কি কথা হলো?'

'তোমার কথা বললাম,' হেসে উঠল রানা। 'বললাম, আমার গার্ল-ফ্রেন্ডকে সাথে করে নিয়ে যেতে চাই।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চেরি। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল সে, চোখে রাজ্যের আগ্রহ আর উত্তেজনা। 'কি বললেন তিনি? রাজি হয়েছেন···অনুমতি দিয়েছেন?'

'বললেন, কাউকে সাথে নিলে তাঁর কোন আপত্তি নেই,' বলল রানা। 'ওখানে গিয়ে কাজটা করতে পারলেই হলো।'

রানার কোমর দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল চেরি। ওর চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগল। 'তাহলে সত্যি আমরা কাল কোলকাতায় যাচ্ছি!' পরমুহূর্তে চেহারা ম্লান হয়ে গেল তার। 'কিন্তু রানা, আমার ভিসার কি হবে?'

'ভিসা কোন সমস্যাই নয়, বুঝলে,' বলল রানা। 'জানো না তো, আমার বসের কি রকম ক্ষমতা। রাতকে যদি দিন করতে হয়, ওই ভদ্রলোক অনায়াসে তাও পারেন। নিজেই বললেন, ভোর ছ'টায় পাসপোর্টটা যেন ইন্ডিয়ান এমব্যাসীতে পৌঁছে দেয়া হয়। আজ রাতেই তিনি টেলিফোন করে ওদেরকে বলে রাখবেন। এই, চেরি, তুমি আমার সাথে সত্যি ঠাট্টা করছ না তো? কাল সকালে আবার বলবে না তো, যাবে না?'

'আমাকে একটা চুমো খাবে?' চোখ বন্ধ করে ফিসফিস করল চেরি।

এক মিনিট শুধু ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ পাওয়া গেল।

'খেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল চেরি।

'মনে হয়···হ্যাঁ, খেয়েছি।'

'এটা যেমন সত্যি,' বলল চেরি, 'কাল তোমার সাথে কোলকাতায় যাচ্ছি, সেটাও তেমনি সত্যি। খুশি?'

'যারপরনাই। কিন্তু কই,' চারদিকে তাকাল রানা। 'মদ কই? আমাকে খাওয়াবে না?'

'ওদিকে তাকাও,' একটা কোণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল চেরি। টেবিলের ওপর নাস্তা সাজানো রয়েছে। 'আমার নিজের হাতে তৈরি করা ওমলেট, ওটা তোমাকে আগে খেতে হবে। তারপর আর কিছু।'

'বাহ্,' প্রশংসার চোখে চারদিকে তাকাল আবার রানা। 'এমন সুন্দর করে সাজানো ডাইনিংরুম তো আগে কোথাও দেখিনি। সত্যি তাই। ঘরটা মস্ত বড়। হালকা, ম্লান সবুজ রঙের দেয়াল। ব্রোকেডের পর্দাগুলো একটু গাঢ় রঙের। আর আসবাবপত্র সবই ঘন, সবুজ রঙের ভেলভেট দিয়ে মোড়া।'

'তোমার ভাল লাগছে?' জানতে চাইল চেরি। 'এসো, খেতে বসো। কাল সকালে যদি যেতে হয়, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে আমাকে। নাস্তা

শেষ করো, বেশি রাত করা চলবে না।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো,' বলল রানা। 'সকাল সকাল উঠতে হবে। ঠিক আছে, আমি বরং এখুনি চলে যাই।'

'দূর বোকা!' হেসে উঠল চেরি। 'এখন আর কতই বা রাত হয়েছে। বারোটাও তো বাজেনি। তাছাড়া, তুমি যেতে চাইলেই বা এখুনি যেতে দিচ্ছে কে! মনে আছে, কথা দিয়েছ, সাঈদের ব্যাপারটা সব আমাকে শোনাবে? কৌতূহল কিন্তু মেটেনি আমার। সাঈদ আর তার সিক্রেট সার্ভিস কর্মকাণ্ড, না শুনে আমি ঘুমাতেই পারব না।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে,' নাস্তার টেবিলে বসল রানা। 'আজ আমার মুড ভাল। যা জানতে চাও সব গড়গড় করে বলে দেব। খুশি?'

রানার সামনের একটা চেয়ারে বসল চেরি। 'এ-থেকে কি বুঝব আমি? আমাকে তুমি বিশ্বাস করো? নাকি, বেশি মদ খেয়ে প্রলাপ বকছ?'

চোখ গরম করে চেরির দিকে তাকাল রানা। 'তোমাকে বিশ্বাস না করলে মদ খেয়ে তোমার কাছে আসি?'

উঠে এসে রানার পাশের চেয়ারে বসল চেরি। একটা হাত দিয়ে রানার মাথার চুল এলোমেলো করে দিল সে। 'আমি খুশি, রানা। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো শুনে আমি খুশি।'

'একটা কথা বলি?' খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা কেন, হাজারটা বলো।'

'বিয়ে যদি করতে হয় তো তোমার মত মেয়েকেই করা উচিত,' বলল রানা।

'এই যে সাহেব, আমি কি ধরে নেব, আপনি প্রস্তাব করছেন?'

'অত আনুষ্ঠানিকতা বুঝি না,' বলল রানা। 'সোজা কথার সোজা জবাব দাও। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, তুমি রাজি হবে?'

'প্রত্যাখ্যান করব, এ-কথা বলতে পারি না,' মিটি মিটি হাসল চেরি। 'তবে ভেবে দেখার জন্যে কয়েকটা দিন নিশ্চয়ই সময় চেয়ে নেব।'

এরপর খাওয়ার দিকেই পুরোপুরি মন দিল রানা। একটু অন্যমনস্ক দেখাল ওকে। ওর পাশ থেকে সরে গিয়ে একটা ভেলভেটে মোড়া কুশনে বসল চেরি। চিবুকে হাত রেখে গভীর মনোযোগের সাথে খাওয়া দেখছে রানার।

রাত দেড়টা। চেরির বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রানা। চেরি শুয়ে আছে ওর হাতের ওপর।

ফিসফিস করছে চেরি, 'যাকে বলে বোকা মেয়ে, আমি তাই। মাত্র দু'দিনের পরিচয় তোমার সাথে, অথচ তুমি যা চাইছ সব দেয়ার জন্যে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছি। কি জানি, একেই কি প্রেম বলে, রানা?'

রানা হাসিতে কোন শব্দ নেই, বলল, 'আমার ব্যাপারটা বলি? যাকে বলে ভাগ্যবান, আমি তাই। এই তো মাত্র পরিচয় হলো, অথচ এত বেশি পাচ্ছি যে দু'হাত ভরে নিয়েও কুলাতে পারছি না। কি জানি, একেই কি বলে

ডাইনির ফাঁদ, চেরি?'

খিলখিল করে হেসে উঠল চেরি। হাসি থামতে বলল, 'ও, আমি বুঝি ডাইনি? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা…'

'উফ লাগে!' ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা। চেরি তার কাঁধে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে।

'ডাইনি নই, ভ্যাম্পায়ার,' হাসতে হাসতে বলল চেরি, 'আমি তোমার রক্ত চুষে খাব।'

'প্লীজ, ভয় দেখিয়ো না, বিছানা ভিজিয়ে ফেললে পরে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।'

আবার হেসে উঠল চেরি। তারপর বলল, 'এই, শুরু করো না! সাঈদের ব্যাপারটা আসলে কি বলো তো? জানো, ওর জন্যে এখন একটু আমার দুঃখই হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল বটে, কিন্তু তবু শায়লার সাথে সিলভার পরিচয় করিয়ে দেয়াটা আমার উচিত হয়নি। আমার বোঝা উচিত ছিল এটা নিয়ে পরে গোলমাল হবে।'

'সাঈদ? ওর কথা আর কি বলব। ও তো একটা কুকুর। কি রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ওর কাঁধে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। জানো, দেশের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল ওর হাতে। কিন্তু শালা এমন মদখোর, মেয়েমানুষের জন্যে এমনই কাঙাল, সব জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছে।'

কয়েকটা সেকেন্ড চুপচাপ কাটল। তারপর চেরি বলল, 'কিন্তু রানা, ওর দিকটাও একটু চিন্তা করে দেখতে হবে তোমাকে। ও যদি সত্যি সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই ওকে বিপজ্জনক কাজ করতে হয়, তাই না? আর ঘন ঘন বিপজ্জনক কাজ করতে হলে তার আচরণে তার তো একটা ছাপ পড়বেই…'

'কেন?' চটে উঠল রানা। 'তা কেন হবে? ওর মত একই কাজ করছি না আমি? কই, আমি সময় নেই, অসময় নেই মদ খেয়ে টর্ হয়ে থাকছি? মেয়েমানুষ দেখলেই তার পিছু দৌড়াচ্ছি? সাঈদ যদি বিশটা কাজ করে থাকে, আমি করেছি দুশো…সবগুলোই ওর চেয়ে বিপজ্জনক কাজ ছিল। কই, আমি তো একটা কাজও ওর মত ব্লান্ডার করিনি।'

বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে চেরি। 'মাই গড! রানা? এ-কথা সত্যি? সত্যি তুমিও সাঈদের মত একজন…?'

'হ্যাঁ,' দাঁত বের করে হাসছে রানা, কোন শব্দ হচ্ছে না। 'এই কাজ আমি অনেক বছর ধরে করছি। আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পরপরই আমার ঘাড়ে এই কাজের দায়িত্বটা দেয়া হলো।'

'কোন্ দায়িত্বটা?' অবাক হয়ে জানতে চাইল চেরি।

'কেন, সাঈদ যেটা গুবলেট করে ছেড়েছে। গোটা ব্যাপারটা শালা একেবারে লেজে-গোবরে করে ছেড়েছিল, বুঝলে। যাক বাবা, ভালয় ভালয় কাজটা আমি শেষ করেছি।'

'আমি কি বোকা, না?' হাসতে লাগল চেরি। 'ব্যাপারটা আগেই আমার

বুঝতে পারা উচিত ছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিসে যে লোক কোলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করতে পারে, অফিস আওয়ার পার হয়ে গেলেও ভিসা জোগাড় করতে পারে, সাথে নিতে পারে গার্লফ্রেন্ডকে, তার চাকরি সাধারণ একটা চাকরি হতে পারে না। তাহলে এই হলো ব্যাপার! মাসুদ রানা একজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট! এই···'রানার কোলের ওপর ঢলে পড়ে ঠোঁটটা ওর মুখের দিকে বাড়িয়ে দিল চেরি। 'আমি কিন্তু দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি।'

অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেল ওরা।

তারপর চেরি বলল, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলছ, সেজন্যে আমি গর্ব অনুভব করছি, রানা।'

'বলব না তো কি! কি অবস্থার ভেতর দিয়ে এসেছি তা যদি জানতে,' বলল রানা। 'কোত্থেকে কিভাবে শুরু করব, কিছুই বুঝছিলাম না। প্রতিটি মুহূর্তে বিপদের ভয় ছিল। দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি, সারাক্ষণ টেনশনের মধ্যে ছিলাম। ভাগ্য গুণে কাজটা শেষ করতে পেরেছি, এখন তো আমার সব কথা কাউকে না কাউকে বলে নিজেকে হালকা করতে হবে। যেহেতু একটা কাজ খুব ভাল করেছি, তাই আরেকটা কাজে কোলকাতায় পাঠাচ্ছেন বস্। একটা টেনশন শেষ হতে না হতে আরেকটা টেনশন, কাউকে সব কথা না বলে আমার কোন উপায় আছে, তুমিই বলো? আমিও তো একটা মানুষ!'

'যাক, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। যতক্ষণ বেঁচে আছ, একটার পর একটা কাজ আসতেই থাকবে। তুমি আমাকে বোকাটার কথা শোনাও, রানা।'

'আগে আমাকে আরও একটু হুইস্কি দাও,' বলল রানা। 'আগাগোড়া সবই বলব তোমাকে। যদিও বিরাট লম্বা একটা কাহিনী।'

বিছানা থেকে নেমে গিয়ে রানার জন্যে একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি নিয়ে এল চেরি। তারপর সে খাটের পাশে, কার্পেটের ওপর হাঁটু ভাঁজ করে বসল। একটা হাত রাখল রানার উরুতে, সেই হাতের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। ভাবছে, পুরুষমানুষ সবাই এক রকম। ওদের প্রত্যেকেরই একটা ব্রেকিং পয়েন্ট আছে, যেখানে পৌছুলে কথা তাকে বলতেই হবে। কেউ এই নিয়মের বাইরে পড়ে না। নিজেকে তার ভাগ্যবতী মনে হলো।

হুইস্কিটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলল রানা। নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে খাটের তলায়, মেঝেতে রেখে দিল গ্লাসটা। 'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট এ-দেশে কাজ করছিল, বেশ অনেক বছর ধরে। বেশ চালাক-চতুর লোক, নাম হেদায়েত খান। তার আস্তানা ছিল সাভারে। আসল কাজ ছিল এ দেশ থেকে তথ্য পাচার করা। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ খুব সাবধান, কাজেই কাজটা খুব সহজ ছিল না।'

'কিন্তু রানা, সাঈদের কথা বলতে গিয়ে এ কার কথা শুরু করলে তুমি?'

'হেদায়েতের ব্যাপারটা না জানলে সবটা তুমি বুঝবে না,' বলল রানা।

'হেদায়েতকে আসলে আমরা প্রথম থেকেই চিনে ফেলি। আমরা জানতাম, সে একটা রেডিও ব্যবহার করছে। তার মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়ে, তাকে আমরা মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করছিলাম। আমরা দেখতে চাইছিলাম, এরপর সে কি করে। এক সময় আমাদের অপেক্ষার শেষ হলো। সে এমন একটা ইনফরমেশন পাচার করল, যার দরুন তেল আবিবে আমাদের বেশ কয়েকজন এজেন্ট ধরা ও মারা পড়ল। আমরা ঠিক করলাম, হেদায়েতকে সরাতে হবে।'

'আচ্ছা!'

'তথ্যটা পাচার করার পর নিরাপদে কেটে পড়ার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছিল হেদায়েত, কিন্তু তবু সে পালাল না। ঠিক তা নয়, আসলে তাকে পালাতে দেয়া হলো না। তার কর্তারা দেখতে চাইছিল, এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাবার পর আমরা কি করি। দেখতে চাইছিল, হেদায়েতের ব্যাপারে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিই। তারা জানত, হেদায়েতকে সরিয়ে দেয়ার পর আমরা ভাবব, বিপদ কেটে গেছে—কাজেই আমাদের সতর্কতায় ঢিল পড়বে।'

'তারা বলতে কাদের বোঝাচ্ছ তুমি, রানা?' জিজ্ঞেস করল চেরি। 'হেদায়েতের বস্, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স না কি যেন বললে, তার ডিরেক্টর? হেদায়েতকে যারা কাজটা দিয়েছিল?'

'হেদায়েত চাকরি করত জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের,' বলল রানা। 'কিন্তু তাকে পরিচালনা করত এ-দেশেরই কেউ একজন। সে-ই হেদায়েতের ইমিডিয়েট বস্ ছিল।'

'দারুণ, রানা দারুণ। ঠিক রহস্যোপন্যাসের মত।'

'এখানেই চলে আসছে সাঈদ প্রসঙ্গ,' বলল রানা। 'হেদায়েতকে সরাবার কাজটা দেয়া হলো তাকে…'

'মাই গড! সাঈদকে দেখে তো একবারও মনে হয়নি যে সে মানুষ-টানুষ খুন করতে পারে…!'

হেসে উঠল রানা। 'আমাকে দেখেও কি মনে হয়, চেরি?'

শিউরে উঠল চেরি। 'না, বাবা—এসব কথা আমি ভাবতে চাই না।'

একটু গম্ভীর হলো রানা। 'কে বলল এগুলো খুন? এ তো দেশ সেবা, চেরি।'

'হ্যাঁ, তা বটে, সে-কথা ঠিক,' সায় দিল চেরি। 'শান্তির সময়ে তোমরা আসলে এক ধরনের যুদ্ধে রয়েছ, তাই না?'

'তাই,' বলল রানা। 'হেদায়েতের ডিরেক্টর চাইছিল, হেদায়েতকে যে সরাতে যাবে তাকে অনুসরণ করে আমাদের বি.সি.আই.-এর অন্য সব এজেন্ট আর গোপন আস্তানার সন্ধান জেনে নেবে তারা। এরজন্যেই হেদায়েতকে তারা হারাতে রাজি হয়।'

'তারপর?'

'কাজটা দেয়ার জন্যে রঁদেভোয় সাঈদের সাথে যোগাযোগ করা হয়,' বলল রানা। 'ওখানে এমন কেউ একজন ছিল, যে সাঈদকে সন্দেহ করত।

সাঈদ অত রাতে টেলিফোন পেয়ে ক্লাব থেকে চলে গেল দেখে সে আন্দাজ করে নেয়, হেদায়েতকে সরাবার জন্যে সাভারে পাঠানো হচ্ছে সাঈদকে।'

'সে কি! রঁদেভোয় ছিল সে! তারমানে···তারমানে···রানা!'

'হ্যাঁ, সে এমন একজন কেউ, যাকে সবাই তোমরা চেনো,' বলল রানা। 'তার নাম দ্য সিলভা।'

চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে চেরির। বেশ কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর বলল, 'রানা···এ যে ভয়ঙ্কর! সিলভা···কে ভাবতে পেরেছিল··· মাই গড!'

'সাভার থেকে ঢাকায় ফিরল সাঈদ, সাথে সাথে তার পেছনে ফেউ লাগল,' আবার শুরু করল রানা। 'সিলভার ভাগ্য ভাল, পরদিন সাঈদকে আরেকটা কাজ দেয়া হলো। তেল আবিবে যারা আমাদের এজেন্ট তাদের একটা তালিকা দিয়ে তাকে বলা হলো পরদিন সকালে যেন ওটা সে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়। তালিকাটা নিয়ে তার বাড়ি ফেরার কথা। তা না ফিরে মাতালটা ঢুকল একটা বারে। তার পিছু পিছু ঢুকল একটা মেয়ে, কিন্তু সাঈদ তা জানল না। মেয়েটা সুন্দরী, যেচে পড়ে তার সাথে আলাপ করল সাঈদ। সুন্দরী মেয়ে দেখলে বরাবরই তাই করে সে। তার এই দুর্বলতা সম্পর্কে প্রতিপক্ষরা জানত। সেজন্যেই তারা মেয়েটাকে সাঈদের পেছনে লাগায়। সাঈদ মেয়েটার সাথে তার ফ্ল্যাটে যায়, রাত কাটায়। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখে মেয়েটা চলে গেছে, তালিকা নেই।'

'এই মেয়েটা, তার পরিচয় জানতে পেরেছ, রানা? কোন ভাবেই কি জানা সম্ভব নয়?'

'জানি না, তবে জানব তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'সিলভাই আমাকে জানাবে।'

রানার নগ্ন উরুতে গাল ঘষতে শুরু করল চেরি। 'তুমি সত্যি কাজের লোক, রানা। তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত।'

'আমাদের হাতে এমন কিছু এসেছে, সিলভার আত্মা খাঁচা ছাড়া করার জন্যে যথেষ্ট,' বলল রানা। 'প্রথম থেকেই শোনো তাহলে। ওরা সাঈদের ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখার জন্যে একজন লোককে লাগায়। আমরা সেটা জানতে পারি। তার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। লোকটার পকেট থেকে একটা চিঠি পাই আমি, সিলভার লেখা। চিঠি পড়ে বোঝা গেল, লোকটার সাথে সিলভার বনিবনা হচ্ছিল না। ঝগড়াটা সম্ভবত টাকা পয়সা নিয়েই। সিলভা একজন স্প্যানিশ, শুধু টাকার লোভেই জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করছে। কোন কারণে ভয় পেয়ে পালাতে চাইছিল সিলভা, কিন্তু কাজ পুরোপুরি শেষ না করলে তাকে ওরা টাকা দিতে রাজি হচ্ছিল না—এইটাই বোধহয় ঝগড়ার কারণ ছিল।'

'তা সেই লোকটার কি ব্যবস্থা করলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল চেরি। 'তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠালে?'

'খালি একটা বাড়িতে তার লাশ পাওয়া যায়,' বলল রানা। 'লাশের

পকেট থেকে সিলভার লেখা চিঠিটা আমাদের হাতে আসে। তারমানে আমার গল্পটা এই রকম দাঁড়াতে যাচ্ছে—লোকটাকে সিলভা খুন করেছে। বুঝতেই পারছ, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট তার এই বিপদে কোন কাজেই আসবে না। খুনের অভিযোগে কাঠগড়ায় তাকে দাঁড়াতেই হবে।'

চেরি মৃদু সুরে, ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু তাতে তোমার লাভ কি, রানা? আসল যে কথাটা জানতে চাও, সেটা তুমি এখনও জানো না।'

'চিন্তা কোরো না, সে-ব্যাপারে একটা বুদ্ধি করে রেখেছি,' বলল রানা। 'সিলভা নিজের দেশে ফেরার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সকাল সাতটায় ফ্লাইট ধরবে সে, তার মানে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাবে ছ'টায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে, বুঝলে, এখান থেকে তোমাকে তুলে নেয়ার জন্যে আসার পথে, ওর সাথে দেখা করব আমি। যখন কোন বিপদের ভয় করছে না, এই সময় আমাকে দেখলে ওর মাথা ঘুরে যাবে। ওর সাথে দেখা করে আমি ওকে একটা প্রস্তাব দেব।'

রানার চোখে চোখ রেখে হাসল চেরি। তার দৃষ্টিতে প্রশংসা, মুগ্ধ একটা ভাব দেখল রানা। 'তারমানে,' বলল চেরি। 'সিলভার কাছ থেকে কথা আদায় করবে তুমি। ওকে কথা বলাবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যে-কোন একটা বেছে নিতে বলব তাকে। গ্রেফতার হয়ে খুনের আসামী হিসেবে বিচারের ঝুঁকি নিতে পারে, তারমানে নির্ঘাত ফাঁসি। নয়তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পালাবার সুযোগ নিতে পারে। তাকে আমি জিজ্ঞেস করব সেই মেয়েটার কথা, সাঈদ যার ফাঁদে পড়েছিল। ঠিকানা আর পরিচয় চাইব আমি। অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও আমার জানা নেই, এক এক করে সেগুলো আমি জানতে চাইব। যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, স্পেনে যেতে কেউ তাকে বাধা দেবে না। আর যদি না পারে…' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

এরপর দু'জনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। নিস্তব্ধতা ভাঙল চেরি, 'সত্যি তুমি বুদ্ধিমান বটে, রানা। কিন্তু, ধরো, সিলভা যদি কথা বলতে ভয় পায়? ধরো, সে জানে, মুখ খুললে স্পেনে তার আত্মীয়-স্বজনকে মেরে ফেলা হবে? তারপর ধরো, ব্যাংকে যে মোটা অঙ্কের টাকা তার নামে জমা আছে সেটা যাতে সে না পায়, তার ব্যবস্থা করা হবে। এ লাইনে কেউ যদি মুখ খোলে, তার বিরুদ্ধে এই সব ব্যবস্থাই তো নেয়া হয় বলে গল্পের বইয়ে পড়ি আমরা। তাহলে? সে যদি মুখ না খোলে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'মুখ সে খুলবেই,' বলল ও। 'কারণ, আসল প্রশ্নটা তাকে আমরা জিজ্ঞেস করব না। শুধু রহস্যময় মেয়েটার পরিচয় আর ঠিকানা জানতে চাইব। এই ছোট্ট একটা প্রশ্নের উত্তর দিলে যদি প্রাণ বাঁচে, সিলভার মত লোক উত্তর দিতে দেরি করবে না। ভাববে, পরে কি হয় না হয় সেটা পরে দেখা যাবে, এখন তো জান বাঁচাই। আর আমরা, মেয়েটার সন্ধান পেলে, আসল প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকেই পেয়ে যাব।'

হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল চেরিকে। 'রানা, তোমার জন্যে আমার ভয়ই করছে।

লাইনটাই এমন বিপজ্জনক যে, যে-কোনদিন একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। ভালয় ভালয় এই ব্যাপারটা মিটে গেলে বাঁচি। সিলভার কাছে যেতে চাইছ, যাও। কিন্তু খুব সাবধানে, লক্ষ্মীটি। কোন রকম ঝুঁকি নিয়ো না। সিলভার মত লোকেরা সুযোগ পেলে ছাড়ে না। তবে আমি জানি, ওর মুখ তুমি খোলাতে পারবে।'

'কিচ্ছু ভেব না তুমি, চেরি,' অভয় দিল রানা। 'এটা কোন কাজই নয়। সিলভা কথা বলার পর আমার দায়িত্ব শেষ। আমার লোকজনদের টেলিফোন করে দেব, বাকিটা তারাই সামলাবে। ওখান থেকে সরাসরি তোমার কাছে চলে আসব আমি। তুমি কিন্তু কাপড়চোপড় পরে একেবারে রেডি হয়ে থাকবে। গাড়িতে তোমাকে তুলে নিয়ে সোজা চলে যাব এয়ারপোর্টে।'

'কিন্তু আমার ভিসা?'

'তোমার পাসপোর্টটা এখনই যাবার সময় নিয়ে যাব আমি,' বলল রানা। 'কাউকে দিয়ে আজ রাতেই ইন্ডিয়ান এমব্যাসীতে পাঠিয়ে দেব ওটা। কাল সকালে এয়ারপোর্টে পৌঁছে তার কাছ থেকে চেয়ে নেব পাসপোর্ট আর ভিসা।'

হলঘরের দেয়াল-ঘড়ি থেকে ঢং করে একটা ঘণ্টা পড়ার আওয়াজ ভেসে এল। রাত আড়াইটা।

'আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না তোমার,' বলল চেরি। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে। 'দাঁড়াও, পাসপোর্টটা তোমাকে নিয়ে এসে দেই,' বলে চলে গেল সে।

পাসপোর্ট নিয়ে ফিরে এসে চেরি দেখল, কাপড়চোপড় পরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে রানা। বলল, 'দেখো, দেরি করে ফেলো না আবার। আর খুব সাবধানে থেকো, লক্ষ্মীটি। তোমার কথা ভেবে আমি ঘুমাতেই পারব না। সকালে যা চেহারা হবে না!' চুমো খাবার জন্যে মুখটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল চেরি। তারপর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল সে। শুনতে পাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে রানা, ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল ওর পায়ের আওয়াজ।

# বারো

টেবিল-ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ না খুলেই হাত বাড়াল ও, অ্যালার্মটা থামাল।

কয়েক মিনিট পড়ে রইল রানা। চোখ মেলে আড়মোড়া ভাঙল, আঙুল দিয়ে রগড়াতে শুরু করল ভারী চোখ দুটো। বিছানার ওপর উঠে বসে পা

জোড়া খাট থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিল ও। ঘড়ির দিকে তাকাল না, জানে, সাতটা বাজতে এখনও বাকি আছে পাঁচ মিনিট।

দশ মিনিট পর ড্রইংরুমে ঢুকল রানা। এর মধ্যে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে, জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিয়েছে। গ্যাসের চুলোয় চা বসিয়ে দিয়ে এসেছে, ডিম সেদ্ধ করার কাজটা সেরে ফেলেছে আগেই। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা নাম্বারে ডায়াল করল ও। তিনবার রিঙ হবার পর অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল সোহেল। ঘুম জড়ানো গলায় সাড়া দিল সে, 'হ্যালো?'

'তোর ঘুম ভাঙালাম,' বলল রানা। 'কথা বলব একটু পর।' রিসিভার রেখে দিয়ে কিচেনে চলে এল ও।

একটা জোড়া ডিম সেদ্ধ, খানিকটা পনির, দুটো বিস্কিট খেয়ে চায়ের কাপ হাতে নিল রানা, ফিরে এল ড্রইংরুমে। আবার ডায়াল করল সোহেলের নাম্বারে।

'বল্,' জানতে চাইল সোহেল। 'নিশ্চয়ই সুখবর দিবি?'

'শোন্,' বলল রানা। 'সাঈদের জন্যে একটা কাজ আছে। টিনা রায়কে মনে আছে তোর?...হ্যাঁ। এবার তার সাথে দেখা করার সময় হয়েছে—সাঈদকেই পাঠা। মেয়েটাকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসবে ও—মানে, যদি পারে আর কি।'

'মানে? যদি পারে বলতে কি বোঝাতে চাইছিস?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল সোহেল।

'কি বলতে চাইছি সেটা পরে বুঝতে পারবি। ওকে তুই পাঠা তো।'

'ঠিক আছে, সাঈদের সাথে আমি যোগাযোগ করব।'

'করব নয়, এখুনি কর। ওর একটা গাড়ি লাগবে। আমি চাই এখন থেকে আধঘণ্টার মধ্যে মেয়েটার ঠিকানায় পৌঁছুবে ও। কাজটা শেষ করে আমার সাথে দেখা করতে হবে ওকে। সিলভার ওখানে, বুঝতে পারছিস? ফ্ল্যাটে নয়, বাইরে, রাস্তায়। আটটার আগেই যেন দেখা করে। দেরি করে পৌঁছুলে আমাকে পাবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল সোহেল। 'তুই খুব ব্যস্ত, নারে? এখন তুই কোথায় যাবি?'

'এখন না কব কথা, আনিয়াছি তৃণলতা, আপনার বাসা আগে বুনি... সত্যি, সময় নেই, দোস্ত। পরে কথা হবে, কেমন?' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা।

তিন চুমুকে চা-টুকু শেষ করে পায়চারি শুরু করল ও, হাত দুটো পিছনে। মঞ্চে যাবার সময় বেশির ভাগ অভিনেতার যে-ধরনের ভয় লাগে, ওর অস্বস্তিবোধটাও অনেকটা সেরকম। যেমনটি কল্পনা করেছে ঠিক তেমনটি যদি না ঘটে থাকে, যদি কোথাও কোন ব্যত্যয় হয়ে থাকে, তাহলে বিকল্প কিছু ব্যবস্থার দরকার হতে পারে—ব্যবস্থাগুলো কি হবে মনে মনে ঠিক করে নিতে চেষ্টা করছে ও।

মানুষ সম্পর্কে ধারণা করা সত্যি কঠিন, ভাবল ও। এক একবার মনে হয় বটে, অমুককে আমি ভাল করে চিনি, জানি এই অবস্থায় পড়লে তার কি আচরণ হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখা যায়, যা আশা করা হয়েছিল ঠিক তার উল্টোটা করে বসে আছে সে।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে প্ল্যানটা তৈরি করেছে রানা। সব যদি প্ল্যান মত ঘটে, অনেকগুলো সুবিধে পাওয়া যাবে। নিজেদের হাত নোংরা করতে হবে না। বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে ফল্‌স পজিশনে পড়তে হবে না। যে ব্যাখ্যাটা দেয়া হবে সেটা বিশ্বাসযোগ্য তো হবেই, বাংলাদেশকে কোনভাবেই কেউ দায়ী করতে পারবে না। এক কথায়, সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

দরজায় তালা দিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল রানা। গাড়ি ছুটল গুলশানের দিকে।

পরিচিত ফ্ল্যাট বাড়ির কাছাকাছি গাড়ি থামাল রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়। পকেট থেকে চাবি বের করে সিলভার ফ্ল্যাটের দরজা খুলল ও। খোলার সময় ভাবল, ভেতরে ঢুকে যদি দেখে ঘর খালি, চিড়িয়া পালিয়েছে, তাহলে আবার নতুন করে পড়তে হবে ঝামেলায়।

প্যাসেজে ঢুকে রানা দেখল, ড্রইংরুমের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে কাউকে দেখল না। শুধু সিগারেটের গন্ধ ঢুকল নাকে। ধারণা করল, সারারাত ঘুমায়নি সিলভা, বসে বসে সিগারেট ফুঁকেছে।

ড্রইংরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কান পাতল ও। না, কোথাও কোন শব্দ নেই। বেডরুমের দরজাটাও খোলা দেখে সেদিকে এগোল ও। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল বটে, কিন্তু তারপর আর এগোল না। কবাটের গায়ে হেলান দিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, ধীরে ধীরে সন্তুষ্টির ভাব ফুটল চেহারায়। তারপর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসি।

ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সিলভা। ছুরিটা মারা হয়েছে তার পিছন থেকে, ঘাড়ের ওপর। টেবিলটা রক্তে ঢাকা পড়ে গেছে, নিচে পড়ে কার্পেটেও খানিকটা জমাট বেঁধেছে। লাশের ডান হাতে এখনও ধরা রয়েছে একটা পারকার কলম।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। চোখে আগ্রহের কোন আলো নেই, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

বোঝা যায়, আচমকা আক্রান্ত হয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল সিলভা। দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে চেয়ারে বসে রয়েছে সিলভা, যা লিখতে অনুরোধ বা আদেশ করা হয়েছে লিখছে সে, এই সময় ঘ্যাচ করে তার ঘাড়ে ছুরি ঢুকল। যে হাত থেকে কাজের বিনিময়ে টাকা নিয়েছে সিলভা সেই হাতই ছুরি মেরেছে তাকে। টাকাটা সিলভাকে দেয়ার সময় খারাপ লাগেনি তার, কারণ জানত ওই টাকা একটু পরেই সে ফেরত নেবে।

এগিয়ে গিয়ে লাশের পাশে দাঁড়াল রানা। টেবিলের ওপর একটা কাগজ রয়েছে, সিলভার ডান হাতের কাছাকাছি। কাগজটায় একটা মাত্র শব্দ লিখতে

পেরেছিল সিলভা—রিসিভড।

মৃদু হাসল রানা। তার অনুমানই ঠিক তাহলে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বেডরূম থেকে বেরিয়ে এল ও।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখল, ওর গাড়ির পাশেই গাড়ি দাঁড় করিয়েছে সাঈদ। রানাকে রাস্তা পেরোতে দেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, সাঈদ? তোমার বউ ফেরত পেয়েছ তো?'

হাসি চেপে রাখা দায় হলো সাঈদের। 'মাসুদ ভাই, আপনাকে একদিন আমাদের বাড়িতে চা খেতে যেতে হবে। ও আপনার সাংঘাতিক ভক্ত হয়ে পড়েছে।'

'যাব, খুব তাড়াতাড়ি একদিন যাব—তবে আমেরিকা থেকে ঘুরে আসার আগে নয়,' বলল রানা। 'তা, সাঈদ, টিনা রায়কে পেলে?'

মাথা ঝাঁকাল সাঈদ। 'পেয়েছি, মাসুদ ভাই। মারা গেছে।'

'তাই? তা, কিভাবে মারা গেল বলে তোমার ধারণা?'

'আমি জানি,' বলল সাঈদ। 'বিষ খেয়েছে।'

রানা মৃদু হাসল। 'আসলে কি জানো? আমার সন্দেহ আছে। দেখে বুঝি মনে হলো, চমৎকার একটা আত্মহত্যা, কোন খুঁত নেই?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সাঈদ বলল, 'দেখে তো তাই মনে হলো...'

'তোমাকে কেউ দেখেনি তো?' জানতে চাইল রানা। 'ঢোকার বা বেরুবার সময়?'

মাথা নাড়ল সাঈদ। 'কেউ দেখেনি। আর টিনা ছাড়া, মানে ওর লাশ ছাড়া বাড়িটায় আর কাউকে পেলাম না। কিন্তু, মাসুদ ভাই ও আত্মহত্যা করতে গেল কেন বলুন তো?'

'আত্মহত্যা করেনি,' বলল রানা। 'ওকে খুন করা হয়েছে, কিন্তু সাজানো হয়েছে এমন ভাবে যাতে দেখে মনে হয় আত্মহত্যা করেছে। ঠিক আছে, সাঈদ, এটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।'

রাস্তার ওপারের ফ্ল্যাট বাড়ির দিকে একবার তাকাল সাঈদ। 'আমি ভেবেছিলাম, ওখানে আমাকে পাঠানো হবে...'

'ওখানে কোন কাজ থাকলে তো,' বলল রানা। 'ওখানেও আমাদের কাজ অন্য কেউ করে দিয়ে গেছে। এইমাত্র লাশটা দেখে এলাম আমি।'

'কি এমন কলকাঠি নাড়লেন, মাসুদ ভাই, যে...'

হেসে উঠল রানা। 'সো লং, সাঈদ। আবার আমাদের দেখা হবে, কেমন?' বলে নিজের গাড়ির দিকে এগোল রানা।

কলিংবেলের বোতামে আঙুল যা ঠেকাতে দেরি, সাথে সাথে খুলে গেল দরজা, রানা দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে চেরি।

দামী একটা কাঞ্জিভরম পরেছে চেরি, সেজেগুজে একেবারে তৈরি হয়ে আছে। রানা ভাবল, সত্যি, কি সুন্দর লাগছে ওকে।

'তোমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে স্থির থাকতে পারছিলাম না,' বলল চেরি। রানার একটা হাত ধরল সে। 'ভাবছিলাম তুমি বোধহয় আর এলেই না!'

'তোমার অবস্থা কি এতই খারাপ যে আমার জন্য হলঘরে এসে অপেক্ষা করছিলে?' রানা হাসছে। 'যাকে বলে একেবারে উন্মাদিনী তাই হয়ে পড়েছ?'

'জাহাঁপনা, ঠিক ধরেছেন,' আড়চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল চেরি। 'আমার অবস্থা এতই খারাপ যে আপনাকে না দেখলে মনে হয় আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব…'

'মিথ্যুক!' তীক্ষ্নস্বরে বলল রানা। ওর চোখ দুটো যেন কঠিন পাথর হয়ে উঠল।

চেরি যেন কেঁপে উঠল। তার শরীর শক্ত হয়ে গেল। তীক্ষ্ন কঠিন শোনাল তার গলা, 'কি বলছ? এসব কি?'

পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল রানা। 'কিছুই জানো না, না? ঘোরো, ড্রইংরুমে ঢোকো। কোন রকম বোকামি করতে যেয়ো না আবার। এখন আর তোমার অভিনয় না করলেও চলবে, নাটক শেষ হয়ে গেছে।'

দ্রুত ঘুরল চেরি, হলঘর পেরিয়ে ঢুকল ড্রইংরুমে। ভেতরে ঢুকে রানার মুখোমুখি হলো সে। 'রানা, কি ঘটেছে আমি জানি না…'

'রাতটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আসলেই তুমি একটা ভ্যাম্পায়ার, চেরি।'

আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল চেরি, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কথা তো আমরা কম বলিনি, আর কথা বলে লাভ কি?' রানার হাসিতে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে চেরি, শরীরের পাশে হাত দুটো ঝুলছে। এরই মধ্যে ঘামের সাথে লেপ্টে যেতে শুরু করেছে মুখের মেকআপ। প্রায় শান্তই দেখাল তাকে, শুধু একটু জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

'রূপ আছে তো, ধরাকে তোমরা সরা জ্ঞান করো! মনে করো তোমাদের মত চালাক আর কেউ নেই,' বলল রানা। 'নিজেদের কাজে যে খুঁত থাকতে পারে, এ-কথা তোমাদের একবারও মনে হয় না।'

'তাই? তা কি খুঁত তুমি আবিষ্কার করলে, জানতে পারি? বললে আমার উপকার হবে, ইউ বাস্টার্ড!'

'সত্যি জানতে চাও, কি ভুল করেছ? কিন্তু জেনে লাভ কি, তোমার তো আর সময় নেই।'

'আই ফা—ইউ!' অশ্লীল একটা গাল দিল চেরি।

'মেয়ে হয়ে?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আসলে নোংরা থেকে উঠে এসেছ তুমি, তাই জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স তোমাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পেয়েছে। চেরি, তুমি জানো, সবগুলো চালই তোমার ভাল ছিল, শুধু চিঠির ব্যাপারটা বাদে।'

'চিঠি?'

'তোমাকে যেটা লিখেছিল সিলভা,' বলল রানা।

'সিলভা আমাকে কোন চিঠি লেখেনি,' কঠিন সুরে বলল চেরি।

'লিখেছিল। সিলভা চিঠিটা শুরু করেছিল এইভাবে,—ডিয়ার সিনোরা। কিন্তু তুমি দ্বিতীয় শব্দটার শেষ অক্ষর, ইংরেজী বর্ণমালা একটা এ, রবার দিয়ে মুছে ফেলো। মুছে ফেলার পর সেটা হলো—ডিয়ার সিনর। আগে বোঝাত একটা মেয়েকে সম্বোধন করা হয়েছে, তোমার কারিগরির ফলে বোঝাল, একজন পুরুষকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে চিঠিটা। এরপর তুমি কি করলে? চিঠিটা মোটাসোটা এক লোকের জ্যাকেটের পকেটে লুকিয়ে রেখে দিলে, আর সেই লোককেই পাঠালে সাঈদের ওপর নজর রাখার জন্যে। তুমি জানতে লোকটাকে আমরা ধরব। এ-ও জানতে, লোকটা ধরা পড়লে সিলভা ফেঁসে যাবে। তুমি ভেবেছিলে, তোমাদের আরেকজন লোককে নিয়ে আমরা যা করেছি, সিলভাকে নিয়েও তাই করব। আরেকজন লোক মানে কে, বুঝতে পারছ তো? আমি হেদায়েত খানের কথা বলছি।'

পাথর হয়ে গেছে চেরি। স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি ভেবেছিলে সিলভাকে আমরা খুন করব, চেয়েছিলেও তাই। তাহলেই নির্বিঘ্নে এখানে তুমি দায়িত্ব পালন করে যেতে পারতে। ভেবেছিলে, হেদায়েত আর সিলভাকে সরিয়ে দিয়ে আমরা ভাবব, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের আর কেউ এ-দেশে নেই। টিনা রায় গভীর জলের মাছ নয়, কাজেই তার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা বিশেষ মাথা ঘামাব না, এই ছিল তোমার ধারণা।'

রানা লক্ষ করল, বেডরুমের দরজার দিকে একবার তাকাল চেরি।

'আমার সমস্ত কাজ তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছি আমি,' বলল রানা। হেসে উঠল ও। 'জানি, রাতটা তোমার খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। এমনই বোকা তুমি, চোখ বন্ধ করে পা দিয়েছ আমার ফাঁদে। আজ সকালে আমি সিলভার সাথে দেখা করব শুনে তুমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলে—পড়ারই কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সিলভার সাথে দেখা করার কাজটা কাল রাতে এখানে আসার আগেই সেরে ফেলেছিলাম আমি। এখানে আসার আগে টিনার ঠিকানাও জেনে এসেছিলাম।'

'আমি একটু বেডরুমে যেতে চাই,' বলল চেরি।

'কাল রাতে,' আবার শুরু করল রানা, চেরির কথা যেন শুনতেই পায়নি, 'আমি এখান থেকে চলে যাবার পর তুমিও বেরিয়ে পড়ো। টিনার কাছে যাও তুমি, তাকে বিষ খাওয়াও। কিভাবে খাইয়েছ, আমি জানি না, জানতেও চাই না। টিনার ওখান থেকে এরপর তুমি যাও সিলভার ফ্ল্যাটে। সেখানে সিলভাকেও তুমি খুন করো।

'পালাবার একটা সুযোগ আছে না জানলে এতসব করার সাহস তোমার হত বলে মনে হয় না। কোলকাতায় তোমাকে নিয়ে যাব, আমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই তোমার সাহস বেড়ে যায়। ভেবেছিলে, সবাইকে শেষ করে কোলকাতায় একবার পৌঁছুতে পারলে এ-যাত্রা তুমি বেঁচে যাবে।

ওখানে পৌঁছে আমার একটা ব্যবস্থা তুমি নিশ্চয়ই করতে। ওখানে তোমাদের আরও লোক আছে, তাদের সাহায্য পেতে তোমার কোনই অসুবিধে হত না। তারপর, আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এলে, আবার ফিরে আসতে ঢাকায়। নতুন করে শুরু করতে তথ্য সংগ্রহ আর পাচারের কারবার।

'তোমার জন্যে কি ভালই না হত আমি যদি ধরে নিতাম সিলভাকে অন্য কেউ খুন করেছে। এখানে আমি আসতাম, তোমাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যেতাম। কিন্তু সত্যিই কি যেতাম, চেরি? যেতাম যদি কোলকাতায় বেড়ানোর সত্যি কোন প্ল্যান থাকত আমার, যদি আজ সকালে সত্যি কোন ফ্লাইট থাকত।'

'সব মিথ্যে কথা!' হিস হিস করে উঠল চেরি।

'রাবিশ! বোকার মত কথা বোলো না। অস্বীকার করো, চিঠিটা সিলভা তোমাকে লেখেনি?'

'যদি অস্বীকার করি?'

'চিঠির কোথাও আধ ইঞ্চি জায়গা নেই যেখানে তোমার হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি,' বলল রানা।

আর কিছু বলল না চেরি। রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, চোখে কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব।

'বাইরে আমার গাড়ি আছে, চেরি,' বলল রানা। 'তোমাকে একটু আমার সাথে আসতে হবে। কোলকাতায় নিয়ে যেতে পারব না, দুঃখিত, কিন্তু আমাদের অফিসে...'

'আমার শরীর ভাল নেই,' ক্লান্ত সুরে বলল চেরি। 'কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'আমি একটু বেডরুমে যেতে চাই। আমার এই একটাই অনুরোধ—রাখো, রানা। তোমার কাছে আর কোন দাবি নেই আমার। প্লীজ, রানা।' রানার মনে হলো, চেরির চোখে পানি। 'একটু বিশ্রাম নিতে দাও আমাকে!'

পকেট থেকে ল্যুগারটা বের করে হাতে নিল রানা। 'ঠিক আছে, যাও। কিন্তু কোন রকম চালাকি করবে না। চালাকি করার কিছু নেই-ও, চেরি। তুমি শেষ হয়ে গেছ।'

খোলা দরজা দিয়ে বেডরুমে ঢুকল চেরি। চৌকাঠ পেরিয়ে যাবার আগে রানার দিকে একবার তাকাল। বিড়বিড় করে কি বলল চেরি, রানা এতদূর থেকে শুনতে পারল না।

হাতে পিস্তল নিয়ে ড্রইংরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তিন কি চার মিনিট পেরিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে বেডরুমের দরজায় দাঁড়াল ও। দেখল, বিছানার ওপর শুয়ে রয়েছে চেরি, একটা হাত দিয়ে পেট খামচে ধরে আছে। এগিয়ে এসে বিছানার সামনে দাঁড়াল রানা। অনেক কষ্টে, শেষ শক্তি দিয়ে, চোখ মেলে রানার দিকে তাকাল চেরি। তার চোখে করুণাভিক্ষার আবেদন ফুটে উঠতে দেখল রানা। পর মুহূর্তে মাথাটা এক পাশে কাত হয়ে গেল।

পালস্ দেখল রানা। থেমে গেছে।

লাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অনেকক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তারপর এক সময় কাঁধ ঝাঁকাল ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বাড়িতে ফিরে ড্রইংরুমে বসল রানা। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

'সোহেল স্পিকিং।'

'তোর দুলাভাই স্পিকিং,' বলল রানা। 'শ্যালকপ্রবর, শোন্, বসকে বল, আমার কাজ আমি শেষ করেছি। আজ দুপুরে রিপোর্ট করব।'

'কাজ শেষ করেছিস মানে? সব দিক…?'

'হ্যাঁ, সব দিক বেঁধে দিয়েছি, কোথাও কোন খুঁত রাখিনি।'

'তারমানে তুই বলতে চাইছিস, সব একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ, একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছি,' বলল রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, চেরিই আমার হয়ে কাজটা করে দিয়েছে। শোন্, ওর ফ্ল্যাটে কাউকে পাঠিয়ে দে। যা ঘটেছে, ওখানে গিয়ে আবিষ্কার করুক সে। চেরিকে বেডরুমে পাবে। আমাদের কাউকে পাঠাবি না, শায়লাকে পাঠালে মন্দ হয় না। বুঝতে পারছিস আমার কথা? ব্যাপারটা নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি হবে, তাই না? লাশের ছবি ছাপা হবে। লাশ যে আবিষ্কার করেছে তারও একটা ছবি ছাপা হবে। শায়লা বেচারি অনেক খেটেছে, কি বলিস? কাগজে ওর একটা ছবি ছাপা হলে ভালই হয়।'

'খুবই আর্টিস্টিক চিন্তা-ভাবনা,' উৎসাহের সাথে বলল সোহেল। 'ঠিক আছে, এদিকটা আমরা সামলাব। তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমাদের বিদেশী বন্ধু, তার কি খবর?'

'সিলভা আর টিনা, ওদের দু'জনেরই কপাল খারাপ,' বলল রানা। 'চেরি ওদের ওপর সাংঘাতিক রেগে গিয়েছিল। আর রেগে গেলে চেরি যে কি করতে পারে, সিলভার ওখানে গিয়ে দেখ, তাহলে টের পাবি। আর টিনার ব্যাপারটা সাঈদের কাছ থেকে জানতে পারবি।'

'সাঈদ আমাকে ফোন করেছিল। ঠিক আছে, রানা, তুই বিশ্রাম নে,' বলল সোহেল। 'এসব খুঁটিনাটি দিকগুলো আমরা এখান থেকে সামলাচ্ছি।'

'দুপুরে আসছি আমি,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা।

দুপুরে রানা অফিসে পা দিতেই তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল। ওর উপস্থিতি টের পেয়েই যে যেখানে ছিল ছুটে এল সবাই। এবং একসাথে সবাই এমন ভাবে ব্যাক্যবাণ ছুঁড়ে দিতে লাগল যে নরক একেবারে গুলজার হয়ে উঠল। ওদেরকে থামাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ওর কথায় কান দেয়া হলো না। আক্ষরিক অর্থেই ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো সোহেলের কামরায়।

ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে বসে আছে সোহেল। হাতে সদ্য ধরানো

সিগারেট। মুখটা থমথম করছে।

ইতোমধ্যে ওদের কথা থেকে রানা বুঝেছে, সবারই একটা অভিযোগ। আর সেটা হলো, এই অ্যাসাইনমেন্টের প্ল্যান ও-ই তৈরি করেছিল, কিন্তু সেটা সোহেল সহ সবার কাছে চেপে গিয়েছিল ও। এতে করে নাকি, বিশেষ করে সোহেলকে বোকা বানানো হয়েছে, অপমান তো করা হয়েইছে। আসল কথাটা ওরা এই খানিক আগে, বসের কাছ থেকে জেনেছে। বস্ সোহেলকে ডেকেছিলেন, তখনই বলেছেন তিনি।

'তোর বিচার হবে,' ঘোষণা করল সোহেল। 'বিচারক সলীল, আমার উকিল আমি নিজেই। তোর উকিল কে বল।'

সবাই জানিয়ে দিল, রানার উকিল হতে কেউ রাজি নয়।

অগত্যা রানা বলল, 'ঠিক আছে, কি আর করা, আমিই আমার উকিল।'

'বিচারের কাজ শুরু হলো,' ঘোষণা করল সলীল।

'হুজুর,' বলল রানা, 'আগে আমার একটা আর্জি শুনুন। আমি যদি অপরাধ করে থাকি, যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নেব। কিন্তু তার আগে পরম শ্রদ্ধেয় মেজর জেনারেল রাহাত খানের বিচার হওয়া দরকার বলে মনে করি আমি।'

'কেন? কেন?' বিচারক চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কারণ, প্ল্যানটা যে আমার তৈরি,' বলল রানা, 'সে-কথা উনি জানতেন। উনি কাউকে বলেননি, তাই আমিও কাউকে বলতে সাহস পাইনি। এখন, মাননীয় বিচারক, আপনিই বিচার করুন...'

'মামলা ডিসমিস,' ঘোষণা করল সলীল। 'কারণ এই আদালত মেজর জেনারেল রাহাত খানের বিচারের অধিকার রাখে না।'

কিন্তু তাই বলে বিপদ কাটল না রানার। সোহেল বলল, 'শালা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বুঝলি। সব কথা বলার এখন আর প্রয়োজন বোধ করে না।'

জাহেদ বলল, 'সবাই মিলে রাতদিন এত প্রশংসা করা হলে, এই-ই তো হবার কথা। গর্বে শালার মাটিতে পা পড়ছে না। তোরা অনুমতি দে, শালার ভুঁড়িটা ফাঁসিয়ে দিই।'

সাবধানের মার নেই, পেটে হাত চাপা দিল রানা।

সলীল বলল, 'ও আর আমাদের লোক নয়, বুঝলি। বসের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে...'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল রানা। তারপর চোখ বুজে হেঁড়ে গলায় ধরল আবৃত্তি: কবিগুরুর কবিতা—

একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা সুধায়েছিলে মোরে ডাকি
'পরিচয় কোনো আছে নাকি,
যাবে কোন্‌খানে?'

আমি শুধু বলেছি, 'কে জানে!'
নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান,
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণ তরুণী
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, 'এ আমাদেরই লোক।'
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।
সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার,
'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।'
(পরিচয়: সেঁজুতি)

চোখ মেলে দেখল রানা, কয়েকজন দুর্দান্ত বলিষ্ঠ লৌহকঠিন যুবক অবাক চোখে চেয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে। কারও কারও চোখে টলটল করছে পানি। ওর নিজের চোখ দুটোও ভেজা ভেজা।

শার্টের হাতায় চোখ মুছল সোহেল, তারপর কলিংবেল টিপল। 'এই ভাঁড়ামির জন্যে শালাকে এককাপ কফি খাওয়ানো যায়…কি বলিস তোরা?'

***